বিশ্ববিজ্ঞান

কমলেশ রায়

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন
৯২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
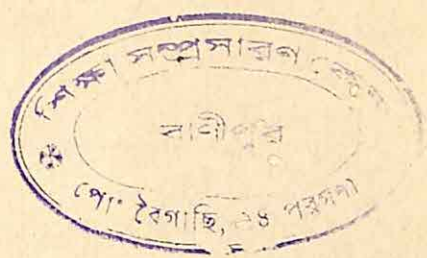
ভূমিকা

আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারা ও কার্যকর বিষয়গুলি জানবার জন্য বিশ্ববিজ্ঞান বইখানি লেখা। আজ যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখি বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এ সকলের মূলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার যে প্রবর্তনা রয়েছে তার অপূর্ব কাহিনী বলবার চেষ্টা করেছি।

সঙ্গীতের জ্ঞান না থাকলে যেমন সঙ্গীতের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না, বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানের পরিবেশকে উপলব্ধি করাও তেমনি অসম্ভব। সূক্ষ্ম পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান যেমন ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি, সুখ সুবিধার সরঞ্জাম তৈরী করছে, জড়জগৎ ও জীবজগৎ সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তাধারাকেও তেমনি বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। জড়বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ক্রমোন্নতির তথ্য সেই কারণে দেওয়া হ'লো নিছক বিজ্ঞান হিসাবে। সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বিশ্বকে হৃদয়ঙ্গম করবার বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক টীকাও দেওয়া হ'লো। এ সকল টীকা অবশ্য আমার নয়, বিজ্ঞানী মনীষীদেরই।

বইখানিতে প্রচ্ছন্নভাবে দুটি ভাগ আছে : বলা যেতে পারে—বিশাল জগৎ ও সূক্ষ্মজগৎ। দুটিই নিখিল বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত ও বিজ্ঞানের একই নিয়মে বাঁধা। বিশাল জগতের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ডের রূপ, বিস্তারশীল পরিমিত ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধারণা এসেছে জড়বিজ্ঞানের নানা উন্নতির মধ্য দিয়ে। অতএব আলোক বিজ্ঞান, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি আলোচনা করতে হয়েছে। সূক্ষ্ম জগতে অণুপরমাণু, ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, বস্তু ও শক্তির দ্বৈততার কথা এসে পড়ে। সব ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক তথ্যের মূল ভিত্তি থেকে আলোচনা সুরু করা হয়েছে যাতে বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছেও বইখানি সহজবোধ্য হয়।

জড়বিজ্ঞান আজ এমন উন্নত স্তরে এসেছে যে বিশ্বজগৎকে উপলব্ধি

করবার যেন সুযোগ এসেছে বলে মনে হয়। জড়জগতের নিয়মকাহুন দিয়ে মরজগৎ ও মনোজগতের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে। ভবিতব্যতা ও অনিশ্চয়তাবাদ নিয়ে দার্শনিক মহলে যে মতভেদ, জড়বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আজ তার কিছু সমাধান পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীর বুকে প্রথম জীবের সূচনা সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করেছি।

সুধীবর্গের কাছ থেকে যে উৎসাহ পেয়েছি তার ফলে পুস্তক প্রণয়নের কাজ সুখকর হয়েছে। ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের সাহায্য প্রস্তাবিত হওয়ায় পুস্তক প্রকাশনের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়েছে; এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন এই গ্রন্থ প্রকাশনের ভার নেওয়াতে ঐ সংস্থার পরিচালক মণ্ডলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য ও ভাবধারা পেয়ে যদি পাঠক খুসী হন তাহলেই কৃতার্থ বোধ করব।

দিল্লী, জানুয়ারী, ১৯৬৫

কমলেশ রায়

সূচীপত্র

বিশ্ববিজ্ঞান

বিশ্ববিজ্ঞান

অধ্যায়—১

মানব সভ্যতা ও বিজ্ঞানের সুরু

মানুষের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি কবে থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে সে কথা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। হঠাৎ হয়নি, একদিনে হয়নি। মানব জাতির ইতিহাস যতদূর পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তাতে সকল যুগেই অল্প বিস্তর বুদ্ধি, কলা-কৌশল ও বিচার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি করবার চেষ্টা দেখা যায় বিগত চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে। এই সময়ে মানুষ কোন না কোন প্রকারে তাদের কর্মকুশলতা, সৌন্দর্যবোধ ও মানসিক বিকাশের পরিচয় স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে যত্নবান হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাচীন স্থাপত্য বিদ্যা—পাথর খোদাই মূর্তি, মন্দিরাদি, পিরামিড, পাথরের ও হাড়ের অস্ত্রশস্ত্র, বর্শা ও তীরের ফলক, মাটির পাত্র, বাসন ইত্যাদি।

প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় মিশর, ব্যাবিলন, মহেন্‌জোদাড়ো ও হরপ্পা এবং চীনদেশে। এই সকল দেশে সভ্যত্যর স্চনা হয় চার পাঁচ হাজার বছর আগে। গ্রীক সভ্যতা ও বিজ্ঞান আসে খৃষ্ট অব্দের গোড়ার দিকে অর্থাৎ প্রায় দু'হাজার বছর আগে।

সভ্যতার মাপকাঠি আর বিজ্ঞানের মাপকাঠি অনেকটা একই। মানব সভ্যতার অগ্রগতি বিজ্ঞানের অগ্রগতির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তাই বিজ্ঞানের গোড়ার কথা বলতে গেলে সভ্যতার গোড়ার কথা বলতে হয়। তবে সভ্যতা বলতে শুধু যে বিজ্ঞানের দেওয়া কলকব্জা সুখ-সুবিধা বোঝায় তা নয়—মনের দিক থেকে, চিন্তাধারার দিক থেকে বিজ্ঞান

আমাদের মানবতার দিকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। বিজ্ঞান আমাদের যুক্তিমূলক ভাবধারা দিয়েছে, কুসংস্কার দূর করেছে, ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়েছে; মুদ্রণ যন্ত্র দিয়ে শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করেছে, ইত্যাদি।

প্রাচীন সভ্যতার ও বিজ্ঞানের ইতিহাস চার-পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত পাওয়া যায়। মানুষের বিচারশক্তি, কর্মকুশলতা ও বুদ্ধির বিকাশ আরও বহু পূর্বে হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্বের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায় না। প্রধান অসুবিধা ভাষা নিয়ে। কোন না কোন রকম ভাষা হয়তো ছিল, কথা বলবার জন্য, পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের জন্য; কিন্তু লিখিত ভাষা ছিল কি? কবে থেকে লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে? কিসের ওপর লেখা হতো? লিখে কতটুকু ভাব প্রকাশ করা যেতো সে যুগে? এইভাবে নানারকম জটিল প্রশ্ন এসে পড়ে। যতদূর দেখা গিয়েছে, খৃষ্ট পূর্ব ৩৫০০ অব্দের আগে মানুষের লিখবার বর্ণপদ্ধতির কোনও নমুনা পাওয়া যায় না। এই কারণে এখন থেকে চার-পাঁচ হাজার বছরেরও আগেকার ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে পাওয়া অসম্ভব বললেই হয়।

কিন্তু প্রত্নতত্ত্বজ্ঞরা মাটির গভীর স্তর থেকে মানুষের ব্যবহার করা যে সব জিনিস ও অন্যান্য নমুনা খুঁড়ে বার করেছেন তা থেকে আরো প্রাচীন যুগের মানুষের ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হয় যে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বছর আগে মানুষ নৌকা ব্যবহার সুরু করে। ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগেও তারা হাড়ের ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে পারতো।

মানব সভ্যতার আদিম জন্মস্থান এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও ইয়োরোপে। আমেরিকায় সভ্যতার সূত্রপাত হয় পরে। অনুমান খৃষ্ট জন্মের সমসাময়িক কালে এশিয়াবাসীগণ বেরিং প্রণালী পার হয়ে উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করে ও ক্রমশঃ মধ্য আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে বসতি করে। মেক্সিকো, ইউকাটান প্রভৃতি অঞ্চলে যে প্রাচীনতম শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সঙ্গে প্রাচীন এশিয়ার শিল্পকলার মিল দেখা যায়।

জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সর্বপ্রথম কাজ হলো কতকগুলি পর্যাবর্তক (periodic) ঘটনার পরিক্রমকাল নির্ণয় করা। দিন রাত্রির

নির্দিষ্টতা, ঋতু নির্ণয় ও বৎসর-গণনা হ'লো সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক অনুধাবন। দিন-রাত্রি বা ঋতুচক্র বারবার ঘুরে আসে। এদের ওপর জীবনযাত্রার অনেক ব্যবস্থা নির্ভর করে। মিশরে বর্ষাকালের সুরুতে ভোরবেলা লুব্ধক নক্ষত্র পূবদিকে আকাশে দেখা যায়। প্রাচীন মীশরীয়রা লুব্ধক নক্ষত্রের অবস্থান থেকে বর্ষাকাল ও নীলনদের বন্যার আগমন অনুমান করতে পারতো। সেই অনুসারে চাষবাসের যোগাড়যন্ত্র করতো।

এ ছাড়া সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, চন্দ্রকলার নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি আদিম মানুষের অনুসন্ধানী চোখ এড়ায় নাই। সূর্যের মতো নক্ষত্ররাও পুব আকাশে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। নক্ষত্রদের মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান সর্বদাই সমান থাকে। কিন্তু প্রাচীন কালের মানুষরা লক্ষ্য করল এদের মধ্যে কয়েকটি তারা (?) নির্দিষ্ট স্থানে থাকছে না, ধীরে ধীরে সরে যায়। অতএব এরা নক্ষত্র বা তারা নয়, গ্রহ। এইভাবে সব দেশেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে সবচেয়ে আগে।

কৃষিকার্যের তাগিদে ঋতুচক্রকে জানতে হয়েছে। বর্ষাকাল কৃষিকার্যের ব্যাপারে খুবই জরুরী। দ্বিতীয় বর্ষা আসে এক বছর পরে,—সুদীর্ঘ সময়। মধ্যে আসে অন্যান্য ঋতু। দিন গুণে ঋতু বা বছরের হদিস করা শক্ত, বিশেষ করে সে যুগে। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি এবং পূর্ণিমা-অমাবস্যার নিয়মিত আবির্ভাব থেকে আর একটি দীর্ঘতর (দিন-রাত্রির তুলনায়) সময় খণ্ডের ধারণা জন্মে। এইভাবে এলো চান্দ্রমাস। ব্যাবিলনে চান্দ্রমাস অনুসারে শস্য বপনের সময় নির্ধারণ করবার রীতি পুরাকালে প্রচলিত ছিল। চান্দ্রমাস প্রায় উনত্রিশ দিনে হয়।

প্রাচীনত্বের দিক থেকে মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, চৈনিক ও ভারতীয় বিজ্ঞান সবচেয়ে পুরাতন। এই সব দেশের সভ্যতা ও বিজ্ঞান এত প্রাচীন যে সুরুর কথা কেউ বলতে পারে না। মোটামটি বলা যায় খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার অব্দেরও আগে।

সব দেশেই যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের প্রথম সূচনা হয়, মিশরেও তেমনি হয়েছিল। মিশরীয় জ্যোতিষে ৩৬০ থেকে ৩৬৫ দিনে বছর গণনার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। এই রকম সৌর বৎসর পঞ্জিকার সূত্রপাত হয় ৪২৩৬

খৃষ্ট পূর্বাব্দে, অর্থাৎ মোটামুটি এখন থেকে ছ'হাজার বছর আগে। প্রথমে মিশরীয়রা বারো মাসের প্রত্যেকটি মাস ৩০ দিন ধরে। এতে হয় বছরে ৩৬০ দিন। ফলে বছরে ৫ দিন কম পড়ে। এজন্য বছরের শেষে ছুটি ও আমোদ-প্রমোদের জন্য পাঁচটা বাড়তি দিন জুড়ে দেওয়া হতো। সে পাঁচ দিন কোনও মাসের আওতায় পড়ত না। এই পাঁচ দিন পরে আবার নতুন বছর আরম্ভ হ'তো।

এক বছরে ৩৬৫ দিন, একথা সবাই জানে, অত্যন্ত সহজ কথা। তাহলে প্রাচীন যুগে যাঁরা একথা প্রথম বলেছেন তাঁদের আজ আমরা এত কৃতিত্ব দিই কেন, তাঁদের বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে ফেলি কেন? বছরে ৩৬৫ দিন, এটা খুব সহজ কথা নয়, নিছক মন-গড়া কথা নয়। এর মূলে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক হিসাবের কথা আছে। সেই হিসাবের ফলে ৩৬৫ দিন বছরের একটা মোটামুটি হিসাব মাত্র। আসলে বছর হয় ৩৬৫¼ দিনে, যার জন্য চার বছর অন্তর একটা লিপ-ইয়ার (leap-year) ধরে একদিন বাড়িয়ে নেওয়া হয়। এটাও সঠিক হিসাব নয়, আরও একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক। তবে এটুকু বোঝা গেল ৩৬৫ দিনে বছর ব্যাপারটা খুব সাদা-সিধে মুখস্থ বুলি নয়।

বাস্তবিক এক বছর বলতে কী বোঝায়? যদি বলি ৩৬৫ দিন, তাহলে প্রশ্ন উঠবে ৩৬০ দিন ধরলে কী ক্ষতি ছিল, এবং মিশরীয়গণ পাঁচদিন কম পড়েছে বলে ৩৬০ + ৫ দিন করে ৩৬৫ দিনে বছর ধরতে গেল কেন? কিসের থেকে কম পড়ল? ৩৬৫ দিনের বিশেষত্ব কী?

বছরের সঙ্গে প্রকৃতির একটা যোগ আছে, সেটা ঋতু ও ঋতুচক্রের ব্যাপারে। প্রতি বছর শীত গ্রীষ্ম নিয়ম মতো আসে। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য গ্রীষ্মকাল, পৌষ-মাঘে শীত, আষাঢ়-শ্রাবণে বর্ষা। এরকম নির্দিষ্ট মাসে ঋতুর পরিবর্তন চলে আসছে কত শত বছর থেকে। যদি ৩৬০ দিনে বছর ধরা হয় তাহলে প্রতি বছরে পাঁচদিন এগিয়ে নতুন বছর এসে পড়বে মাস গুণতি হিসাবে। অর্থাৎ ছ'বছরে ৩০ দিন বা এক মাস তফাত হয়, বারো বছরে ছ'মাস বা এক ঋতুর তফাত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের মাস হ'য়ে দাঁড়াবে আষাঢ়-শ্রাবণ। আরো বারো বছর পরে ভাদ্র-আশ্বিনে হবে গ্রীষ্মকাল। অর্থাৎ ৩৬০ দিনে

বছর ধরলে মাস গণনা দিয়ে ঋতুচক্র ঠিক রাখা যাবে না। এথেকে বোঝা গেল যে ঋতুচক্রের সঙ্গে বৎসর চক্রের বিশেষ সম্বন্ধ, এবং ৩৬৫ দিনে বছর ধরলে প্রতি বছর মাস ও ঋতুর সামঞ্জস্য মোটামুটি রক্ষা হয়। কিন্তু ঋতুর মাপকাঠি দিয়ে বছর গণনা করা যায় না। গরমের মাত্রা দেখে কেউ বলতে পারে না 'আজ পয়লা বৈশাখ, গ্রীষ্মকালের শুরু।' ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সূর্যের অবস্থান বদলায়। সূর্যের অবস্থান বোঝা যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নক্ষত্রের অবস্থান থেকে। মোটামুটি ৩৬৫ দিন পরে পরে সূর্য একই অবস্থানে আসে। এই কারণে ৩৬৫ দিনে বছর ব্যাপারটা প্রাকৃতিক সময় খণ্ড (বৎসর কাল), মনগড়া নয়। সভ্যতার সুরুতে যাঁরা নক্ষত্রের অবস্থান দেখে সূর্যের অবস্থান ও ঋতুচক্রের যোগাযোগ বুঝে ৩৬৫ দিনে বছর গণনা করতে পেরেছিলেন তাঁদের কৃতিত্ব আছে বৈকি।

মিশরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে গণিতও যে অগ্রসর হ'য়েছিল সে কথা বলা বাহুল্য। সূর্য, চন্দ্র, তারকার সাহায্যে কাল গণনা ও পঞ্জিকা (calendar) তৈরী করতে হলে গণিতের সাহায্য চাই। বৈষয়িক কারণে পাটিগণিত ও বীজগণিতের তুলনায় জ্যামিতির উন্নতি বেশী হয়েছিল। জ্যামিতির প্রয়োজন অনেক ব্যবহারিক ব্যাপারে লাগে, যেমন জমিজমা বিলি ব্যবস্থার জন্য। মিশরের পিরামিড তৈরীর নমুনা দেখলেও বোঝা যায় জ্যামিতির মাপজোখের জ্ঞান মিশরীয়দের প্রখর ছিল।

খৃষ্ট অব্দের প্রথম ভাগে মিশরে বিজ্ঞানের চর্চার প্রায় পরিসমাপ্তি হয়।

প্রাচীন সভ্যতা নদীর তীরে তীরে বাসা বেঁধেছিল। মিশর দেশ নীল-নদের উপত্যকায়। তেমনি আর একটি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র টাইগ্রিস-ইউফ্রেডিস নদী দুটির উপত্যকায় ব্যাবিলনে। ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞান ও মিশরীয় বিজ্ঞানের মধ্যে কিছু কিছু মিল দেখা যায়। দুই দেশের ব্যবধান বেশী নয়, আর মধ্যে স্থল সংযোগ থাকায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান হওয়া স্বাভাবিক। এই দুই দেশের বিজ্ঞানের উত্থান ও পরিসমাপ্তির ইতিহাস প্রায় এক ধরনের।

আর একটি নদী আর একটি প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি,—সিন্ধু নদের

উপত্যকায় মহেন্‌জোদাড়ো ও হরপ্পা। সুগভীর মাটির স্তরের মধ্যে এই সব প্রাচীন নগরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মহেন্‌জোদাড়ো শহরের পরিকল্পনা ও গঠন পদ্ধতি দেখলে অবাক হ'তে হয়। চওড়া বাঁধানো রাজপথ, দালান কোঠা পাকা বাড়ী, জনসাধারণের সাঁতার কাটবার সুইমিং পুল বা বাঁধানো বড় চৌবাচ্ছা, পাকা নর্দমা ও জল নিকাশের ব্যবস্থা, ময়লা জল নিকাশের মাটির নল ইত্যাদি সবই এই চার হাজার পাঁচ হাজার বছর আগেকার শহরে দেখতে পাওয়া যায়। জনস্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ছাড়া এমন শহর কেউ পরিকল্পনা করতে পারে না বা গড়তে পারে না। এ সময়ে সোনা, রূপা, তামা, পিতল ও সীসা ধাতুর প্রচলন ছিল, কিন্তু লোহার প্রচলন আরম্ভ হয়নি।

ভারতীয় জ্যোতিষও মিশর-ব্যাবিলনের মতো প্রাচীন। বেদ-বেদাঙ্গের যুগ খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে। বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ এক-দিনে বা একজনের লেখা নয়। বৈদিক যুগের মনীষীদের লেখা বহুদিন বা বহু শতাব্দী ধরে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ খৃষ্টপূর্ব ৫০০—২০০ অব্দের মধ্যে রচিত।

সংখ্যা গণিতে শূন্যের (zero) ব্যবহার ভারতীয় গণিতের প্রধান দান বলা যেতে পারে। চিকিৎসা শাস্ত্রে শারীরতত্ত্ব ও ভেষজের গুণাগুণ নির্ণয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অস্ত্র চিকিৎসায় নানারকমের অস্ত্রের যে সব বর্ণনা সুশ্রুতের শল্যবিদ্যায় পাওয়া যায় তার সঙ্গে আধুনিক সার্জিক্যাল ইন্‌স্ট্রুমেন্টের অনেক সাদৃশ্য আছে। প্লাস্টিক সার্জারির সূত্রপাত হয় ভারতবর্ষে।

চীনদেশও প্রাচীন সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রদূত। চার-পাঁচ হাজার বছর আগে চীন দেশেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়। খৃষ্টপূর্ব ২৬৫০ অব্দে চীন সম্রাট হুয়াং তি জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের জন্য একটি প্রকাণ্ড মান-মন্দির তৈরী করেন। গণিত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সূচনাও চীন দেশে খুব প্রাচীন কাল থেকে হয়।

মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতার পর গ্রীক সভ্যতা আসে। গ্রীক বিজ্ঞানের সূচনা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দী থেকে। জ্যোতিষ, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান ও ন্যায় শাস্ত্রে গ্রীকদের একপ্রকার স্বতন্ত্র ও

প্রাচীন মহেঞ্জোদাড়ো শহরের ধ্বংসাবশেষের একটি সাধারণ চিত্র
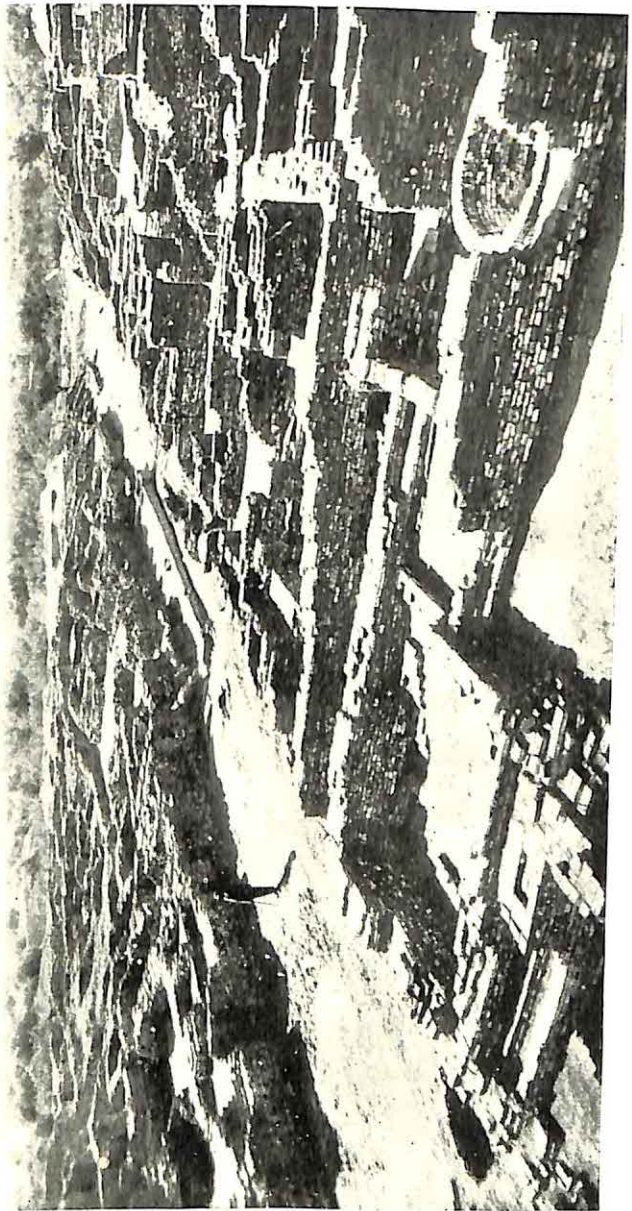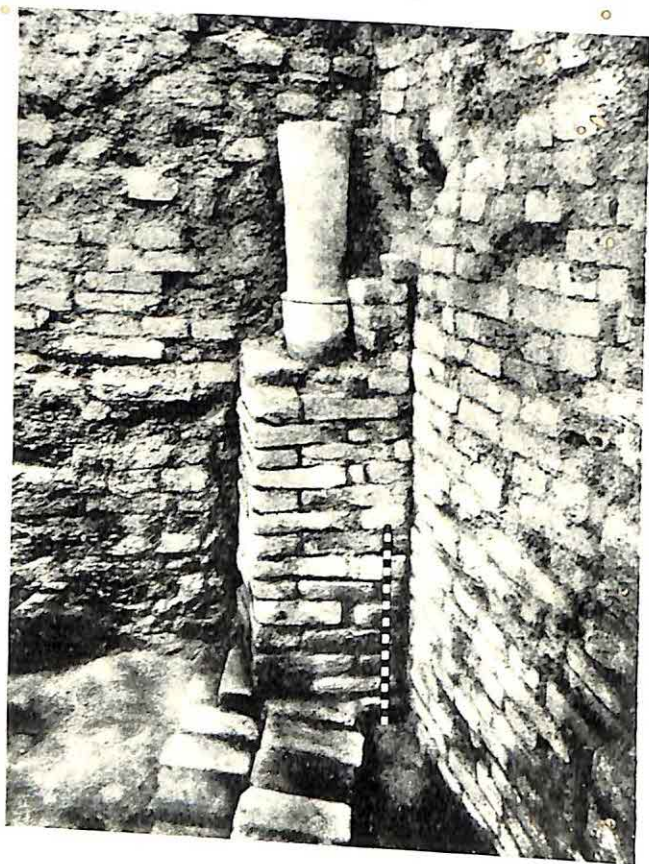
ভারতীয় প্রত্ন বিভাগের সৌজন্যে

মহেন্‌জোদাড়োর একটি বাড়ির ঢাকানল
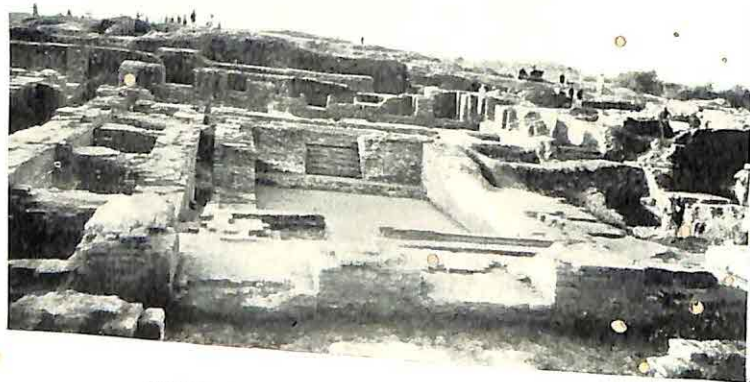
মহেনজোদাড়োর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ('সুইমিং পুল')

ভারতীয় প্রত্ন বিভাগের সৌজন্যে

সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। গ্রীকদের সৌন্দর্যবোধ, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান ও আনন্দোচ্ছল জীবন ধারা নূতন যুগের প্রতীক। অন্যান্য প্রাচীন বিজ্ঞানের সঙ্গে যেমন ধর্ম ও পুরাণের আখ্যা জড়িত দেখা যায়, গ্রীক বিজ্ঞানে ঠিক সে রকম দেখা যায় না। গ্রীক বিজ্ঞানের মূলে বিশ্লেষণমূলক মনের (analytical mind) পরিচয় পাওয়া যায়। এটাই গ্রীক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। তবু ধর্মের নামে পুরোহিত ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের কুসংস্কার ও অহমিকার অত্যাচার প্রকট হয়ে উঠেছিল শেষ দিকে। সে কথা পরে বলব।

গ্রীক সাম্রাজ্য গ্রীস ও পশ্চিম এশিয়ামাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাইলেটাস একটি বর্ধিষ্ণু নগর। এই নগরে থালেসের (খৃঃ পূঃ ৬২৪—৫৪৭) জন্ম হয়। থালেস একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী। সে যুগের ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা করা অসম্ভব ছিল, কিন্তু থালেস বিশ্বাস করতেন এই জড়জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ও চলছে প্রকৃতির নিয়মে। অনেকে বলেন থালেস সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ গণনা করে বলতে পারতেন। অবশ্য এ সময় ব্যাবীলনীয়েরা গ্রহণ সম্বন্ধে জানত, এবং থালেসের গতিবিধি ব্যাবিলন ও মিশর পর্যন্ত ছিল বাণিজ্য সূত্রে। জ্যামিতিতেও থালেসের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

পিথাগোরাসের (খৃঃ পূঃ ৫৮০—৫০০) নাম গণিত ও জ্যামিতি সম্পর্কে সুবিদিত। পিথাগোরাসের ধারণা হয় পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল পৃথিবীই সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল, সূর্য ও গ্রহনক্ষত্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

ফিলোলাউস্ (খৃঃ পূঃ ৪৭০—৩৯৯) জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। গ্রহ-চন্দ্রের প্রদক্ষিণ কাল তিনি শুধু চোখে দেখে যা নির্ধারণ করেছিলেন তার সঙ্গে আধুনিক পরিমাপ প্রায় মিলে যায়। ব্রহ্মাণ্ড গঠন সম্বন্ধে ফিলোলাউসের দুটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে পৃথিবী সৃষ্টির কেন্দ্রে অবস্থিত নয়; বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের মতো পৃথিবীও একটি গ্রহ মাত্র। একথার সত্যতা সম্বন্ধে আজ কারো সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় উক্তিঃ সৃষ্টির কেন্দ্রে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড আছে, কিন্তু আমরা তা দেখতে পাই না কারণ পৃথিবীর যে পিঠে মানুষ বাস করে সে পিঠ ঐ

কেন্দ্রীয় অগ্নির বিপরীত দিকে সর্বদা ফেরানো। কেন্দ্রীয় অগ্নিকে মধ্যে রেখে প্রথম কক্ষে (orbit) প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবী, তার পরের দূরের কক্ষে চন্দ্র, তার পরে সূর্য তারপরে অন্যান্য কাক্ষ যথাক্রমে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে। কেন্দ্রীয় অগ্নি সূর্য নয়, কারণ ফিলোলাউস সূর্যকে তৃতীয় কক্ষে ধরেছেন। না হ'লে ফিলোলাউসকে সৌরকেন্দ্রীয় মতবাদের প্রবর্তক বলে কৃতিত্ব দেওয়া যেতো, যে কৃতিত্ব আজ আমরা কোপার্নিকাসকে (খৃষ্টাব্দ ১৪৭৩-১৫৪৩) দিই।

কিন্তু কোপার্নিকাসের অনেক আগে এবং ফিলোলাউসের মাত্র দেড়শো বছর পরে আর একজন গ্রীক জ্যোতিষী, এরিস্টার্কাস (খৃঃ পূঃ ৩১০-২৩০), বলেন সূর্যই সমস্ত গ্রহচক্রের কেন্দ্র। কিন্তু এরিস্টার্কাস এই মতবাদ জোর করে বলতে বা প্রচার করতে সাহস পাননি। কারণ ধর্মশাস্ত্রে একথা বলে না, অতএব একথা বলা ধর্মদ্রোহিতারই সামিল। তাছাড়া ঋষিতুল্য এরিস্টট্‌ল্ (খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) একথা সমর্থন করেন নি, তিনি পৃথিবীকেই সৃষ্টির কেন্দ্র ধরেছিলেন।

এরিস্টট্‌লের তুল্য জ্ঞানী মানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি পুস্তক রচনা করেন। পদার্থ বিজ্ঞানের (Physics) বইখানি আট খণ্ডে বিভক্ত। এরিস্টট্‌ল্ অত্যন্ত প্রতিপত্তিশীল দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। চিন্তাজগতে এরিস্টট্‌লের প্রভাব প্রায় দু'হাজার বছর ধরে অব্যাহত ছিল। এরিস্টট্‌লের দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে অতীন্দ্রিয়ত্ব (myssicism) ছিল, ব্যক্তিত্বের মধ্যে অহমিকাও ছিল। তাঁর মতবাদ কেউ 'ভুল' বললে রক্ষা ছিল না, তাঁর কথা বেদবাক্য। যদিও তিনি পরীক্ষামূলক দৃষ্টিকে (observation) উপলব্ধির মূল উপাদান বলে প্রচার করতেন, কার্যতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে সেই মন্ত্র পালন করতেন না বলে মনে হয়। এরিস্টট্‌ল্ বিশ্বাস করতেন হালকা জিনিসের চেয়ে ভারী জিনিস তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে। কিন্তু তিনি যদি দুটা ছোট বড় পাথর একত্রে ফেলে দেখতেন তাহলেই বুঝতে পারতেন দুটাই এক সঙ্গে একই বেগে পড়ছে। এরিস্টট্‌লের

প্রায় দু'হাজার বছর পরে গ্যালিলিও যখন বললেন ছোট বড় পাথর একই বেগে পড়ে তখন হৈ হৈ পড়ে গেল: এরিস্টট্‌লের দার্শনিক তথ্যের অবমাননা :

প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিচয় মোটামুটি দিলাম। এই সব প্রাচীন বিজ্ঞান কী ভাবে ক্রমশঃ নিস্তেজ ও নির্বাপিত হ'লো সে কথা ভাববার বিষয়। প্রয়োজনের তাগিদে বিশ্বজগৎ ও জড়বিজ্ঞানের খবরাখবর রাখতে হয়েছিল। কিন্তু ধর্ম, শাস্ত্র ও পুরোহিতদের প্রভাব সে-যুগের মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অজ্ঞতার মধ্যে অনিশ্চয়তার ভয়ে মানুষ এসবের প্রভাব কাটিয়ে শুধু যুক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেনি। যে কয়েকজন পেরে-ছিলেন তাদের সামাজিক ও রাজকীয় লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। পুরোহিতেরা তাদের অখণ্ড ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৈজ্ঞানিকদের হাতে তুলে দিতে চাননি। তাই খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে এই সব প্রাচীন বিজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়।

আলেকজাণ্ড্রিয়াতে টলেমী (৭০—১৪৭ খৃষ্টাব্দ) তখনকার কালের বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহ সংগ্রহ করতে যত্নবান হন, এবং নিজেও কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন—বিশেষতঃ আলোক বিজ্ঞান (optics) সম্বন্ধে। এরপর বিজ্ঞানের দীপ প্রায় নির্বাপিত হলো ৯০০ বছরের জন্য। তারপর ১০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি আরবে আল্‌হাজেনের অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ হয়। এখানেও বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ ও গণিতের চর্চা সুরু হয় গ্রীক থেকে তর্জমা করে। আরবে বীজগণিতের (algebra) সূত্রপাত হয়।

টলেমীর সময় থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত বিজ্ঞানের অন্ধকার যুগ, এর মধ্যে বলবার মতো—আরব্য বিজ্ঞান। কিন্তু গ্রীক বিজ্ঞান যে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল তার উত্তাপ তুষানলের মতোই লুকিয়েছিল ধর্ম-পুরোহিত দার্শনিকদের চাপে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁ যুগে সেই আগুন আবার জলে উঠল : কোপার্নিকাস, টাইকোব্রাহে, কেপলার, গ্যালিলিও ও নিউটনের আবির্ভাবে।

এবার এলো পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যুগ। গ্যালিলওর (১৫৬৪—১৬৪২ খৃষ্টাব্দ) দূরবীন হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রধান যন্ত্র,

আর কুসংস্কার ভাঙবার প্রধান অস্ত্র।

আমরা মাত্র পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। পৃথিবীর ইতিহাসে এই সময়ের মাত্রা অতি সামান্য। পৃথিবীর ইতিহাসের আমরা কতটুকু জানি বা কতখানি জানি না—তা এই তালিকা থেকে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর জন্ম (নানা মতে ১৭০ কোটি থেকে ৩৪০ কোটি বছরের মধ্যে)	...	২,০০,০০,০০,০০০ বছর
জীবের উদ্ভব	...	৩০,০০,০০,০০০ বছর
মানুষের উদ্ভব	...	৩,০০,০০০ বছর
নৌকোর ব্যবহার	...	২৫,০০০ বছর
কৃষি বিদ্যা	...	১৫,০০০ বছর
মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, ভারতীয় ও চৈনিক বিজ্ঞান		৫,০০০ বছর
গ্রীক বিজ্ঞান	...	৩,০০০ বছর
আলেকজাণ্ড্রীয় বিজ্ঞান	...	২,৫০০ বছর
আরব্য বিজ্ঞান	...	১,০০০ বছর
দূরবীক্ষণ আবিষ্কার ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন		৩৫০ বছর

তালিকা—১ঃ পৃথিবীর ও বিজ্ঞানের ইতিহাসে কয়েকটি ঘটনার সময়ের মাপকাঠি।

অধ্যায়—২

আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনায় গ্যালিলিও ও নিউটনের নাম মনে আসে আগে। আধুনিক বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায় এবং গ্যালিলিও ও নিউটনের কৃতিত্বই বা কেন মানতে হয় এ প্রশ্ন তুললে এক কথায় উত্তর দেওয়া একটু কঠিন হবে। বিজ্ঞান ও সভ্যতার কোন স্তর বা কোন যুগই আগের স্তর বা যুগের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি হয়েছে ধারাবাহিক ভাবে। পূর্বকালে বৈজ্ঞানিকদের অভিজ্ঞতা নিয়ে পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিকেরা আরো অগ্রসর হতে পেরেছেন। গ্যালিলিওর কৃতিত্বের মধ্যে কোপার্নিকাসের কৃতিত্ব খুবই ঘনভাবে জড়িত এবং কোপার্নিকাসের সময় থেকে এই নবযুগের সুরু একথা বললেও এক হিসাবে ভুল হবে না। এই ছেদ-রেখা টানা শক্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে নানা কারণে গ্যালিলিওর সময় থেকে বিজ্ঞানের নবযুগের সূচনা ধরা চলে।

অনেকেরই বোধ হয় ধারণা আছে গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কার করেন। গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কার করেননি, লিপার্শি নামে একজন ওলন্দাজ (Dutch) চশমাকারক কাগজের নলের দুই সীমায় দুটি চশমার লেন্স বসিয়ে প্রথম দূরবীন তৈরী করেন। গ্যালিলিও খবরটা পেলেন, যন্ত্রটা দেখেননি। বিজ্ঞান ও গণিতে পাণ্ডিত্য থাকায় গ্যলিলিও বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা কী। তখন তিনি নিজের দূরবীন নিজেই তৈরী করে নিয়ে জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ করতে সুরু করে দিলেন। এই পর্যবেক্ষণের ফল বিজ্ঞান ক্ষেত্রে হলো সুদূরপ্রসারী। আজ আমরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র বলতে গ্যালিলিওকে স্মরণ করি।

উদাহরণটি ছোট, কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উত্তরটি সহজ করে দেয়।

বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই তিনটি জিনিস: পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় (experiment, observation, co-ordination)। গ্যালিলিও এই পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের প্রধান প্রবর্তক। গ্যালিলিওর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জ্যোতির্বিজ্ঞান, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, দোলক বা পেণ্ডুলাম, জলের মধ্যে ভাসমানতার তত্ত্ব, পড়ন্ত বস্তুর গতিবেগ ইত্যাদি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে গতিবিজ্ঞান (dynamics), গতিবিজ্ঞানের সঙ্গে বলবিদ্যা (mechanics) সবই যেন একসূত্রে গাঁথা, একই টানে বেরিয়ে আসে। নিউটনের (১৬৪২—১৭২৭) গতিবিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান (statics) ও বলবিদ্যা আরো উন্নত; 'মধ্যাকর্ষণ' একটি নূতন সত্তার ধারণা—যা দিয়ে গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি বাঁধা, আর পৃথিবীতে বস্তুর ভার ও পড়ন্ত বস্তুর গতিবেগের কারণ। ত্রিপার্শ্ব কাচ (prism) দিয়ে আলোক বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিউটনের আর একটি শ্রেষ্ঠ দান।

গ্যালিলিও-নিউটনের সময় থেকে বিজ্ঞান হল সুসংবদ্ধ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে এলো সুনির্দিষ্ট ধারা, সংস্কার ও শাস্ত্রবাক্যের অধিকার (authority) থেকে বিজ্ঞান মুক্ত হল, বিজ্ঞান হল প্রমাণসাপেক্ষ। এই মুক্তির জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, মরণ ও কারাবরণ করেছেন; রজার বেকন, কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও। প্রধান বিবাদ ব্রহ্মাণ্ডের গঠন নিয়ে। বিজ্ঞান বলতে চায় পৃথিবী সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল নয়, সূর্যই গ্রহজগতের কেন্দ্র; পৃথিবীটা অন্যান্য গ্রহেরই মতো, এ রকম গ্রহজগৎ আরো আছে; আরো লক্ষ লক্ষ তারার মতো সূর্যও একটি তারকা বিশেষ। সেটা রোমান সাম্রাজ্য, পোপের দোর্দণ্ড প্রতাপ। বিজ্ঞানের এই কথা তো শাস্ত্র সম্মত হচ্ছে না! পোপ-পুরোহিতেরা জ্বলে উঠলেন, বললেন—তোমরা ভুল বলছ, তোমরা ধর্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, তোমাদের বাড়তে দিতে নেই।

কোপার্নিকাস এই ভয়ে তাঁর সৌর কেন্দ্রীয় মতবাদ (সূর্য স্থির কেন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে) ত্রিশ বছর লুকিয়ে রেখেছিলেন। যখন প্রকাশ করবেন বলে ছাপতে দিলেন তখন তিনি জীবনের শেষ ধাপে, বই ছাপা দেখে যেতে পারেননি। গ্যালিলিওর
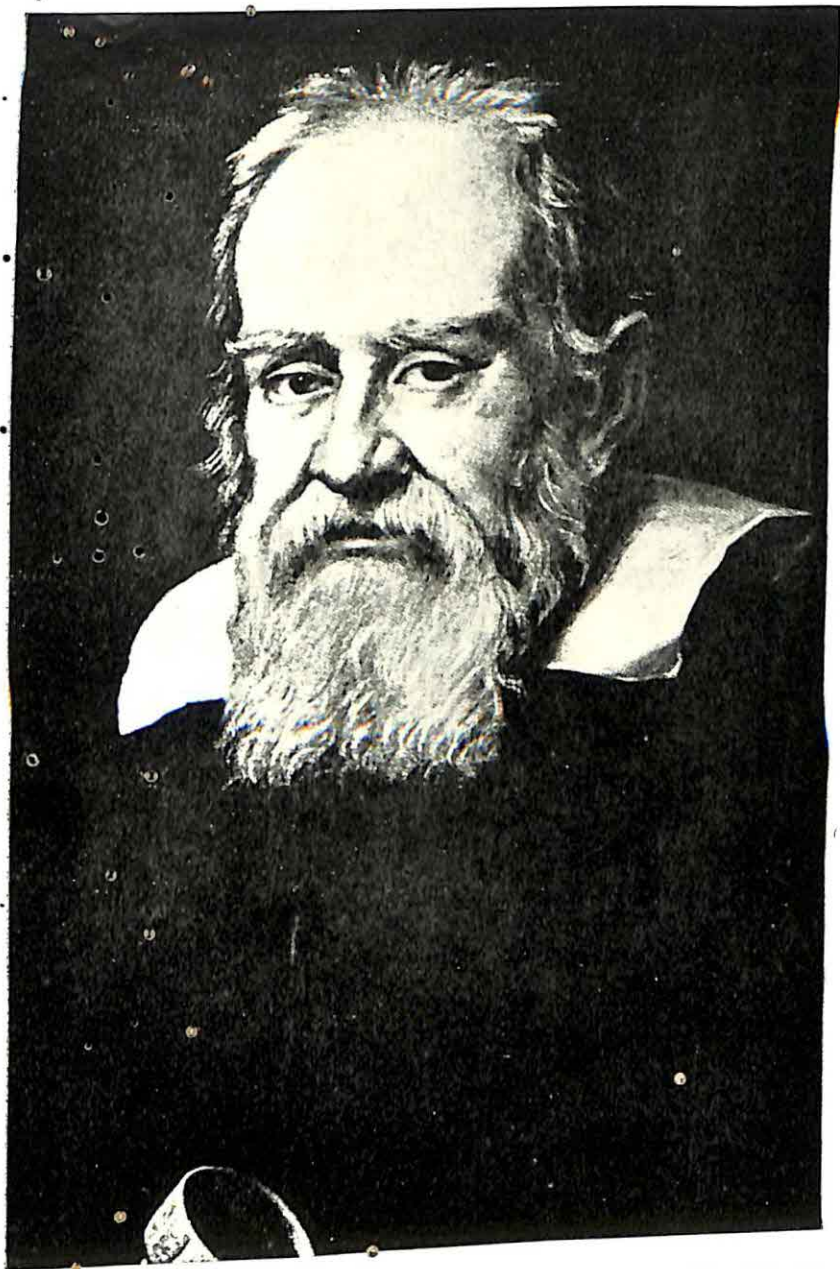
গ্যালিলিও গ্যালিলি

জন্ম ১৫৬৪ খৃঃ] [মৃত্যু ১৬৪২ খৃঃ
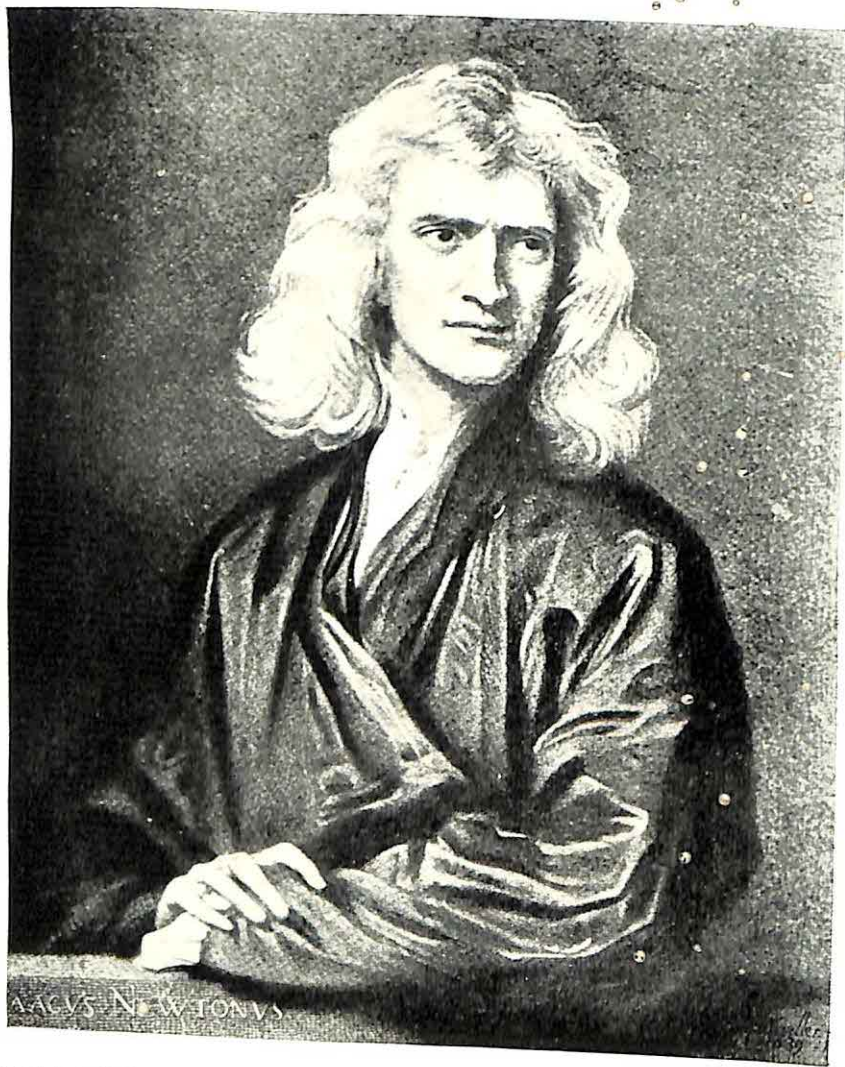
জন্ম ১৬৪২ খৃঃ] আইজাক নিউটন [মৃত্যু ১৭২৭ খৃঃ

জন্ম কোপার্নিকাসের মৃত্যুর চব্বিশ বছর পরে। যথাকালে গ্যালিলিও তাঁর দূরবীন দিয়ে একে একে সব প্রমাণ করলেন। পোপের হাতে নির্যাতন সহ্য করলেন, কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষা-প্রমাণ অবশেষে জয়ী হলো।

যে বছর গ্যালিলিওর বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হয় সেই বছর ইংলণ্ডে আইজাক নিউটনের জন্ম হয়। গ্যালিলিওর পরেই বিজ্ঞানের ওপর ধর্মের নাগপাশ দ্রুতভাবে ছিন্ন হতে থাকে। নিউটনের বিজ্ঞান সাধনার কালে, অন্ততঃ ইংলণ্ডে, এ ভয় আর বিশেষ ছিল না। নিউটন ধীরস্থির-ভাবে বিজ্ঞান সাধনা করতে পেরেছিলেন। গ্যালিলিও নিউটনের সময় থেকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির চল হতে লাগল। যন্ত্রপাতি ও গণিত হয়ে দাঁড়াল বিজ্ঞানের প্রধান হাতিয়ার।

এই যুগে বিজ্ঞানের আবহাওয়াতে এলো সাবলীলতা, দৃঢ়তা, সুনিশ্চয়তা। কাউকে বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু গ্যালিলিও-নিউটনের যুগ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়েছে ধরলে ভুল হয় না।

অধ্যায়—৩

বার্তাবহ আলোক

চোখের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের যত খবর পাই অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ততটা পাই না। কিন্তু আলো না থাকলে দেখতে পাই না। আলোর সাহায্য ছাড়া চোখ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। কোন জিনিস দেখতে হলে তার ওপর আলো পড়া চাই, তখন সেই আলো তার গা থেকে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এবং ঐ বিক্ষিপ্ত আলো চোখের মধ্যে প্রবেশ করলে আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই। অর্থাৎ অনুজ্জ্বল বস্তুর উপর আলো ফেলে তাকে উজ্জ্বল করে নিতে হবে তবেই তার প্রতিচ্ছবি চোখের মধ্যে সৃষ্টি হবে। কিন্তু যে সব বস্তু নিজেই উজ্জ্বল; নিজেই আলো দেয় (যেমন দীপশিখা, বিজলী বাতি, আগুন, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদি) তাদের দেখবার জন্য অন্য আলোর প্রয়োজন হয় না। কারণ তাদের নিজের আলোই চোখের মধ্যে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে পারে।

চোখের ব্যাপারটা ঠিক যেন ফোটো তোলবার ক্যামেরার মত। চোখের মধ্যেও একটা লেন্স বা আতসমণি আছে। ক্যামেরা লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে যেমন পিছনে ফিল্ম-এর ওপর বস্তুর প্রতিচ্ছবি পড়ে, চোখের লেন্স-এর সাহায্যেও ঠিক তেমনি ভাবে প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়। এই প্রতিচ্ছবি পড়ে চোখের মধ্যে অক্ষিপটের (retina) উপর, সেখানে আছে অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ুজাল। এগুলি দৃষ্টিস্নায়ু বা দৃক নার্ভ। দৃষ্টি স্নায়ুজালের ওপর প্রতিচ্ছবি পড়লে আমরা দেখতে পাই।

চোখের মধ্যের লেন্সটি যে কাচের নয় সে কথাই বলা বাহুল্য। এই লেন্সটি স্বচ্ছ জেলির মতো জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরী। বেশ নরমও। তার ফলে প্রয়োজন মতো খানিকটা মোটা বা পাতলা হতে পারে, কাছের বা দূরের দৃষ্টির ফোকাস্ করবার জন্য।

চোখটি চমৎকার যন্ত্র! মোটামুটি গড়ন একটা বড় মার্বেলের মতো একে বলে অক্ষি গোলক (eye ball)। সামনের খানিকটা অংশ স্বচ্ছ যাতে আলো ঢুকতে পারে। এই স্বচ্ছ অংশের পিছনে একটি কালো
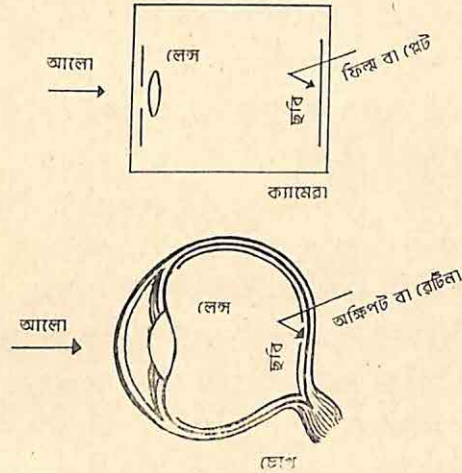
চিত্র—১ : ক্যামেরা ও চোখ যেন একই ধরনের যন্ত্র।

বা গাঢ় পাটল রঙের চক্র বা চোখের তারা (iris); তারার মধ্যখানে আরো গভীর কালো একটা বিন্দু, যাকে বলে কনীনিকা (pupil)। চোখের তারা হলো আলো রোধক পর্দা, মধ্যের বিন্দু বা কনীনিকা হলো ছিদ্র। এই ছিদ্র পার হয়ে তবে চোখের লেন্স। বাইরের আলোর তেজ অনুসারে কনীনিকা ছিদ্রটি ছোট বা বড় হয়ে তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। যখন আলোর জোর বেশী তখন কনীনিকা ছোট হয়ে যায় যাতে চোখ ধেঁধে না যায়। আবার আলোর জোর কম হলে কনীনিকার ছিদ্রটি বড় হয়ে বেশী আলো ঢুকতে দেয়, দেখতে সুবিধা হয়। এর জন্য ভাবতে হয় না, এই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়। ক্যামেরাতেও এইরকম বন্দোবস্ত, তবে আলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটা হাতে ঘুরিয়ে করতে হয়, ভিতরে আছে আইরিস ডায়াফ্রাম (iris diaphragm), যাকে বলা যায় কনীনিকা বা মধ্যচ্ছদা পর্দা। ক্যামেরায় আলো ঢুকবার ছিদ্রটি ছোট বা বড় করা যায়। বেড়ালের চোখের

মণিতে দিনের আলোতে আর রাতের অন্ধকারে কনীনিকা ছোট বড় হতে সকলেই লক্ষ্য করে থাকি।

খালি চোখে মানুষ যতটা দেখতে পায় বিজ্ঞান তাতে সন্তুষ্ট নয়। কত জিনিস আমাদের সাধারণ দৃষ্টি শক্তির বাইরে। খুব দূরের বস্তু দেখতে পাই না। কত শত নক্ষত্র আছে যাদের আমরা খালি চোখে দেখতেই পাই না। কত জিনিস আছে যাদের কোন রকমে দেখতে পেলেও চিনতে পারি না, বুঝতে পারি না। চাঁদের কলঙ্কগুলি কী, তা কেউ শুধু চোখে দেখে বলতে পারে? ছায়াপথ কী? তেমনি, অতি ক্ষুদ্র বস্তুও সাধারণ দৃষ্টি শক্তির বাইরে।

বিজ্ঞান মানুষের দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়েছে হাজার গুণ, লক্ষ গুণ। আতস কাচ বা কনভেক্স লেন্স (convex lens) একটি অতি সাধারণ দৃষ্টি সহায়ক বা দৃষ্টিবর্ধক যন্ত্র। এই রকম লেন্সের দুটি ব্যবহার আছে। এক হলো ছোট জিনিসকে বড় করে দেখান। এরকম ব্যবহারে এর নাম হয়ে দাঁড়ায় ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস (magnifying glass) বা বিবর্ধক কাচ। সাধারণ ম্যাগ্‌নিফাইং লেন্স দিয়ে দ্বিগুণ বা দশগুণ বাড়ানো যায়। এ দিয়ে ছোট হরফে লেখা পড়তে, ঘড়ি মেরামত করতে বা এই ধরনের কাজে বেশ সুবিধা হয়। কিন্তু রোগের বীজাণু দেখতে, পাথরের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে হলে হাজার গুণ বাড়তে হবে। নানাভাবে লেন্স সাজিয়ে এরকম মাইক্রস্কোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী হলো চোখকে সাহায্য করতে।

আতস কাচের দ্বিতীয় ব্যবহার হ'লো দূরের বস্তুর প্রতিচ্ছবি (image) কাছে সৃষ্টি করা। ক্যামেরাতে যেমন হয়। দেয়ালের কাছাকাছি আতস ধরলে বাইরের গাছপালার প্রতিচ্ছবি দেয়ালে পড়বে। রোদের মধ্যে আতস ধরলে আতসের পিছনে একটা তীব্র আলোর বিন্দু সৃষ্টি হবে। সেখানে কাগজ ধরলে পুড়ে যাবে, দিয়াশলাইয়ের বারুদ ধরলে ফোঁস করে জ্বলে উঠবে। লেন্সের-এর পিছনে এই তীব্র আলোর বিন্দুটি সূর্যের প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। লেন্স থেকে সূর্যের এই তীক্ষ্ণতম প্রতিচ্ছবির দূরত্বকে বলা হয় লেন্স-এর কিরণ কেন্দ্রান্তর বা ফোকাল দৈর্ঘ্য (focal length)।

শুধু সূর্যের আলো যেখানে ঘনীভূত হয় আতস থেকে সেই দূরত্বকেই ফোকাল লেংথ বলতে হবে সে কথা ভাবলে একটু ভুল হবে। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত সমান্তরাল আলোক রশ্মি আতসের মধ্য দিয়ে গিয়ে যেখানে ঘনীভূত হয় আতস থেকে সেই দূরত্বকে বলে ফোকাল লেংথ। সূর্য এত দূরে যে তার আলো সমান্তরাল ভাবে আসে। নক্ষত্রের
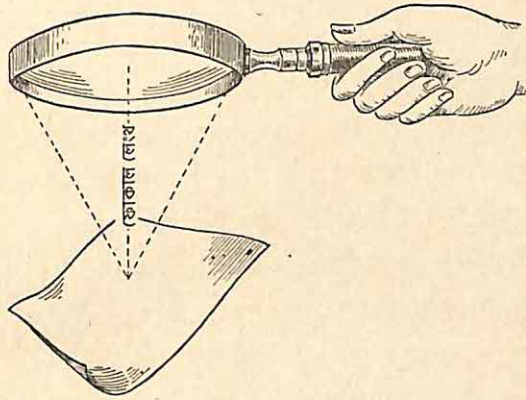
চিত্র—২ : লেন্স দিয়ে সূর্যের আলো জড়ো করা।

আলোর বেলাও সে কথা খাটে। কিন্তু নক্ষত্রের আলো আমাদের কাছে ক্ষীণ বলে সূর্য দিয়ে উদাহরণ দিতে ও বুঝতে সুবিধা।

আতস কাচের দু-রকম ব্যবহারের কথা বললাম : ছোটকে বড় করে দেখা এবং দূরের বস্তুর প্রতিচ্ছবি কাছে সৃষ্টি করা। আতসের এই দুটি গুণের সংযোগেই দূরবীনের সৃষ্টি। চোঙের সামনে একটি বড় আতস, পিছনে আর একটি ছোট আতস। সামনের আতস দূরের জিনিসের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে চোঙের মধ্যে, সেই প্রতিচ্ছবিকে বাড়িয়ে দেখা যায় পিছনের ছোট আতসটির মধ্য দিয়ে।

দূরবীনের সামনের আতসকে বলে লক্ষ্যকাচ (object glass বা objective), চোখের কাছেরটির নাম অক্ষিকাচ (eye piece)। আই-পীসের, বা অক্ষিকাচের ফোকাল লেংথ যত ছোট হবে তার পরিবর্ধন শক্তি (magnifying power) সেই অনুপাতে বেশী হবে। আবার সামনের

অবজেক্টিভ লেন্সের ফোকাল লেংথ যত লম্বা হবে তার সৃষ্ট প্রতিচ্ছবিও প্রথমেই সেই অনুপাতে বড় হয়ে পড়বে। এই দুই ব্যাপার জড়িয়ে দূরবীনের পরিবর্ধন শক্তি। দূরবীনের দৃষ্টি বা প্রতিচ্ছবি কতগুণ বড় হয়ে দেখাবে তা অবজেক্টিভ আতসের বা লক্ষ্যকাচের ফোকাল লেংথকে আইপীসের ফোকাল লেংথ দিয়ে ভাগ করলেই জানা যাবে। যেমন, অবজেক্টিভের ফোকাল লেংথ যদি ছ-ইঞ্চি আর আইপীসের ফোকাল লেংথ যদি দু-ইঞ্চি হয় তা'হলে এই ছোট দূরবীনের পরিবর্ধন শক্তি হবে ৬÷২=৩ গুণ। বাইনোক্যুলারে এই রকম হয়। বাইনোক্যুলার মূলতঃ দূরবীন ছাড়া আর কিছু নয়, সাধারণতঃ তিন থেকে ছয় পর্যন্ত পরিবর্ধন শক্তি দেয়। আর একটু বড় দূরবীনে যদি অবজেক্টিভের ফোকাল লেংথ ২ ফুট বা ২৪ ইঞ্চি হয়, আইপীসের হয় ২ ইঞ্চি, তাহলে ঐ দূরবীনের পরিবর্ধন শক্তি হবে ২৪÷২=১২; আইপীসটা বদলে যদি আধ ইঞ্চির ফোকাল লেংথ বসানো হয় তাহ'লে দূরবীনের পরিবর্ধন শক্তি হয়ে দাঁড়াবে ২৪÷½=৪৮ গুণ।

এইভাবে দূরবীনের পরিবর্ধন শক্তি যেমন খুশি বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু পরিবর্ধন শক্তি বাড়ালেই যে জোরাল দূরবীন হবে তা নয়। সামনের আতসের আকার না বাড়িয়ে যদি শুধু আইপীসের সাহায্যে (অর্থাৎ আইপীসের ফোকাল লেংথ ছোট করে) পরিবর্ধন শক্তি বাড়ানো হয় তাহ'লে প্রতিচ্ছবি অনুজ্জ্বল অস্পষ্ট হবে। কারণ, মূলতঃ সামনের অবজেক্ট লেন্স-এর মধ্য দিয়ে যেটুকু আলো ঢুকছে তা দিয়েই দূরবীনের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা না বড় করলে প্রতিচ্ছবির উজ্জ্বলতা বাড়বে না। সম্মুখের আতসটি যত বড় আকারের হবে দূরবীনের আলো জড়ো করবার ক্ষমতাও (light gathering power) তত বেশী হবে, পরিবর্ধন শক্তিও সেই অনুসারে বাড়ানো চলবে প্রতিচ্ছবিকে উজ্জ্বল রেখে।

আমেরিকার লিক্ মান মন্দিরে (Lick Observatory) একটি দূরবীন আছে তার সুমুখের আতসটির ব্যাস (diameter) তিন ফুট। দূরবীনের উপযোগী বড় আতস কাচ বা লেন্স তৈরী করা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ। পাঁচ ছয় ফুট ব্যাসের ভালো আতস তৈরী করা প্রায় অসম্ভব। আতসের

পরিবর্তে অবতল মুকুর বা আয়না (concave mirror) ব্যবহার করা যায় অবজেক্ট গ্লাস হিসাবে। এই জাতীয় দূরবীন আবিষ্কার করেন নিউটন ১৬৭২ খৃস্টাব্দে। চোখের কাছে আইপীস অবশ্য একই ধরনের আতস ব্যবহার হয়। এই রকম দূরবীনকে বলে প্রতিফলক দূরবীন বা নিউটনীয় দূরবীন। বর্তমানে প্রতিফলক দূরবীন তৈরী হয়েছে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের প্রতিফলক দিয়ে। এটাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দূরবীন যন্ত্র এটা তৈরী হয়েছে (১৯৪৭) আমেরিকায়, বসানো হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার
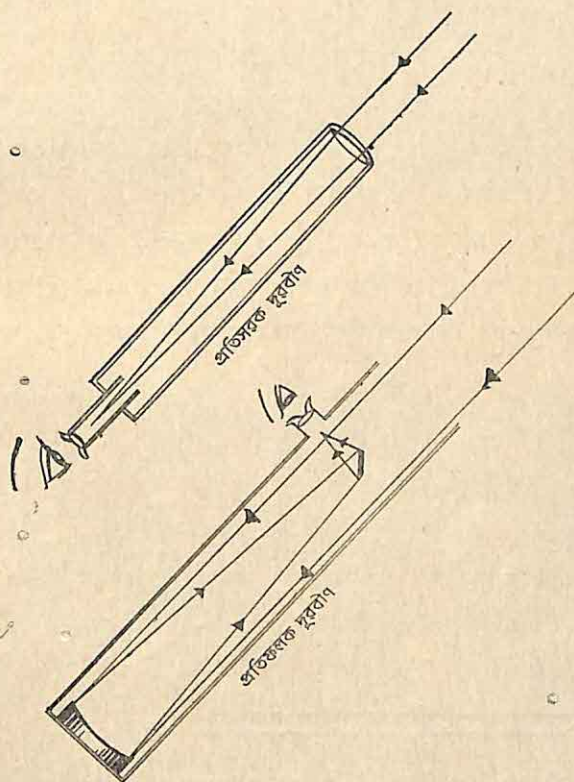
চিত্র—৩ : প্রতিসরক ও প্রতিফলক দূরবীন।

মানমন্দিরে। খালি চোখে যতটা আলোর সাহায্য পাই, এই ২০০ ইঞ্চি (১৬ ফুট ৮ ইঞ্চি) ব্যাসের দূরবীনে তার চল্লিশ লক্ষ গুণ পাওয়া যায়।

এই দূরবীনের সঙ্গে ফোটো তুলবার ও আলোক বিশ্লেষণ করবার যন্ত্রপাতি লাগানো আছে।

সূর্য, নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদির ফোটো ছাড়া তাদের আলো বিশ্লেষণ করা আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এই আলোক বিশ্লেষণের সাহায্যে তাদের গঠন উপাদানের খবর জানা যায়। এই সকল জ্যোতিষ্ক জ্বলন্ত বাষ্প দিয়ে তৈরী। এই সব জ্বলন্ত পিণ্ড থেকে আলো আসছে কোটি কোটি মাইল দূর থেকে। তাদের খবর জানতে হলে তাদের পাঠানো আলোর মধ্য থেকেই যা কিছু খবর বার করে নিতে হবে। বেশীর ভাগ নক্ষত্রই ঝক্‌ঝকে সাদা। আমাদের সূর্য একটি নক্ষত্র বিশেষ, এর রং (আলো) মোটামুটি সাদা, তবে একটু হল্‌দে ভাবের। কোন কোন্ তারা বেশ হল্‌দে রঙের, আবার কয়েকটি বেশ লাল রঙের, নীল সবুজও আছে।

চোখে দেখা এই রঙের তারতম্য থেকে বিশেষ কিছু বলা যায় না। ত্রিপার্শ্ব কাচ বা প্রিজ্‌ম্ (prism) দিয়ে আলোর রং বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। নিউটন এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি দেখালেন প্রিজ্‌ম্-এর এক পাশ দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকলে অন্য পাশ দিয়ে
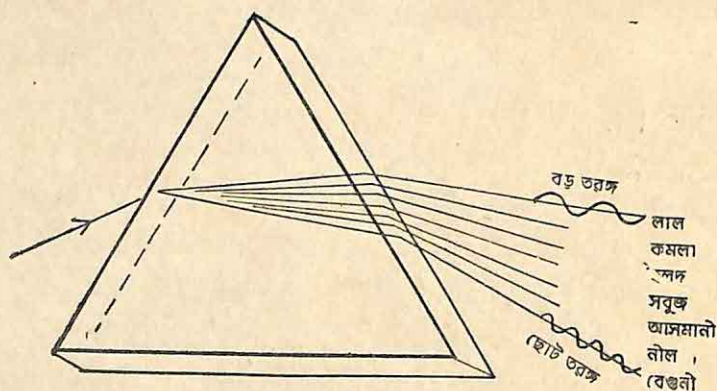
চিত্র—৪ : প্রিজম্ দিয়ে সাদা আলোর রং ভেঙে বর্ণালী সৃষ্টি করা।

বেরিয়ে আসতে রামধনুর রঙে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর নাম আলোর বর্ণালী বা স্পেক্‌ট্রাম (spectrum)। মূল আলোতে রঙিন আলো মিশে আছে, প্রিজ্‌ম্ তাদের পৃথক করে দিয়ে বর্ণালী সৃষ্টি করল। সাদা আলো
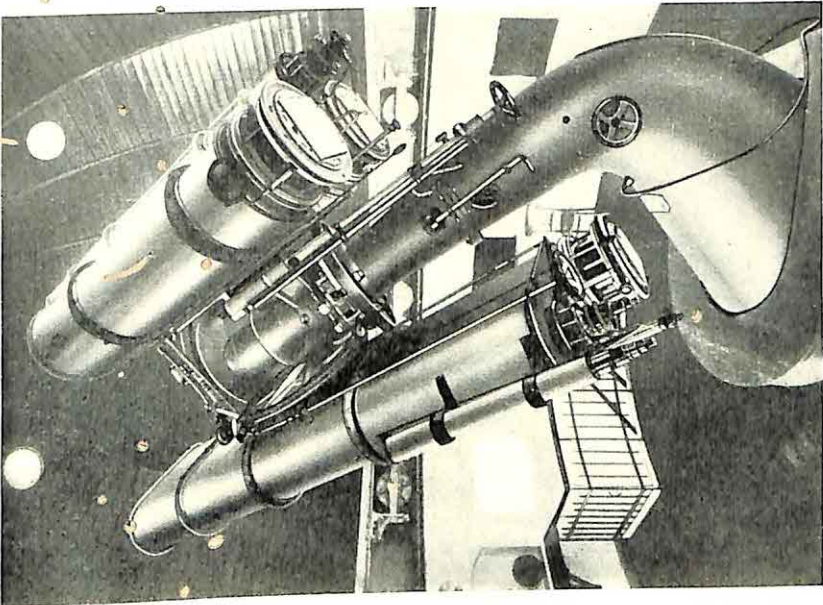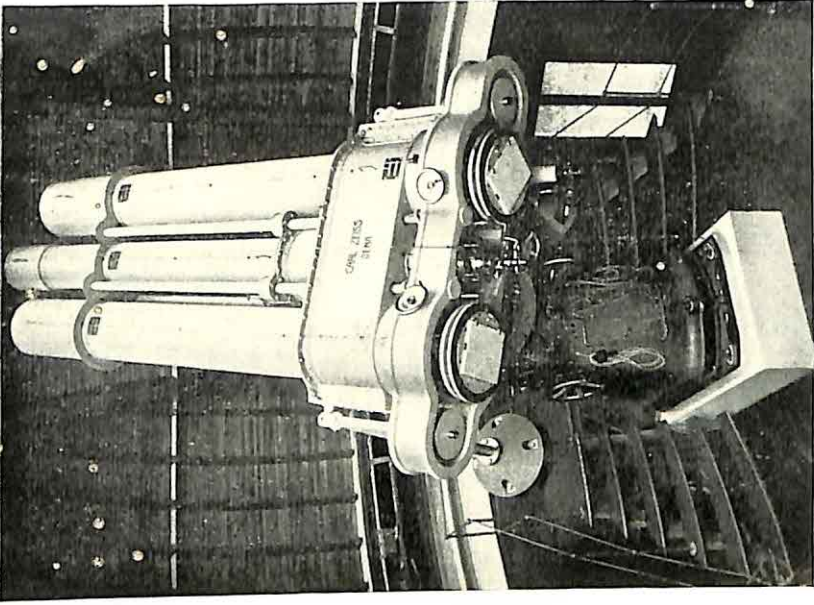
প্রতিসরক দূরবীণ
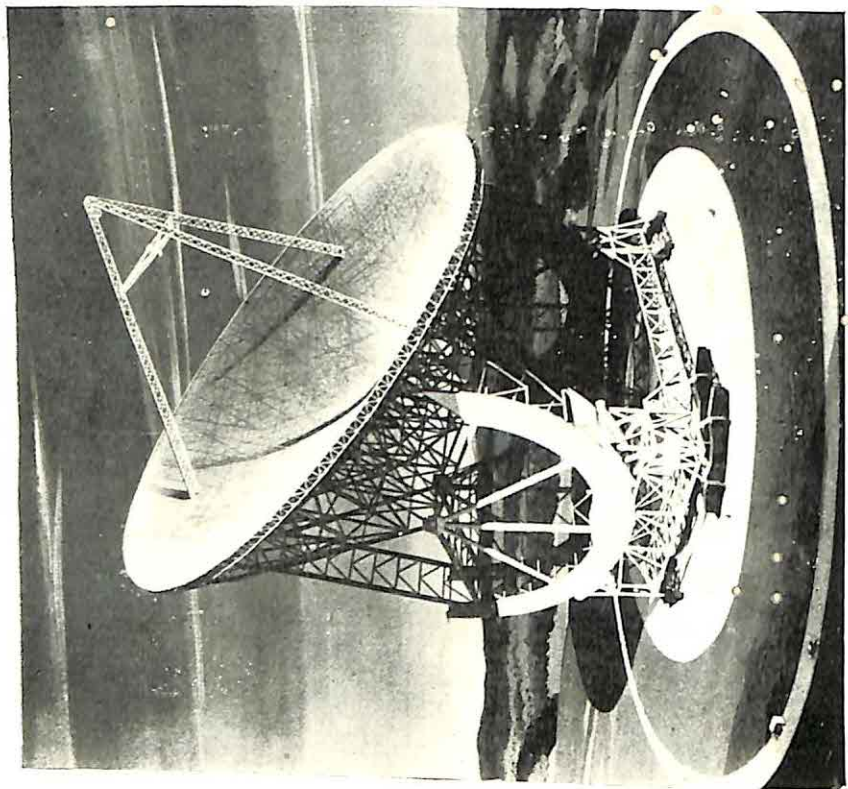
বেতার দূরবীণ (রেডিও টেলিস্কোপ)
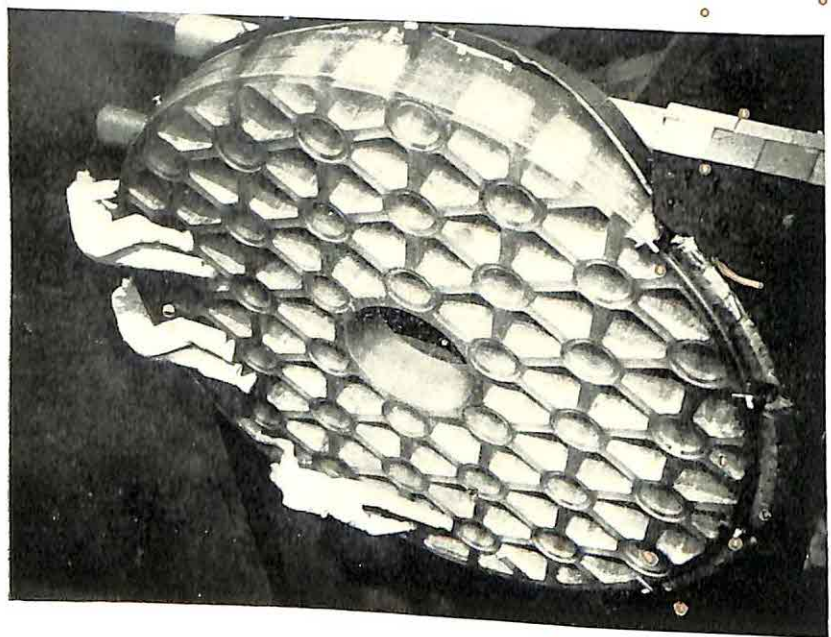
২০০ ইঞ্চি প্রতিফলক কাচের পিছন দিক

ফোটো: লেখক

নানান রঙিন আলোর সংমিশ্রণ। সূর্যের আলো একটু হলদে ছাটের।
এর অর্থ, হলুদ রঙের আলোর প্রাধান্য একটু বেশী, কিন্তু অন্য রঙও আছে।
অন্য রঙ আছে বলেই রামধনুতে সাতটি রং দেখতে পাই, প্রিজ্‌ম্‌-এর মধ্য
দিয়েও ঐ রকম রঙের স্তর বা বর্ণালী সৃষ্টি হয়। নক্ষত্রের আলোও প্রিজ্‌ম
দিয়ে বর্ণালীতে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম ধাপে মূল আলোকে বর্ণালীতে বিভক্ত করা গেল। এই বর্ণালী
থেকে কী বুঝব? বিভিন্ন উত্তপ্ত ও জ্বলন্ত বস্তু থেকে যে সব আলো আসে
তাদের বর্ণালীর মধ্যে পার্থক্য থাকে, রঙের পার্থক্য, বিভিন্ন রঙের
অনুপাতের পার্থক্য, বিভিন্ন জাতের রঙিন রেখা বা বর্ণালী রেখার (spectral
line) পার্থক্য ইত্যাদি। এই সকল পার্থক্য নির্ভর করে নানা বিষয়ের
উপর ; যেমন, উত্তপ্ত বা জ্বলন্ত বস্তুর মূল উপাদান (অক্সিজেন, লৌহ,
ক্যালসীয়াম ইত্যাদি), উত্তাপ (temperature), চাপ (pressure)
ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকেরা বহু পরীক্ষা করে একে একে আবিষ্কার করেছেন
কোন্ বস্তু কোন্ অবস্থায় কী ধরনের বর্ণালী আলো দেয়। অতএব এখন
বর্ণালী থেকে বস্তু ও বস্তুর অবস্থা জানা সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক
মেঘনাদ সাহা সূর্যের বর্ণালীর বিশেষত্ব পরীক্ষা করে সৌর ও নাক্ষত্রিক
গ্যাসের নানা তথ্য নিরূপণ করেন।

এ যেন কণ্ঠস্বর শুনে মানুষকে চিনতে পারা। প্রত্যেক মানুষের গলার
স্বর এক এক বিশেষ ধরনের, প্রত্যেক জ্বলন্ত (বা উত্তপ্ত) বস্তুর আলোর
রং (বর্ণালী অনুসারে) এক এক ধরনের। বাদ্যযন্ত্র না দেখেও শুধু বাজনা
শুনে বোঝা যায় কোন্‌টা বেহালার আওয়াজ, কোন্‌টা হার্মোনিয়ামের,
কোন্‌টা সেতারের, কোনটা পিয়ানোর, কোন্‌টা বাঁশীর, কোন্‌টা সানাইয়ের।
প্রত্যেকের স্বরের বা সুরের ধরন বা গুণ আলাদা। কেন হয়?

কারণ, সব স্বরেই মিশ্র সুর আছে। মিশ্র সুরের ধরন থেকেই বাজনা বা
কণ্ঠস্বরের পার্থক্য বোঝা যায়। শব্দ সৃষ্টি হয় কোন না কোন জিনিস দ্রুত-
হারে কাঁপলে। ঘণ্টায় ঘা মারলে কাঁপতে থাকে, হাত দিলেই বোঝা যায়।
বেহালার ছড় টানলে বেহালার তার কাঁপতে থাকে, তা চোখেই দেখা যায়।
এই কম্পন থেকে বাতাসে তরঙ্গ ওঠে, এই শব্দ তরঙ্গ কানে গেলে আমরা

শব্দ শুনতে পাই। শুধু বাতাসেই শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে তা নয়, জলেও হতে পারে। ইটের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে, কাঁচের শার্শির মধ্য দিয়েও শব্দ তরঙ্গ যেতে পারে।

শব্দতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ওপর শব্দের সুর (pitch) নির্ভর করে। তরঙ্গ যত ছোট হয়, অর্থাৎ কম্পনহার যত বাড়ে সুরও তত চড়া হয়।

আলোও একপ্রকার তরঙ্গ তবে বাতাসের বা জলের নয়। আলোক তরঙ্গের মধ্যে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ধর্ম আছে। জলন্ত বা উত্তপ্ত বস্তুর অনু-পরমাণু থেকে এই আলোক তরঙ্গ আসে, অনুপরমাণুর মধ্যেও বৈদ্যুতিক কণার (২০শ অধ্যায়) আলোড়ন বা স্থানচ্যুতি থেকে এই তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর আলোর রঙ নির্ভর করে যেমন শব্দের সুর নির্ভর করে
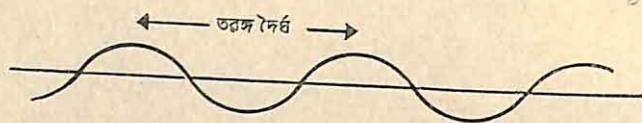
চিত্র—৫ : তরঙ্গ।

শব্দ তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর। এ হিসাবে শব্দের সুর আর আলোর রঙ তুলনাযোগ্য। বলা যেতে পারে, সুর হ'লো শব্দের রঙ, বা রঙ হলো আলোর সুর।

সাদা আলো বা মিশ্র-আলোককে প্রিজ্‌ম্ দিয়ে মূল রঙ্গে বিভক্ত করে নেওয়া যায় সেকথা আগে বলেছি। বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (wave length) বা বিভিন্ন কম্পন হারের (frequency of vibration)। কম্পন যত দ্রুত হারে হয়, তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও সেই অনুপাতে ছোট হয়। আমরা যতগুলি বর্ণ চোখে দেখি তাদের মধ্যে লাল রঙের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়, বেগুনীর সবচেয়ে ছোট। রামধনুর সাতটি রঙ ঃ বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল ; মনে রাখবার জন্য আদ্যাক্ষর নিয়ে ছাত্ররা মুখস্ত করে 'বেনীআসহকলা', ইংরেজীতে করে vibgyor অর্থাৎ violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। বেগুনীর সবচেয়ে ছোট আলোক তরঙ্গ, লালের সবচেয়ে বড়, অন্য

রঙের আলোগুলির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য স্থান অনুসারে যথাক্রমে ছোট থেকে বড়র দিকে।

যে যন্ত্র দিয়ে আলোক বিশ্লেষ করা যায় এবং বিশ্লেষণ বা বিভক্ত করে বর্ণালীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপা যায় তাকে বলে বর্ণালীমান যন্ত্র (spectrometer)।

বৈজ্ঞানিকরা নানান জিনিস জ্বালিয়ে তাদের আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করেছেন, তাদের ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মেপেছেন। বর্ণালীর তালিকা বা ছক (spectral tables, charts) তৈরী হয়েছে। এই তালিকা বা ছকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই নতুন জিনিসের আলোর বর্ণালী থেকে তার গঠন বস্তুর হদিস পাওয়া যায়।

সূর্যের আলো বিশ্লেষণ করে এই ভাবে জানা গিয়েছে সেখানে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ, এলুমিনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ (chemical elements) জ্বলন্ত অবস্থায় আছে। নক্ষত্র ও নীহারিকার আলোর বর্ণালী মেপে তাদেরও গঠন উপাদান জানা গিয়াছে। আশ্চর্যের কথা, বিশ্বের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস, অন্যান্য দ্রব্য শতকরা মাত্র দশ ভাগ হতে পারে।

তালিকায় কয়েকটি জ্বলন্ত দ্রব্যের আলোর প্রধান প্রধান বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া হ'লো।

জ্বলন্ত দ্রব্য	প্রধান বর্ণ	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটার	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আংষ্ট্রম মাত্রা
ক্যাড্মিয়াম	লাল	০·০০০০৬৪৩৮৫	৬৪৩৮·৫
সোডিয়াম বা সাধারণ লবণ	হলুদ	০·০০০০৫৮৯৬(D_1) ও ০·০০০০৫৮৯০(D_2)	৫৮৯৬·০ / ৫৮৯০·০
পারদ	সবুজ	০·০০০০৫৭৬৯৬	৫৭৬৯·৬
ক্যালসিয়াম	বেগুনী	০·০০০০৩৯৬৮৪(H) ও ০·০০০০৩৯৩৩৬(K)	৩৯৬৮·৪ / ৩৯৩৩·৬

তালিকা—২ : আলোর রং ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

আলোক তরঙ্গ অতি ক্ষুদ্র। এই কারণে আংস্ট্রম নামে একজন সুইডেন দেশীয় বৈজ্ঞানিকের মতানুসারে আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটারের কোটিতম অংশ হিসাবে মাপা হয়, এই সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্যমানকে বলা হয় আংস্ট্রম। এক কোটি আংস্ট্রম মাত্রায় এক মিলিমিটার, বা দশ কোটি আংস্ট্রম মাত্রায় এক সেন্টিমিটার হয়।

বর্ণালীতে বা রামধনুতে বেগুনী থেকে লাল অবধি নানা রঙ দেখতে পাই। তাহলে সব আলোই কি এই ক'টি রঙের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ? না। প্রিজম্ দিয়ে সৃষ্টি করা বর্ণালীর পথে ফোটো প্লেট বা ফিল্ম ধরলে বর্ণালীর ছাপ বা ছবি উঠবে। এই ভাবে ছবি নিতে গিয়ে দেখা যায় বর্ণালীর বেগুনী সীমা ছাড়িয়েও কিছু দূর অবধি ফোটোতে আলোর ছাপ পড়ছে। তাহলে এখানে আলো আসছে। সে আলো চোখে দেখতে পাই না; কিন্তু ফোটোতে তার অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। এই আলোকে বলা হয় অতি-বেগুনী (ultra violet), এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুনীর চেয়েও ছোট।

একটা জিনিস প্রমাণ হলো, সব আলোই চোখে দেখা যায় না। লাল থেকে বেগুনী অবধিই শুধু চোখে দেখা যায়, অর্থাৎ যে সব আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মোটামুটি বলতে গেলে ৪০০০ থেকে ৬৫০০ আংস্ট্রম মাত্রার মধ্যে তাদেরই কেবল চোখে দেখা যায়।

বর্ণালীর বেগুনী সীমা ছাড়িয়ে অদৃশ্য অতি বেগুনী আলোর সন্ধান পাওয়া গেল ফোটোর সাহায্যে। প্রশ্ন উঠল, লাল সীমা ছাড়িয়েও কি কোন অদৃশ্য আলো আছে? থাকা সম্ভব বলে মনে হলো। কিন্তু সাধারণ ফোটো প্লেটে কোন ছাপ উঠল না সেদিকে। বৈজ্ঞানিকরা আশা ছাড়লেন না। ভাবলেন, আলো একপ্রকার শক্তি, আলো দেয় উত্তাপ। বর্ণালী বরাবর থার্মোমিটার ধরলেন চোখে দেখা লাল সীমার বাইরে। কোন রঙ দেখা যায় না, আলো দেখা যায় না কিন্তু থার্মোমিটারে উত্তাপ মাত্রা উঠতে লাগল। তাহলে এদিকেও অদৃশ্য আলো আছে তার প্রমাণ হলো। এর নাম দেওয়া হ'লো অবলোহিত (infra red) আলোক। একে তাপরশ্মিও (heat rays) বলে। অবলোহিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লালের চেয়ে বড়।

পরে বৈজ্ঞানিকরা ফোটো প্লেট ও ফিল্ম তৈরী করবার এমন রাসায়নিক মশলা আবিষ্কার করলেন যা দিয়ে অদৃশ্য অবলোহিত আলোরও ফোটো তোলা যায়।

এই সব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে বৈজ্ঞানিকরা নানান বস্তুর আলোর বর্ণালী নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন, শুধু দৃশ্যমান আলো স্তরেই নয়, অতি বেগুনী এবং অবলোহিত আলোক স্তরেও। এতে জলন্ত উত্তপ্ত বস্তুর অবস্থা ও গঠন উপাদান আরও সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করা সম্ভব হলো।

প্রিজম্-এর মধ্য দিয়ে মিশ্র রঙের আলো গেলে কেন বর্ণালীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে তা একটু বলি। নানা প্রকার স্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে আলো যেতে পারে, যেমন, বাতাস, কাচ, জল, প্লাস্টিক ইত্যাদি। এরা আলোর বিভিন্ন 'মাধ্যম' (medium)। যখন আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে তেরছা হয়ে ঢোকে তখন একটু দিক পরিবর্তন করে। এই ব্যাপারকে বলে আলোর প্রতিসরণ (refraction)। প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে ঢুকে কতটা বেঁকবে তা নির্ভর করবে ঐ দুই বস্তুর ঘনত্বের উপর। আরও একটি কারণের উপর আলো বাঁকবার বা প্রতিসরণের মাত্রা নির্ভর করে, সেটা হ'লো আলোর রঙ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর। লাল আলো দ্বিতীয় মাধ্যমে ঢুকতে অল্প বাঁকে, কমলা রঙ আর একটু বেশী, হলুদ আরও একটু বেশী, সবুজ তার চেয়েও বেশী বাঁকে ইত্যাদি। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল সবচেয়ে কম আর বেগুনী সবচেয়ে বেশী বাঁকে, অর্থাৎ বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর অল্প এবং ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর বেশী প্রতিসরণ হয়।

এই কারণে সাদা আলো বা মিশ্র আলো দ্বিতীয় মাধ্যমে ঢুকলে মূল রঙের আলোকরশ্মিগুলি নিজের নিজের আলাদা পথে বেঁকে চলতে থাকে। এইভাবে রঙ পৃথক হয়, বর্ণালী সৃষ্টি হয়। বাতাসের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো আসছিল, পড়ল কাচের প্রিজমের মধ্যে, দিক পরিবর্তন বা প্রতিসরণ হলো, বিভিন্ন রঙের আলো নিজের নিজের পথ বেছে নিল, বর্ণালী হলো।

আলো যে শুধু বাতাস, কাচ, জল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাদের অবলম্বন করে যেতে পারে তা নয়, কিছু-না-র মধ্য দিয়েও আলো চলে, অর্থাৎ মহা-

শূন্যের মধ্য দিয়েও চলতে পারে—কোন জড়পদার্থের অবলম্বন প্রয়োজন হয় না। সূর্য বা গ্রহনক্ষত্রদের সঙ্গে পৃথিবীর কোনও জড়বস্তু বা বাতাসের সংযোগ নেই, আমাদের ও তাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও শূন্যতা (vacuum) রয়েছে। সেই মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে আলো আসছে। নক্ষত্র ও নীহারিকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় শুধু আলো দিয়ে।

সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক আলো ছাড়াও আর একটি আছে। তাপ? না। কারণ, তাপ তো আলোরই একটা রূপ। অন্য সম্পর্ক সূর্যের টান বা মাধ্যাকর্ষণ। এ সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। এখন আলো সম্বন্ধে আর একটা কথা বলে শেষ করি।

আলোর প্রচণ্ড গতিবেগ সম্বন্ধে ধারণা করা দুষ্কর। বৈজ্ঞানিকরা বহু কষ্টসাধ্য উপায় উদ্ভাবন করে পরিমাপ করতে সমর্থ হয়েছেন। আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। এত বেগে আর কিছু যেতে পারে না।

পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫,০০০ মাইল। তাহলে এক সেকেণ্ডে আলো পৃথিবীকে সাড়ে সাত বার ঘুরে আসতে পারতো। কিন্তু আলো সরল রেখায় যায়। সূর্য আমাদের থেকে ৯,৩০,০০,০০০ মাইল দূরে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে আট মিনিটের চেয়ে একটু বেশী (৮⅓ মিনিট) সময় লাগে।

এক বৎসরে আলোক রশ্মি অতিক্রম করে সুদীর্ঘ পথ ৫৮৭০০০০০০০০০০০ মাইল (৫৮৭ সংখ্যার পরে দশটি শূন্য)। এই দৈর্ঘ্যকে বলে আলোক বর্ষ (light year)। ইঞ্চি, ফুট, মাইল ইত্যাদি যেমন সাধারণ দৈর্ঘ্যের মাত্রা, জ্যোতিষ্ক জগতের দূরত্বের মাপকাঠি তেমনি আলোক-বর্ষ, না হলে মাইল হিসাবে বলতে গেলে সংখ্যা সামলানো যায় না। ধ্রুবতারার দূরত্ব সাতচল্লিশ আলোক বর্ষ, অর্থাৎ ধ্রুবতারা থেকে আমাদের কাছে আলো আসতে লাগে সাতচল্লিশ বছর। তার মানে আজ ধ্রুবতারাকে যে আলোর সাহায্যে দেখছি সে আলো রওনা হয়েছিল সাতচল্লিশ বছর আগে। মাইল হিসাবে ধ্রুবতারার দূরত্ব ৪৭ × ৫৮৭০০০০০০০০০০০ মাইল বা ২৭৫৮৯ হাজার কোটি মাইল। তাহ'লে 'আলোক বর্ষ' হিসাবে বলাই সুবিধা।

সংক্ষিপ্তসারঃ এই অধ্যায়ে কয়েকটি বিজ্ঞানের মূলকথা বলা হয়েছে যেগুলি মনে রাখা প্রয়োজন—

(১) আলোক রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে যায়। এক বছর ধরে আলোক রশ্মি যে পথ অতিক্রম করে তাকে বলে এক আলোক বর্ষ। আলোক বর্ষ দূরত্বের মাপকাঠি, সময়ের মাপকাঠি নয়। মাইল হিসাবে এক আলোক বর্ষ = ৫৮৭০০০০০০০০০০ মাইল।

(২) আলোক এক প্রকার তরঙ্গ। এই তরঙ্গে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ধর্ম আছে, সে কারণে আলোক তরঙ্গকে বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ বা ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ (electro magnetic wave) বলে। আলোক স্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে এবং মহাশূন্যের মধ্য দিয়েও যেতে পারে।

(৩) বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোক তরঙ্গ বিভিন্ন বর্ণনাভূতি জাগায়। লালের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বড়, বেগুনী আলোর তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত ছোট।

(৪) প্রিজ্‌ম্‌-এর সাহায্যে মিশ্র কিরণের প্রত্যেকটি বর্ণের আলো পৃথক করা যায়। মিশ্রকিরণ এইভাবে বিভক্ত হয়ে যে রঙের স্তর সৃষ্টি করে তাকে বলে বর্ণছত্র বা বর্ণালী (spectrum)। বর্ণছত্র বিশ্লেষণ ও পরিমাপাদি করবার যন্ত্রকে বলে বর্ণালীমান যন্ত্র (spectrometer)।

(৫) চোখে দেখা রঙীন বর্ণালীর দুই সীমা ছাড়িয়েও অদৃশ্য আলোর বর্ণালী পড়ে। বেগুনী সীমার দিকে অদৃশ্য আলোর নাম অতি বেগুনী (ultra voilet) এবং লালের সীমার দিকে অদৃশ্য আলোর নাম তাপরশ্মি বা অবলোহিত (infra red) আলো।

(৬) বিভিন্ন দ্রব্য জ্বলে যে আলো দেয় সেই আলো বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণালী দেখা যায়। এই কারণে বর্ণালী পরীক্ষা করে জ্বলন্ত বা উত্তপ্ত বস্তুর গঠন উপাদান ও অন্যান্য অবস্থা জানতে পারা যায়।

(৭) সমান্তরাল আলোকরশ্মি (যেমন, সূর্যকিরণ, নক্ষত্রালোক ইত্যাদি) আতস্ কাচ ও নতোদর (বা অবতল) আয়না থেকে বিন্দুবৎ ঘনীভূত হয় তাকে বলে ফোকাস বা কিরণ কেন্দ্র। আতস বা আয়না থেকে ফোকাসের দূরত্বকে বলে ফোকাল লেংথ।

(৮) আতস বা কনভেক্স লেন্স-এর সাহায্যে দূরবর্তী বস্তুর ক্ষুদ্রায়তন প্রতিচ্ছবি ফোকাসের কাছাকাছি সৃষ্টি করা যায়। আবার আতসের মধ্য দিয়ে নিকটবর্তী ক্ষুদ্র বস্তুকে বর্ধিতায়তন দেখায় (এ ক্ষেত্রে লেন্সকে এমন কাছে ধরতে হবে যাতে ক্ষুদ্র বস্তুটি ফোকাল লেংথ-এর ভিতরে আসে)। দুটি আতসের সাহায্যে দূরবীন গঠিত হয়, চোঙের সামনের আতসটি বড় আকারের ও বড় ফোকাল লেংথ-এর, আইপীসের লেন্সটি ছোট আকারের ও ছোট ফোকাল লেংথ-এর। খুব বড় দূরবীনে সামনের আতসের পরিবর্তে অবতল দর্পণ (concave mirror) ব্যবহার করা হয়।

(৯) চোখের ভিতরে আতস কাচের মতো একটি কোমল স্বচ্ছ মণি বা লেন্স আছে। এই লেন্স বাইরের বস্তুর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে অক্ষিপটের (retina) উপর ঐ ছবি ফেলে। অক্ষিপটের স্নায়ুজাল (optic nerves) ঐ প্রতিচ্ছবির অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়, তখন আমরা দেখতে পাই।

অধ্যায়—৪

সৌরজগৎ ও মাধ্যাকর্ষণ

প্রাচীনকালে মানুষের কাছে পৃথিবীটা ছিল অতি দুর্বোধ্য, অজানা। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র ছিল অতি বিস্ময়ের বস্তু। তবু তাঁদের মনে ধারণা জন্মেছিল পৃথিবীটা অসীম নয়, এর একটা আকার আছে (মোটামুটি সমতল), সীমাও আছে। প্রশ্ন উঠল, তাহলে পৃথিবীটা সৃষ্টির কোথায় এবং কী ভাবে রয়েছে? তখন ধারণা ছিল পৃথিবীটা সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, কোন বস্তুকে স্থিরভাবে রাখতে গেলে তাকে অন্য কোন জিনিসের উপর বসিয়ে রাখতে হয়। তাহলে পৃথিবীটা কিসের উপর রাখা আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর পুরাণের গল্পের মধ্য দিয়ে নানা দেশে নানা ভাবে দেওয়া হয়েছে। আমাদের পুরাণে বলে বাসুকির ফণার উপর অথবা কূর্মরূপী (কাছিম) ব্রহ্মার পিঠের উপর পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দেশে ভাবত পৃথিবীটা একটা পাতার মতো, জলে ভাসছে। কেউ কেউ ভাবত পৃথিবীটা মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে অনবরতই পড়ে যাচ্ছে। একটু ভাবলেই বোঝা যায় এই সব উত্তরের মধ্যে যুক্তির গলদ আছে। পৃথিবী যদি অন্য বস্তু (বাসুকীর ফণা, কূর্মর পিঠ বা জল) ছাড়া দাঁড়াতে না পারে, তাহলে পৃথিবীকে যে ধরে থাকবে তারই বা দাঁড়ানোর যায়গা কোথায়? বাসুকী কোথায় দাঁড়িয়ে? পৃথিবীর ভাসবার জল কোথায় কী ক'রে দাঁড়ালো? আবার, যদি মেনে নেওয়া যায় পৃথিবীটা অনবরতই পড়ে যাচ্ছে তাহলে প্রশ্ন উঠবে কোন দিকে পড়ছে? সব দিকই তো সমান।

ক্রমে ক্রমে প্রমাণ হলো পৃথিবীটা স্থিরও নয় সৃষ্টির কেন্দ্রও নয়। কোপার্নিকাসের সময় থেকে জানা গেল সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি ঘুরছে,

তাদের মধ্যে পৃথিবীও একটি গ্রহ।

গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য কী? কী করে চেনা যায়? গ্রহ ও নক্ষত্র অনেকটা একই রকমের দেখায়। কিন্তু কয়েক রাত্রি ধরে নজর রাখলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে কয়েকটি তারার মতো জ্যোতিক অন্য সব তারার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পূব দিকে সরে যাচ্ছে, অন্যগুলি পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের সম্পর্ক কখনো বদলাচ্ছে না। যে কটি ধীরে ধীরে চলে বেড়াচ্ছে সেগুলিই গ্রহ, স্থিরগুলি নক্ষত্র।

নক্ষত্রগুলি 'স্থির', কিন্তু তারাও সন্ধ্যায় পূব আকাশে ওঠে, মধ্যরাতে মাথার উপর আসে, ভোরের দিকে পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। তাহলে 'স্থির' বলে কেন? 'স্থির' এই হিসাবে যে নক্ষত্রদের পরস্পরের ব্যবধান পরিবর্তন হয় না। সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে ধ্রুবতারার দূরত্ব বদলায় না। কিন্তু সব নক্ষত্র একই ভাবে উদয় অস্ত যায়, যেন আকাশে চাঁদোয়ায় গাঁথা নক্ষত্র পটখানি পূব থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। আবার পরের সন্ধ্যায় পূব আকাশে সব নক্ষত্র একে একে ফিরে আসে। নক্ষত্রদের এই উদয়-অস্ত মোটামুটি একদিনে বা চব্বিশ ঘণ্টায় হয়, পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের ফলে। নক্ষত্র খচিত মহাকাশের মাঝে পৃথিবীটা লাটিমের মতো ঘুরছে, এটাকে বলে দৈনিক আবর্তন বা আহ্নিক গতি। এই ঘূর্ণনের জন্য মনে হয় আকাশটাই সব নক্ষত্র নিয়ে ঘুরছে, নক্ষত্রদের উদয় অস্ত হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে নক্ষত্রদের পরস্পর ব্যবধান বদলায় না, এক নক্ষত্র অন্য নক্ষত্রকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখা যায় না এই হিসাবে নক্ষত্ররা স্থির।

স্থির নক্ষত্রপটের মধ্য দিয়ে যেগুলি ধীরে ধীরে চলে বেড়ায় তাদের নক্ষত্র বলে ভুল করা যায় না। এরাই হলো গ্রহ। চার পাঁচ হাজার বছর আগেও যাঁরা আকাশের জ্যোতিষ্ক নিয়ে চর্চা করতেন তারাও ভুল করেন নি। তাঁরাও গ্রহদের চিনতে পেরেছিলেন নক্ষত্রদের থেকে আলাদা করে।

গ্রহরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে নিজের নিজের বেগে, নিজের নিজের কক্ষে (orbit)। সূর্যের সবচেয়ে কাছে ঘুরছে বুধ গ্রহ (Mercury), তারপর যথাক্রমে শুক্র (Venus), পৃথিবী, মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি

(Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Urenus), নেপচুন (Neptune) ও প্লুটো (Pluto)। এখন পর্যন্ত প্লুটোই গ্রহজগতের সীমা, সূর্য থেকে ৩৭২ কোটি মাইল দূরে। এর চেয়েও দূরে আর কোন গ্রহ আছে কিনা এখন কেউ বলতে পারে না। সূর্য থেকে নিকটতম বুধগ্রহ সূর্য থেকে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে থেকে তাকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে পৃথিবী ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।
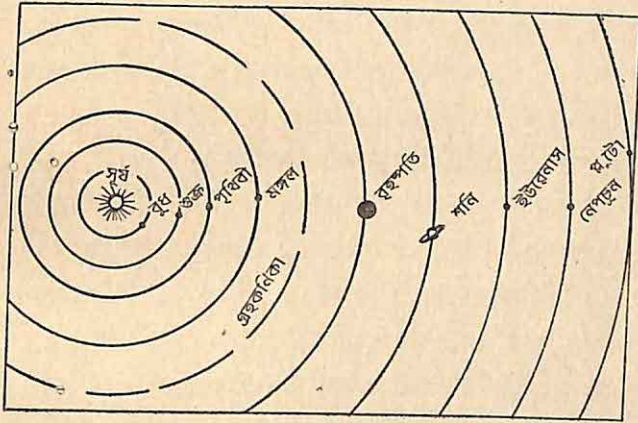
চিত্র—৬ : সৌর পরিবার।

গ্রহগুলি আপন আপন নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে এক একবার প্রদক্ষিণ করে যেমন :—বুধ ৮৮ দিনে, পৃথিবী এক বছরে, বৃহস্পতি ১২ বছরে, ইত্যাদি। সকল গ্রহই আবার আপন আপন মেরুদণ্ডের (axis) উপর লাটিমের মতো ঘুরপাক খায়, এই আবর্তনেরও যার যার নির্দিষ্ট সময় আছে, যেমন পৃথিবী একদিনে বা চব্বিশ ঘণ্টায় একবার, বুধ অষ্টআশি দিনে একবার, শুক্রগ্রহ ত্রিশ ঘণ্টায় একবার, শনিগ্রহ সওয়া দশ ঘণ্টায় একবার ইত্যাদি। পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ বা চন্দ্র, কোন কোন গ্রহের একাধিক চাঁদ আছে, আবার কোনটির একটিও নেই। পরবর্তী অধ্যায়ে এসব কথা বিশদ ভাবে আলোচনা করব।

প্রায় ৭৫০ কোটি মাইল ব্যাসের (diameter) এই সৌর জগতের

মধ্যে একটি সূর্য, নটি গ্রহ, উনত্রিশটি উপগ্রহ, শনির বলয়, অগুণতি গ্রহণিকা (asteroids) এবং নানান উল্কাপিণ্ড রয়েছে। এরা সবাই সৌর জগতের অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি ধূমকেতু বার বার ঘুরে আসে, এদের বলে পর্যাবর্তক ধূমকেতু (periodic comets); এদেরও সৌর পরিবারের মধ্যে ধরা যায়। প্রত্যেকের পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে একে একে পাওয়া যাবে।

গ্রহগুলি সূর্যকে নির্দিষ্ট গতিতে প্রদক্ষিণ করছে, একথা কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করলেন। কিন্তু কেন প্রদক্ষিণ করছে, কেন ওরা সূর্যকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে না, কেন সূর্যের উপর গিয়ে পড়ছে না? নিউটন এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন। প্রত্যেক জড়বস্তু অন্য জড়বস্তুকে টানে, এই টানকে বলে মাধ্যাকর্ষণ। এটা বস্তু মাত্রেরই নিজস্ব ধর্ম, যেমন চুম্বকের ধর্ম লৌহ জাতীয় বস্তুকে আকর্ষণ করা। বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের জোর নির্ভর করে বস্তুর ভর বা বস্তুমানের (mass) উপর, যতবড় সেই অনুপাতে তার মাধ্যাকর্ষণের ক্ষমতা। দু-দশ সের ওজনের বস্তুর টান খুবই অল্প, এত অল্প যে ধরাই যায় না সাধারণ ভাবে। কিন্তু পৃথিবীর মত বড় জিনিসের টান বুঝতে কষ্ট হয় না, এই টানে আর সব জিনিস মাটিতে পড়ে। গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে নিউটনের মনে সর্বপ্রথম ধারণা জন্মায় যে পৃথিবীর টানেই ফলটি মাটিতে পড়ল, এই গল্প প্রচলিত আছে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জোর যথেষ্ট বেশী, কারণ পৃথিবীর বস্তুমান বা জড়মান (mass) বিরাট, ১৬৩ কোটি কোটি কোটি মন। সংখ্যায় লিখতে হলে ১৬৩-র পরে একুশটা শূন্য দিয়ে লিখতে হবে, সংক্ষেপে লেখা যায় ১৬৩×১০^{২১} মণ।

পৃথিবীর চেয়ে সূর্য বড়, অতএব তার মাধ্যাকর্ষণও সেই অনুপাতে বেশী। পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের ওজন ৩৩২০০০ গুণ। এই গুরুভার সূর্য তার মাধ্যাকর্ষণের টানে সব গ্রহকে অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। সবগ্রহ যদি সূর্যকে প্রদক্ষিণ না করত তাহলে সূর্যের টানে সবাই সূর্যের উপর গিয়ে পড়ত। কিন্তু কক্ষপথে (orbit) ঘুরছে বলে সূর্যের উপর গিয়ে পড়ছে না।

ব্যাপারটা অনেকটা দড়িতে ঢিল বেঁধে ঘোরানোর মতো। ঢিলটা ছুটে পালাতে পারছে না কারণ দড়ির টান আছে, আবার দড়ির টানে ঢিলটা হাতের কাছে চলে আসছে না কারণ সে ঘুরছে। ঘুরবার ফলে ঢিলটার একটা ছিটকে পালিয়ে যাবার জোর আসে (অপকেন্দ্রবল বা centrifugal
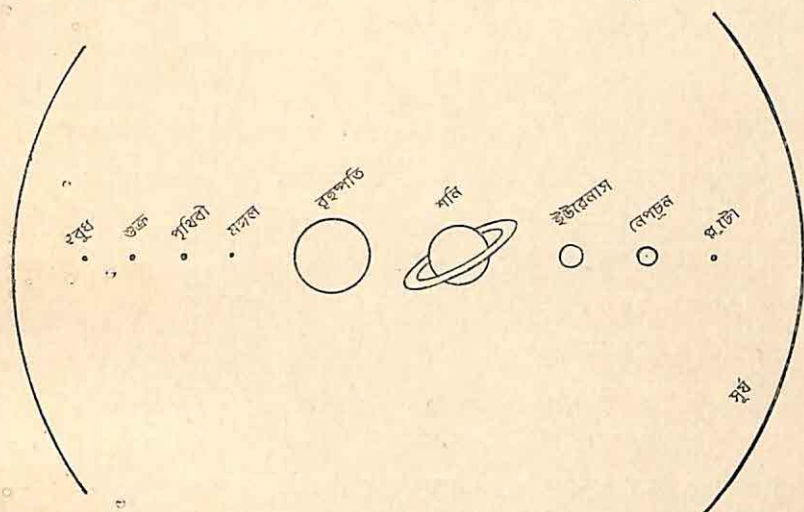
চিত্র—৭ : সূর্যের তুলনায় গ্রহদের আয়তন।

force), দড়ির টানে সেটা নাকচ হয়ে যায়। তেমনি গ্রহরা বৃত্তপথে ঘুরছে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের আওতায়, সূর্যের উপর এসে পড়ছে না, পালিয়ে যেতেও পারছে না।

তেমনি পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে থেকে চাঁদ প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীকে। বৃহস্পতি গ্রহের ১২টি উপগ্রহ বা চাঁদ বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করছে।

বলেছি বস্তু যত গুরুভার হয় তার মাধ্যাকর্ষণের জোরও সেই অনুপাতে বেশী হয়। সৌরজগতের মধ্যে সূর্যই সবচেয়ে বড়, তাই গ্রহগুলি সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের অধীন। আবার আকৃষ্ট বস্তুর দূরত্বের উপরও আকর্ষণের জোর নির্ভর করে। আকৃষ্ট বস্তু যত দূরে থাকে

তার ওপর মাধ্যাকর্ষণও তত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। যেমন শব্দের জোর বা আলোর তেজ দূরদেশে ক্ষীণ হয়ে যায়, সেই রকম। সূর্যের সব চেয়ে কাছে বুধগ্রহ, সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বুধের উপর সবচেয়ে বেশী; প্লুটো সবচেয়ে দূরে, তার উপর সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ সবচেয়ে কম। দূরত্ব যে অনুপাতে বাড়ে, আকর্ষণ তার চেয়েও দ্রুত হারে কমে। দ্বিগুণ দূরত্বে আকর্ষণ অর্ধেক হয় না, এক চতুর্থাংশ হয়ে পড়ে; তিনগুণ দূরত্বে আকর্ষণ এক তৃতীয়াংশ হয় না, এক নবমাংশ হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ ২ গুণ দূরত্বে আকর্ষণ-বল (বা আলো ও শব্দের জোর) ২×২ (=৪) ভাগ, ৩ গুণ দূরত্বে ৩×৩ (=৯) ভাগ, ৪ গুণ দূরত্বে ৪×৪ (=১৬) ভাগ···এই রকম হয়। সূর্য থেকে পৃথিবী যত দূরে, শনিগ্রহ সেই তুলনায় দশগুণ দূরে। তাহলে সূর্য পৃথিবীকে যত জোরে টানছে, শনিগ্রহকে টানছে তার ১০×১০ বা ১০০ ভাগ জোরে। ঘুরিয়ে বলা যায়—সূর্য শনিকে যত জোরে টানছে, পৃথিবীকে তার ১০০ গুণ জোরে টানছে। এই টান কাটিয়ে উঠতে পৃথিবীকে শনির চেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুরতে হচ্ছে সূর্যের চারিদিকে, শনিগ্রহ চলছে ধীরে সুস্থে। পৃথিবী সূর্যকে ঘুরে আসছে এক বছরে, শনি ঘুরছে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ বছর ধরে। সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে প্লুটো গ্রহটি সূর্য প্রদক্ষিণ করছে প্রায় ২৫০ বছরে একবার।

প্লুটো ঘুরছে ৭৫০ কোটি মাইল ব্যাসের চক্রপথে। অর্থাৎ সৌরজগতের বিস্তৃতি ৭৫০ কোটি মাইল। কী বিশাল এই সৌরজগৎ! কিন্তু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় এই স্থানীয় জগৎটি খুবই ছোট, নক্ষত্র জগৎ আরও কত বিস্তৃত, বিরাট। নক্ষত্র জগতের বিশালতা ধারণা করা কঠিন। এই বিশালতার একটু আভাস দিই।

সৌর জগতের বিস্তৃতি সাতশো পঞ্চাশ কোটি মাইল, আমাদের কাছ থেকে নিকটতম নক্ষত্র পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল দূরে। এই ব্যবধানের মধ্যে আর কোথাও নক্ষত্র নেই, অন্য নক্ষত্রগুলি আরও দূরে। ৬ সংখ্যক চিত্রে সৌরজগতের ছবি যত বড় করে আঁকা হয়েছে সেই অনুপাতে নক্ষত্র-জগতের মানচিত্র আঁকতে হলে প্রথম নক্ষত্রটি বসবে প্রায় ৩৫০ গজ দূরে, ধ্রুবতারা বসবে দুই মাইল দূরে। আরো কত নক্ষত্র হাজার মাইল দূরে বসবে।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে সৌরজগৎটি যেন একটি ছোট বিন্দু। অন্যান্য নক্ষত্রদের মতো সূর্যও একটি সাধারণ মাঝারি আকারের নক্ষত্র।

তাহলে অন্যান্য নক্ষত্রেরও কি গ্রহ জগৎ আছে? সূর্যের জলন্ত বাষ্পপিণ্ড ভেঙে যদি গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে অন্য তারা ভেঙে কেন গ্রহজগৎ সৃষ্টি হতে পারেনা? পারে বৈকি। হওয়া অসম্ভব নয়। জোরালো দূরবীন দিয়ে কোন কোন নক্ষত্রের একাধিক ভগ্নাংশ দেখতে পাওয়া যায়, এই অংশগুলি গ্রহের মতোই বড় অংশটিকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু এই অংশগুলিও জলন্ত। হয়তো শুধু জলন্তগুলিই দূরবীনের নজরে আসে, নিভে যাওয়া ছোটগুলি (যাদের 'গ্রহ' বলা চলে) দেখা যায় না। জলন্ত খণ্ড-গুলিও 'নক্ষত্র' নামে পরিচিত। যুগল নক্ষত্রে (binary stars) দুটি অংশ পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে (সপ্তম অধ্যায়)। কোন কোন নক্ষত্রের সঙ্গে একাধিক সহচর নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু একটা খটকা থেকে যায়। সূর্য থেকে গ্রহ কী ভাবে ভেঙে তৈরী হলো? নক্ষত্র ভেঙ্গে কী করে যুগল নক্ষত্র বা বহু-সঙ্গী-নক্ষত্র সৃষ্টি হলো? এই দুটির মূল প্রক্রিয়া কি এক?

সব জ্যোতিষ্কদের আপন আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘুরতে দেখা যায়ঃ পৃথিবী এইভাবে আবর্তিত হচ্ছে একদিনে একবার, বৃহস্পতি ঘুরছে দশ ঘণ্টায়, শনি সওয়া দশ ঘণ্টায়, ইত্যাদি। সূর্যও লাটিমের মতো ঘুরছে পঁচিশ দিন নয় ঘণ্টায় একবার। তেমনি নক্ষত্ররাও নিজের নিজের মেরুদণ্ড বা অক্ষের (axis) চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে অল্প বিস্তর।

প্রায় একশ বছর আগে লাপ্লাস (P. S. Laplace) বলেছিলেন সূর্যের এই আবর্তনের ফলে সূর্যের দেহ থেকে জলন্ত বাষ্পরাশি ছিটিয়ে পড়ে, এগুলিই ঠাণ্ডা হয়ে জমে গ্রহ উপগ্রহ তৈরী হয়েছে। সূর্য আগে ছিল আরো গরম, আরো বড়, জলন্ত গ্যাস ছিল আরো পাতলা অসংলগ্ন, নীহারিকার মতো। এই সৌর নীহারিকার (solar nebula) ঘূর্ণনের ফলে গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, লাপ্লাসের এই ধারণা নীহারিকাবাদ (nebular theory) নামে পরিচিত। এই মতবাদ অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত থাকলেও অবশেষে এটা বাতিল করতে হলো। এই মতবাদের মধ্যে নানা গলদ দেখতে

পাওয়া যায়। সূর্য এখন পঁচিশ দিন নয় ঘণ্টায় একবার আবর্তিত হচ্ছে, তাহলে আগে যখন আরো বিশালায়তন ছিল তখন সৌর নীহারিকা আরও আস্তে ঘুরছিল (একথার মধ্যে গণিতের প্রমাণ আছে)। তাহলে এইরকম ধীর বেগে ঘুরলে কি সৌর নীহারিকার গ্যাস ছিটিয়ে পড়তে পারে? এভাবে সূর্য থেকে আপনা আপনি গ্যাস ছিটিয়ে গ্রহ সৃষ্টি হয়েছে মেনে নিলে হিসাবের আরো নানা রকম গরমিল দেখা যায়।

এই যুক্তির ফলে বৈজ্ঞানিকেরা বুঝলেন সূর্য নিজে একা গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি! আমেরিকার চেম্বারলেন ও মুল্টন (T. C. Chamberlain, F. R. Moulton) ধারণা করলেন সূর্যকে ভেঙে গ্রহ সৃষ্টি করতে নিশ্চয়ই আর কোন দ্বিতীয় বস্তু এসেছিল, হয়তো অন্য একটি নক্ষত্র কাছ দিয়ে যাচ্ছিল তারই টানে সূর্য থেকে কিছু মালমশলা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জেমস্ জীনস্ (Sir James Jeans) এই ধারণা অবলম্বন করে গ্রহজগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিলেন। এটা জীন্স্-এর 'জোয়ার মতবাদ' (tidal theory) নামে পরিচিত হলো (১৯১৬)।
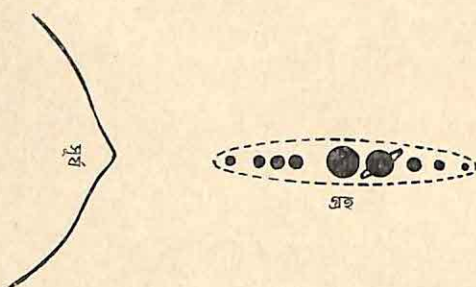
চিত্র—৮ : জেম্স্ জীন্স্-এর জোয়ার মতবাদ অনুসারে সূর্য থেকে গ্রহদের সৃষ্টি।

জীন্স্-এর এই জোয়ার মতবাদের মধ্যে অনেকগুলি সুযুক্তি আছে। বহুযুগ আগে সূর্য ছিল আরো বড়, আরো গরম, আরো পাতলা গ্যাসের তৈরী। এসময় অন্য একটি তারকা সূর্যের নিকট দিয়ে চলে যায়। তার মাধ্যাকর্ষণের টানে সূর্যের গ্যাসে ভীষণ জোয়ার ওঠে, একটি বিরাট গ্যাসের স্তম্ভ সূর্যের গা থেকে বেরিয়ে আসে। সূর্য ও নক্ষত্রের এই মাধ্যাকর্ষণের টাগ-অব-ওয়ার হয়ে বিরাট নক্ষত্রটির কোনই ক্ষতি হলো না,

সে আপন পথে চলে গেল। কিন্তু সূর্য থেকে এই গ্যাসের স্তম্ভটি ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো মোচার আকারে, মধ্যখানটা মোটা আর দু-দিকটা ক্রমশঃ সরু। এই মোচার আকারের গ্যাসের স্তম্ভটা নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণের হেঁচকা টান খেয়েছিল, তাই সূর্যকে ঘিরে ঘুরতে লাগল। কালক্রমে মোচার মতো গ্যাসের স্তম্ভটি ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ঠাণ্ডা হ'তে লাগল। এই ভাবে গ্রহ সৃষ্টি হ'লো আর এই কারণে মধ্যের গ্রহগুলি (বৃহস্পতি, শনি) হলো আকারে বড়, এবং সূর্যের দিকের ও খুব দূরের গ্রহগুলি হলো ছোট।

জীন্‌স্‌-এর এই জোয়ার মতবাদে সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। গণিতের বিচারে এ মতবাদ দাঁড়াতে পারে না, কৌণিক ভরবেগের হিসাবে (conservation of angular momentum) মেলান যায় না। আজকাল অনেকের মতে নক্ষত্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ সম্ভবত আদিম গ্যাস ও বিশ্বধূলি (cosmic dust) জড়ো হয়ে দলা বেঁধে সৃষ্টি হয়েছে। রুশ বৈজ্ঞানিক গ্যামো (এখন আমেরিকাবাসী) ও স্মিট্‌ (Otto Schmidt) বলেন, বিস্তারশীল বিশ্ব যখন সৃষ্টির গোড়ার দিকে ছড়াতে থাকে তখন অল্পকালের মধ্যে সবই খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সেও আজ কত কোটি বছরের কথা। এই সময় আদিম জলন্ত বাষ্পরাশি বা গ্যাস শীতল কণায় পরিণত হয়। এই অবস্থাকে বলা যেতে পারে বিশ্বধূলি অবস্থা। এই ধূলিকণা বরফের চেয়েও অনেক ঠাণ্ডা। এমন বিশ্বধূলি এখনও মহাকাশের নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, আমাদের ছায়াপথের মধ্যে এবং অন্যান্য নীহারিকার মধ্যেও। বিশ্বধূলি অবিশ্রান্ত ছুটোছুটি করছে, একের সঙ্গে অন্যের ধাক্কা লাগছে ও দলা বাঁধছে। যেখানে যেখানে দলা বাঁধতে সুরু হলো সেখানে মাধ্যাকর্ষণের ক্ষমতাও বাড়তে লাগল, ফলে আশেপাশের ধূলি-গ্যাস আরো এসে জুটতে লাগল। এই ভাবে ওরা বাড়তে থাকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। প্রশ্ন উঠবে শীতল কণা থেকে কী করে উষ্ণ গ্রহ ও উত্তপ্ত সূর্য-নক্ষত্র সৃষ্টি হলো? মাধ্যাকর্ষণে বিশ্বধূলিকণা ও নিকটের নানা আকারের জড়পিণ্ড একত্রিত হবার সময় সংঘর্ষের ফলে তাপ সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া যেগুলি খুব বড় (সূর্য নক্ষত্রের মতো) হয়ে উঠতে লাগল তাদের মাধ্যাকর্ষণের জোরও তেমনি প্রচণ্ড হতে লাগল।

ফলে এই সব বিরাটকার দলাবাঁধা গ্যাসের মধ্যে চাপ ও সঙ্কোচন প্রখর হওয়াতে ভীষণ উত্তাপ সৃষ্টি হতে লাগল। এই প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে নূতন শক্তি দেখা দিল, সূর্য ও নক্ষত্রের হাইড্রোজেন গ্যাস রূপান্তরিত হতে লাগল হিলিয়াম গ্যাসে আরও প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তি (থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাক্‌শন, অধ্যায় ২৪) সৃষ্টি হ'তে লাগল।

নক্ষত্র জগৎ ও সৌর জগৎ কী করে সৃষ্টি হলো তার সঠিক উত্তর এখনও কেউ দিতে পারেননি।

অধ্যায়—৫

সৌর পরিবার

সৌর জগতের গঠন ও গ্রহ উপগ্রহের জন্ম সম্বন্ধে আগের অধ্যায়ে বলেছি। এবার গ্রহ উপগ্রহের এক এক করে পরিচয় দেব। এ ছাড়া আরও যারা সৌর পরিবারভুক্ত তাদের কথাও বলব।

গ্রহগুলি সূর্যকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘুরছে, সূর্য রয়েছে গ্রহজগতের কেন্দ্রস্থলে। কোপার্নিকাস এই সৌরকেন্দ্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে যান। কোপার্নিকাসের মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে কেপলার (Johann Kepler) সূক্ষ্মভাবে প্রমাণ করেন যে গ্রহের পথ একেবারে ঠিক বৃত্ত (circle) নয়, বৃত্তাভাস (elliptic)। একটু চাপা ডিম্বাকৃতি বৃত্তকে বলে বৃত্তাভাস। গ্রহদের চক্রাকার কক্ষ পথের এই চাপা বা ডিম্বাকৃতি ভাবটি এত অল্প যে সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে বৃত্তাকার বলা চলে। সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের হিসাব করতে বৃত্তাভাস ধরতে হয়। আমরা এখানে 'বৃত্তাকার কক্ষ' (circular orbit) ধরে নেব।

সূর্য হতে গ্রহগণের দূরত্ব কোটি মাইলেরও বেশী। বুধ গ্রহ সূর্যের সব চেয়ে কাছে, তাহ'লেও প্রায় সাড়ে তিন কোটি মাইল। পৃথিবী সূর্য থেকে সওয়া ন-কোটি মাইল, বৃহস্পতি পঞ্চাশ কোটি মাইল ইত্যাদি। সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব ১০ ধরলে গ্রহদের তুলনামূলক দূরত্ব হয় প্রায় এই রকম (বোড্-এর সূত্র, Bode's Law):

বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	গ্রহকণিকা	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
৪	৭	১০	১৬	২৮	৫২	১০০	১৯৬	৩৮৮	৪৭২

এই তুলনামূলক দূরত্বের সংখ্যাগুলি মনে রাখবার একটি সহজ সঙ্কেত আছে। প্রথমে ০ এবং পরে ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি দ্বিগুণ দ্বিগুণ সংখ্যা লিখে প্রত্যেককে ৩ দিয়ে গুণ করে ৪ যোগ করলেই বোড্-এর সংখ্যাগুলি পাওয়া যাবে (J. E. Bode এই সঙ্কেতটি আবিষ্কার করেন)। প্রথমে ০, ১, ২, ৪, ৮,…কে ৩ দিয়ে গুণ করলে হবে ০, ৩, ৬, ১২, ২৪…, এদের সঙ্গে ৪ যোগ করলে হবে ৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮ ইত্যাদি।

সূর্য থেকে সব গ্রহদের দূরত্ব মাপা হয়েছে। তা থেকে দেখা যায় গ্রহদের তুলনামূলক দূরত্ব বোড্-এর সূত্রের সঙ্গে বেশ কাছাকাছি মিলে যায়। তবে নেপচুন ও প্লুটোর বেলা ভাল মেলে না।

এবার প্রত্যেকটি গ্রহের পরিচয় দিই।

বুধ (Mercury)

সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৩৬০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। গ্রহদের মধ্যে এটাই সবচেয়ে ছোট। আমাদের পৃথিবীটা ভেঙ্গে পঁচিশটা বুধ গড়া যায়। সূর্যের কাছে থাকায় বুধের ওপর রোদের তেজ প্রচণ্ড। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্তিত হয়, সব দিকে রোদ পায়। কিন্তু বুধের একপিঠে সর্বদাই রোদ পড়ছে, অন্য অর্ধেক চির রাত্রি। কারণ বুধ ৮৮ দিনে একবার আবর্তিত হয় (লাটিমের মতো) আবার ঐ ৮৮ দিনেই সূর্যকেও ঘুরে আসে, ফলে একার্দ্ধ সবসময়ই সূর্যের দিকে ফিরে থাকে, অন্য অর্ধেকটা সর্বদাই সূর্যের বিপরীত দিকে।

একে তো সূর্যের এত কাছে, তার ওপর একদিকে সর্বদা রোদ পড়ছে। কী ভীষণ গরম হবে সেদিকটায়! আমাদের তুলনায় বুধে রোদের তেজ প্রায় ছ-গুণ। সেদিকে বুধের উত্তাপ মাত্রা (temperature) ৩৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, আমাদের দেশে ৩৭-৪০ ডিগ্রী। জল ফোটে ১০০ ডিগ্রীতে।

বুধের অন্য অর্ধেকে আবার তেমনি ঠাণ্ডা; কখনও রোদ পায় না। অতি গরম আর অতি শীতল বলে বুধ গ্রহে কোন প্রাণী থাকতে পারে না। তাছাড়া সেখানে বাতাসও নেই।

বুধগ্রহে বায়ুমণ্ডল কেন নেই তা সহজেই বোঝা যায়। বাতাস, গ্যাস বা বাষ্প সর্বদাই ছড়াতে চায়। এদের অণুগুলি অত্যন্ত চঞ্চল, এই কারণে বায়বীয় পদার্থ সব সময়ই ছড়াতে বা বাড়তে চায়। পৃথিবীর বাতাসেরও সেই অবস্থা ; কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জোর কাটিয়ে বাতাস পালাতে পারে না। বুধ গ্রহের টান পৃথিবীর তুলনায় তিন ভাগের একভাগ মাত্র। যদি কখনও বা বুধের পিঠে বাতাস ছিল, এখন নেই, এত কম-জোর মাধ্যাকর্ষণ বাতাস ধরে রাখতে পারেনি।

শুক্র (Venus)

শুক্র গ্রহটি বুধের কুড়ি গুণ, পৃথিবীর চেয়ে সামান্য ছোট। বাতাস প্রায় নেই বললেই হয়, থাকলেও আমাদের বাতাসের তুলনায় হাজার ভাগ পাতলা।

গ্রহদের নিজেদের আলো নেই, সূর্যের আলো পড়ে উজ্জ্বল দেখায়। চাঁদের মতোই। এই কারণে অবস্থান অনুসারে, বুধ ও শুক্র গ্রহকেও দূরবীন দিয়ে কখন কখন কুমড়োর ফালির মতো দেখায়, চাঁদের কলার (moon's phase) মতো।

শুক্র গ্রহের পিঠে দিন-রাত্রি হয় কিনা অথবা বুধের মতো একপিঠ সর্বদাই দৈনিক আবর্তন পরিমাপ করা দুষ্কর, এই দৈনিক বা আহ্নিক আবর্তন অতি-মন্থর। বহুদিন ধরে এই সমস্যার সমাধান হয়নি, বৈজ্ঞানিকেরা আবর্তনকাল (Period of axial rotation) মাপতে পারেননি। সন্দেহ হয় শুক্রও হয়তো বুধের মতো সূর্যের দিকে একার্ধ সবসময় ফিরিয়ে থাকে।

পৃথিবী যেমন সূর্যকে ৩৬৫ দিনে (বার মাসে) একবার প্রদক্ষিণ করে আসে, শুক্রগ্রহ করে আসে ২২৫ দিনে অর্থাৎ সাড়ে সাত মাসে।

শুক্রগ্রহের উপর রোদের তেজ আমাদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রগ্রহকে তুলনা করলে অনেক বিষয়ে খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায় না। শুক্রে রোদের তেজ প্রায় দ্বিগুণ, শুক্রের সূর্য প্রদক্ষিণ কাল ৭½ মাস (পৃথিবীর বার মাস), পৃথিবীর তুলনায় শুক্রের ওজন ⅘ গুণ অর্থাৎ মাত্র এক পঞ্চমাংশ কম ; পৃথিবীর গড়পরতা ব্যাস ৭৯৬০

মাইল, শুক্রের ৭৭০৫ মাইল। কিন্তু শুক্র গ্রহে বাতাস বড় অল্প। অনুমান হয় শুক্র গ্রহে বড় জন্তু, গাছপালা নেই, ছোট কীট পতঙ্গ থাকলে থাকতে পারে। কিন্তু এসব এখনও কল্পনামাত্র ; দূরবীন দিয়ে জীবজন্তু বা উদ্ভিদের চিহ্ন এখনও কেউ দেখতে পায়নি। শুক্রগ্রহের আকাশে মেঘ দেখা যায়। এই মেঘ জলের বাষ্প নয়, ধূলির আঁধি।

পৃথিবী (Earth)

সূর্যের দিক থেকে গণনা করলে আমাদের পৃথিবীটি তৃতীয় গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মোটামুটি ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, তাহলে বৃত্তকক্ষের (orbit) ব্যাস হলো ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল, এবং বৃত্তপথের পরিধি ৫৭ কোটি মাইল। এই ৫৭ কোটি মাইল পথ পৃথিবী ঘুরে আসছে এক বছরে। হিসাব করলে দেখা যাবে এই পথে পৃথিবী চলছে প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে আঠারো মাইল বেগে।

পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন একদিনে বা চব্বিশ ঘণ্টায়। বুধও শুক্রের সঙ্গে এক বিষয়ে পৃথিবীর প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। বুধের দৈনিক আবর্তন ও সূর্য প্রদক্ষিণকাল (বাৎসরিক প্রদক্ষিণকাল) দুটাই সমান, ৮৮ দিন। শুক্র গ্রহেরও প্রায় সমান, ২২৫ দিন। কিন্তু পৃথিবীর এই দুই প্রকার গতিতে কত পার্থক্য, দৈনিক আবর্তন একদিনে, বাৎসরিক প্রদক্ষিণ ৩৬৫ দিনে।

পৃথিবী একসময় বাষ্পীয় ছিল, তারপর তরল, এখন কঠিন (অন্ততঃ উপরটা)। পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের ফলে তরল অবস্থায় বিষুবদেশ একটু ফুলে ওঠে, সেই ভাবেই পরে ঠাণ্ডা হয়ে জমে কঠিন হয়েছে। বিষুব দেশের ব্যাস প্রায় ৭৯৭২ মাইল, মেরুর দিকে ৭৯৪৫ মাইল অর্থাৎ ২৭ মাইল কম। মোটামুটি বলতে পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। মাটি পাথরের কঠিন খোলসটা ৩০-৩৫ মাইল, বড় জোর ১০০ মাইল পর্যন্ত গভীর, তার নীচে গরম গলা পাথর—আগ্নেয়গিরির 'লাভা'র মতো (১২০০-১৮০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) ; আরো গভীরদেশে আরো গরম গলা লোহা।

পৃথিবীর জড়মান (mass) বা ওজন ১৩৬×১০^{২১} মণ, ১৩৬এর পরে ২১টা শূন্য দিয়ে লিখতে হবে।

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ জন্মেছে দু'শো কোটি বছর আগে। এ সময় পৃথিবীটা খুবই গরম ছিল, জীবজন্তু গাছপালা থাকা অসম্ভব। আরো একশকোটি বা দেড়শকোটি বছর এই ভাবে কেটে গেল। পৃথিবীটা ঠাণ্ডা হতে লাগল।

জীবতত্ত্বজ্ঞরা বলেন পৃথিবীতে প্রথম জীবের সূচনা হয়েছে এখন থেকে একশকোটি বা পঞ্চাশকোটি বছর আগে অনেক বৈজ্ঞানিকরা ধরেন ত্রিশকোটি বছর আগে (১ম অধ্যায়, ১নং তালিকা)। প্রথমেই হঠাৎ মানুষ, গরু, ঘোড়া, পাখি জন্মায়নি। প্রথম জীবগুলি ছিল অদ্ভূত দেখতে, প্রায় জড় পদার্থেরই তুল্য, অ্যামিবা (amœba), কীট শামুক এইসব রকমের। ক্রমবিবর্তনের (evolution) ধারার মধ্য দিয়ে এদের রূপ বদলাতে লাগল হাজার হাজার বছর ধরে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে এলো মৎস্য, সরীসৃপ, ভূচর স্তন্যপায়ী জন্তু, পাখি, বানর, মানুষ।

পৃথিবী জন্মেছে দুশোকোটি বছর হয়। পৃথিবীর বয়স কী করে জানা গেল ?

পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের উপায় সর্ব প্রথম পরিকল্পনা করেন জ্যোতির্বিদ হালি (Edmund Hally)। তাঁর পদ্ধতিটি বেশ মজার। নদনদী যখন কাদামাটি নিয়ে সাগরে পড়ে তখন মাটি থেকে সামান্য পরিমাণে লবণও নিয়ে আসে। সাগর জল মেঘ হয়ে আকাশে ওঠে, লবণ সাগরেই পড়ে থাকে। এই মেঘ আবার বৃষ্টি হয়ে নদী বয়ে আবার লবণ নিয়ে আসে। এই ভাবে সাগরজল নোনা হয়ে উঠেছে আর লবণের ভাগ একটু একটু করে শত শত বছর ধরে বেড়ে চলেছে। হালি ঠিক করলেন সমুদ্রের জলে লবণের ভাগ দেখে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা যেতে পারবে। এই পদ্ধতিটি পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের প্রকৃষ্ট উপায় না হলেও এ থেকে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা অন্য উপায়ে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করেন। রেডিয়াম যেমন স্বতঃ-বিকীরণশীল, ইউরেনীয়াম ধাতুও সেই ধরনের। নিয়ত আলোক্যদি বিচ্ছুরণের ফলে ইউরেনীয়াম ধাতু ক্রমশঃ সীস ধাতুতে (lead) পরিণত হয় (অধ্যায় ২১)। ইউরেনীয়াম থেকে সীসকে

রূপান্তর হতে বহুকাল লাগে। কতকাল পরে কতটুকু ইউরেনীয়াম কতটুকু সীসে পরিণত হয় তা পরবর্তী তালিকা থেকে বোঝা যাবে।

সময়কাল	ইউরেনীয়াম (আউন্স)	রূপান্তরিত সীসা (আউন্স)
প্রথমে	১	০
১০ কোটি বছর পরে	০˙৯৮৫	০˙০১৩
১০০ " " "	০˙৮৬৫	০˙১১৬
২০০ " " "	০˙৭৪৭	০˙২১৩
৩০০ " " "	০৬˙৪৬	০˙৩০৩

অবশিষ্টাংশ নানা প্রকার রশ্মি ও গ্যাস রূপে নির্গত হয়।

তালিকা: ৩ ইউরেনীয়াম ধাতুর সীসে রূপান্তর।

এই কারণে ইউরেনীয়াম ধাতুর সঙ্গে সর্বদাই সীস ধাতু সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখা যায়। ইউরেনীয়াম খনিজের মধ্যে কতভাগ ইউরেনীয়াম ও কতভাগ রূপান্তরিত সীস আছে তা দেখে পৃথিবীর বয়স গণনা করা যায়। এই হিসাব থেকে পৃথিবীর বয়স প্রায় দেড়শ কোটি বছর বলে মনে হয়। নানান পদ্ধতি দিয়ে যে সব হিসাব পাওয়া গিয়াছে তা থেকে পৃথিবীর বয়স ১৭০ কোটি থেকে ৩৪০ কোটি বছর মনে হয়। মোটামুটি দুশো কোটি বছর ধরা চলে।

চন্দ্র :—বুধ ও শুক্রের কোনও উপগ্রহ বা চাঁদ নেই, পৃথিবীর আছে একটি। এখান থেকে চাঁদ ২৪০,০০০ মাইল দূরে। পৃথিবীকে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করছে প্রায় চার সপ্তাহে একবার, সঠিকভাবে বলতে গেলে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১ সেকেণ্ডে। আবার এই সময়েই নিজের মেরুদণ্ডে একবার করে আবর্তন করছে। ফলে চাঁদের একই দিক সর্বদা পৃথিবীর দিকে ফেরানো, আমরা সব সময়ই একপিঠ দেখি।

রুশ বৈজ্ঞানিকরা ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক আকাশে পাঠিয়ে কৃত্রিম চাঁদ তৈরী করলেন; পরে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরাও। ১৯৫৯ সালে রুশ বৈজ্ঞানিকরা আরো জোরালো রকেটের সাহায্যে লুনিক—৩ (Lunik III) পাঠালেন চাঁদের দিকে, মধ্যে যন্ত্রপাতি, টেলিভিশন প্রেরক ইত্যাদি বসিয়ে। চাঁদকে ঘুরে আসবার সময় লুনিক পাঠিয়ে দিল টেলিভিশনের ছবি চাঁদের অন্য পিঠের। এটাই চাঁদের ও-পিঠের প্রথম ছবি।

চাঁদের পিঠে কালো কালো দাগ (চাঁদের 'কলঙ্ক') কেন? ছোট দূরবীন দিয়েও চাঁদের পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। কলঙ্কগুলি সেই সব পাহাড়ের ছায়া। চাঁদের নিজের আলো নেই, চাঁদ জলন্ত নয়। সূর্যের আলো পড়ে ঝকঝক করে, পাহাড়ের ছায়াও পড়ে। একটা ব্যাপার ভারী অদ্ভুত; চাঁদের প্রায় প্রত্যেকটি পর্বতচূড়াই আগ্নেয়গিরির মতো দেখতে (ফোটো চিত্র দ্রষ্টব্য), চূড়ার মাঝে গহ্বর। জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকদের নাম নিয়ে এই সব পর্বত চূড়ার নামকরণ হয়েছে, যেমন, কোপার্নিকাস, টাইকো, আর্কিমিডিস পর্বত ইত্যাদি।

চাঁদের পিঠ পর্বতময় হওয়ায় যখন যেখানে সূর্যের আলো (রোদ) পড়ে তখন সেখানে ভীষণ তেতে ওঠে, প্রায় ১৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আবার উল্টোদিকে তেমনি ঠাণ্ডা।

চাঁদে বাতাস নেই সেকথা বুধগ্রহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছি। একই কারণ। চাঁদ ছোট, পৃথিবীর ভারের তুলনায় মাত্র আশি ভাগের এক ভাগ। বাতাস ধরে রাখবার মতো জোরালো মাধ্যাকর্ষণ নেই। চাঁদের ব্যাস (diameter) ২১৬০ মাইল।

চন্দ্রগ্রহণ কেন হয়, সূর্যগ্রহণই বা হয় কেন? চিত্র ৯, ১০ দেখলেই বোঝা যাবে। বাতির সামনে একটি ছোট মার্বেল ধরলে পিছনে ছায়া সৃষ্টি হয়। সেখানে কাগজ ধরলে ছায়া পড়ে। কাগজ সরিয়ে নিলে ছায়াটি শূন্য লম্বমান থাকে। সূর্য যেন একটি প্রকাণ্ড বাতি, পৃথিবীটা যেন মার্বেল। পৃথিবীর যেদিকে সূর্য তার বিপরীত দিকে পৃথিবীর ছায়া সাড়ে আট লক্ষ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। চাঁদ ঘুরছে পৃথিবী থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে। এইজন্য চাঁদ মাঝে মাঝে পৃথিবীর ছায়া কোণের মধ্যে এসে পড়ে, পৃথিবীর ছায়া

চাঁদের গায়ে পড়ে। এই হলো চন্দ্রগ্রহণ। যদি ছায়া কোণের গা ঘেঁসে যায় তাহলে চাঁদের খানিকটা মাত্র অন্ধকার হয়ে যায় (আংশিক গ্রহণ), কিন্তু যদি পৃথিবীর ছায়াকোণের মধ্যে চাঁদ সম্পূর্ণভাবে ঢুকে যায় তাহলে একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়, তখন হয় পূর্ণ গ্রহণ বা পূর্ণগ্রাস।
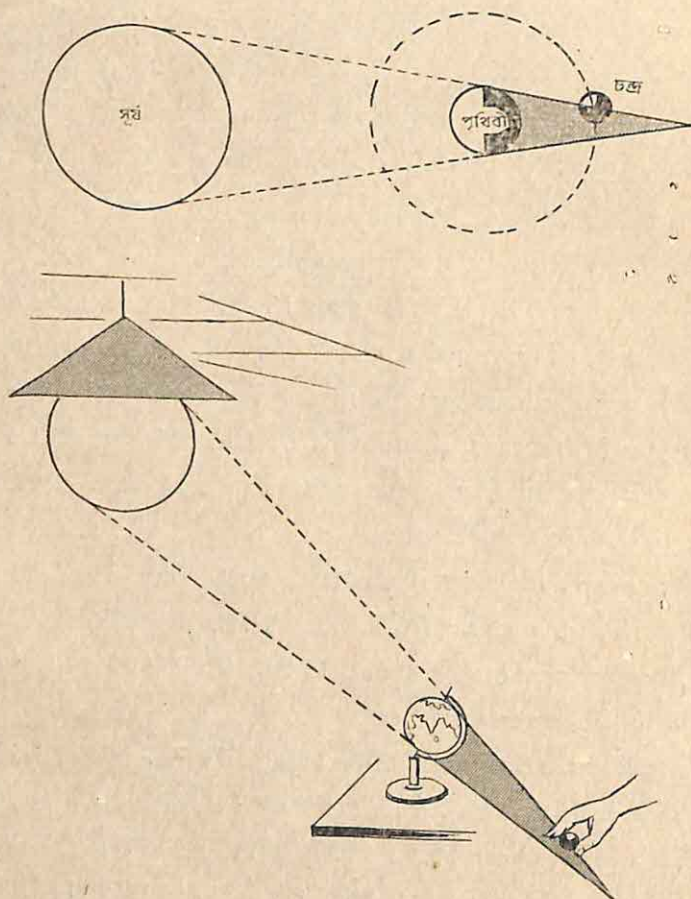
চিত্র—৯ঃ চন্দ্রগ্রহণ।

আবার কখনো চাঁদ যদি স্থর্য ও পৃথিবীর মাঝে এসে পড়ে তখন চাঁদের পিছনে স্থর্য আড়াল হয়ে যায়। এইভাবে স্থর্যগ্রহণ হয়।

এখন মনে হতে পারে, চাঁদ যখন প্রতি মাসে একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে তাহলে প্রতিমাসেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কেন হয় না ? তার কারণ
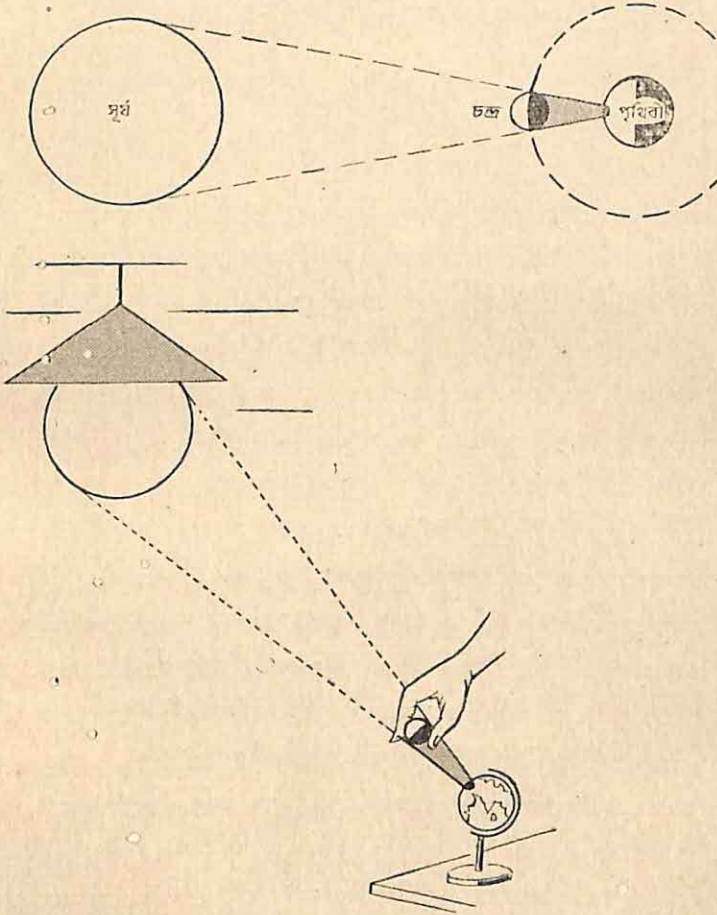
চিত্র—১০ : সূর্যগ্রহণ।

পৃথিবীর কক্ষ ও চন্দ্রের কক্ষ একই সমতলে নেই, পাঁচ ডিগ্রী কোণে হেলানো। সেজন্য প্রত্যেক বারই সূর্য-পৃথিবী-চাঁদ এক লাইনে আসে না, গ্রহণও হয় না।

চন্দ্র গ্রহণের সময় চাঁদ থাকে পৃথিবীকে মাঝে রেখে সূর্যের উল্টোদিকে,

এটা হলো পূর্ণিমা অবস্থা। চন্দ্রগ্রহণ তাই সর্বদাই পূর্ণিমা তিথিতে হয়। তেমনি সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ থাকে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে, আমরা দেখি, চাঁদের অন্ধকার দিকটা, অর্থাৎ অমাবস্যা। সূর্যগ্রহণ সেই কারণে সর্বদাই অমাবস্যা তিথিতে হয়।

মঙ্গল (Mars)

বুধ ও শুক্রগ্রহের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের চেয়ে ছোট, অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষ বৃত্তের মধ্যে বুধ ও শুক্রের কক্ষবৃত্ত। মঙ্গল গ্রহের কক্ষবৃত্ত বাইরে। পৃথিবীর কক্ষ থেকে মঙ্গল গ্রহের কক্ষের দূরত্ব ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল। সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব প্রায় ১৪ কোটি মাইল, বা পৃথিবীর দূরত্বের দেড়গুণ। ফলে মঙ্গলে রোদের তেজ অর্ধেকের একটু কম।

মঙ্গল গ্রহ আমাদের পৃথিবীর চেয়ে একটু ছোট, ব্যাস ৪২০৬ মাইল (পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক), ওজনে পৃথিবীর দশভাগের একভাগ। মঙ্গল গ্রহের দৈনিক আবর্তন ২৪½ ঘণ্টায় একবার—প্রায় পৃথিবীর মতোই। সূর্যকে মঙ্গলগ্রহ প্রদক্ষিণ করে ৬৮৭ দিনে বা প্রায় ২৩ মাসে।

মঙ্গল গ্রহের আকাশে মেঘ, আর মেরু প্রদেশে তুষার দেখতে পাওয়া যায় বড় দূরবীন দিয়ে। মঙ্গল গ্রহে যে রকম আবহাওয়া তাতে জীবজন্তু গাছপালা বাঁচতে পারে। অনেকে অনুমান করেন সেখানে হয়তো পৃথিবীর জীবজন্তুর মতো প্রাণীরা বাস করে। মঙ্গল গ্রহের পিঠে কাটা খালের (canals) চিহ্ন দেখা যায়, এরকম কথা এক সময় উঠে ছিল, এখনও এ নিয়ে গবেষণা চলছে।

মঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহ বা চাঁদ আছে। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ডাইমস (Deimos) ও ফোবস (Phobos)। ডাইমস উপগ্রহটি মঙ্গল গ্রহের ১৪,৬০০ মাইল দূরে থেকে ঘুরছে, ফোবস ৫,৮২৬ মাইল দূরে থেকে। মঙ্গল গ্রহকে ডাইমস প্রদক্ষিণ করছে ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে, ফোবস করছে ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে। এই কারণে মঙ্গল গ্রহের আকাশে সর্বদা একটা না একটা চাঁদ থাকে, কখন দুটোই, আর প্রায়ই তাদের গ্রহণ লাগে।

গ্রহকণিকা (Asteroids)

মঙ্গল গ্রহের পরে বৃহস্পতির কক্ষ। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহের কথা না বলে গ্রহকণিকার কথা তুলছি। গ্রহকণিকাগুলি কী? গ্রহের কথা বলতে গিয়ে গ্রহকণিকার কথা এলো কী করে?

সূর্য থেকে গ্রহদের দূরত্বের একটা ধারা আছে। বোড-এর সূত্র (পৃঃ ৩৯) দিয়ে এই ধারা একরকম করে দেখানো হয়েছে। এই সূত্র অনুসারে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১০; পরেরটির দূরত্ব ১৬, সেখানে মঙ্গল গ্রহকে পাওয়া যাচ্ছে। মঙ্গলের পরেরটির দূরত্ব হবে ২৮, তার পরেরটির ৫২ হবে। মঙ্গলের পরের গ্রহটি দেখছি বৃহস্পতি, কিন্তু সে ২৮-এর ঘরে নেই, সে আছে ৫২-র ঘরে। বৈজ্ঞানিকরা বললেন এ কী ব্যাপার, ২৮-এর ঘরে গ্রহ কই? খোঁজো। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল এরা বেশ ধাপে ধাপে (বোড-এর নিয়ম মেনে) সাজিয়ে চলছে, তার পরেই দেখছি বৃহস্পতি লম্বা লাফ মেরে এত দূরে ঘুরছে। এ ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগছে না? তাই চলল ২৮-এর ঘরে লুকানো গ্রহের খোঁজ।

দূরবীন দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল ঐ রকম দূরত্বের কোন বড় গ্রহ নেই, কিন্তু হাজার হাজার ছোট ছোট বস্তু-পিণ্ড ঘুরছে। এদেরই বলে গ্রহকণিকা। এপর্যন্ত দু-তিন হাজার গ্রহকণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, মনে হয় এ ছাড়া আরও অনেক আছে। সবচেয়ে বড়টি প্রথমে আবিষ্কার করেন সিসিলির জ্যোতির্বিদ পিয়াৎসি (G. Piazzi), ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। তিনি এই গ্রহকণিকার নাম দিলেন সিরিস (Ceres)। সব চেয়ে বড় হলেও সিরিসের ব্যাস ৫০০ মাইলেরও কম। আর মাত্র চার-পাঁচটি গ্রহকণিকা দেখা গিয়েছে যাদের ব্যাস ১০০ মাইলের বেশী। আরগুলি ছোট, কোন কোনটি সামান্য কাঁকরের মত। এরা সবই ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সাড়ে চার বছরে। সূর্য থেকে এদের দূরত্ব পঁচিশ ছাব্বিশ কোটি মাইল।

গ্রহকণিকার নাম	ব্যাস মাইল	আবিষ্কর্তা	(খৃষ্টাব্দ)
সিরিস (Ceres)	৪৮০	পিয়াৎসি (G. Piazzi)	১৮০১
পাল্লাস (Pallas)	৩০৪	অলবার্স (H.W.M Olbers)	১৮০২
জুনো (Juno)	১২০	হার্ডিং (C. Harding)	১৮০৪
ভেস্তা (Vesta)	২৪০	অলবার্স	১৮০৭

তালিকা ৪ : সবচেয়ে বড় চারিটি গ্রহকণিকার পরিচয়

এই সব এবং আরও দু-তিন হাজার গ্রহকণিকা বৃত্তপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের পথ মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষের মাঝামাঝি দিয়ে। কিন্তু এ ছাড়াও আরো কয়েকটি গ্রহকণিকা দেখা গিয়েছে যাদের পথ অন্য যায়গা দিয়ে। পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মাঝামাঝি একটি গ্রহকণা দেখা যায়। এটি জার্মান জ্যোতির্বিদ ডক্টর ভিৎ (O. Witt) আবিষ্কার করেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রহকণিকার নাম ইরস (Eros), ব্যাস মাত্র ২৫ মাইল, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে একুশ মাসে। ইরসের কক্ষপথ বৃত্তাকার (circular) বলা চলে না, বেশ বৃত্তাভাস (elliptical) আকারের। ফলে, ইরস চলে যায় মঙ্গল গ্রহের কক্ষ ছাড়িয়ে, আবার ফিরে আসে পৃথিবী ও মঙ্গলের কক্ষের মাঝে। এর চেয়েও বেশী লম্বাটে ধরনের বৃত্তাভাস কক্ষে ঘুরছে এডোনিস (Adonis) নামে আর একটি গ্রহকণা। এটি শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের কক্ষের উপর দিয়ে দীর্ঘ বৃত্তাভাস কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামে রয়াল অবজারভেটরির অধ্যক্ষ ডেলপোর্ট এটি আবিষ্কার করেন।

বৃহস্পতি (Jupiter)

গ্রহদের মধ্যে সব চেয়ে বড় বৃহস্পতি, আয়তনে পৃথিবীর ১৩১২ গুণ। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব পাঁচগুণ, অতএব সেখানে রোদের তেজ ২৫ ভাগের এক ভাগ। এজন্য বৃহস্পতি গ্রহ অত্যন্ত শীতল, উষ্ণতা মাত্রা (temperature)-১৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। অর্থাৎ বরফের চেয়েও ১৪০ ডিগ্রী ঠাণ্ডা।

দূরবীন দিয়ে বৃহস্পতির বায়ু মণ্ডলে ঘন সাদা মেঘ দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণে স্থর্যের আলো যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিফলিত হয় আর ঝকঝকে নক্ষত্রের মত দেখায়। আমাদের মেঘ জলের বাষ্পকণা দিয়ে তৈরী। বৃহস্পতির মেঘ তা হতে পারে না। সেখানে এত ঠাণ্ডা যে জলের বাষ্প উঠতে পারে না, আগেই বলেছি বৃহস্পতি গ্রহ বরফের চেয়েও অনেক ঠাণ্ডা। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন বৃহস্পতির দেহ অঙ্গারাম্ল তুষার কণায় (carbon dioxide snow) ঢাকা। কয়লা, কাঠ, মোমবাতি ইত্যাদি পুড়ে অঙ্গারাম্ল বা কার্বন-ডাই-ওক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস খুব ঠাণ্ডা (—৭৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) হ'লে বরফের গুঁড়োর মত জমে যায়। বাজারে এর নাম শুকনো বরফ বা dry ice, যা আইসক্রীম ওয়ালারা বাক্সের মধ্যে রাখে। ভীষণ ঠাণ্ডা, সাদা নুনের গুঁড়োর মত দেখতে, কখন কখন ডেলা পাকিয়ে থাকে। গরম লাগলে এই বরফ বা তুষার গলে জলের মত হয় না, একেবারে গ্যাস হয়ে উড়ে যায়। এই কারণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তুষারকে শুকনো বরফ বলে।

বৃহস্পতির গায়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস আছে বলে মনে হয়; কিন্তু ঐ প্রচণ্ড শীতলতায় গ্যাসভাবে থাকা সম্ভব নয়, তুষাররূপে থাকাই সম্ভব। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে এমোনিয়া ও মার্শ গ্যাস আছে। গাছগাছড়া পচে মার্শ গ্যাস হয়।

বৃহস্পতির দিন রাত্রি খুব ছোট; পাঁচ ঘণ্টা দিন, পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি। অর্থাৎ দশ ঘণ্টায় একবার লাটিমের মত ঘোরে। এই হলো তার দৈনিক আবর্তন। আর স্থর্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রায় বারো বছরে একবার।

গ্যালিলিও নিজ হাতে দূরবীন তৈরী করে যখন বৃহস্পতি গ্রহ দেখছিলেন (১৬১০ খৃঃ) তখন তিনি বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ বা চাঁদ দেখতে পান। আজকাল বড় দূরবীন দিয়ে দেখা যায় বৃহস্পতির ১২টি চাঁদ।

শনি (Saturn)

শনি গ্রহটি আরো দূরে। এর দিন রাত্রি ও উত্তাপ (বা শীতলতা) প্রায় বৃহস্পতিরই মত। শনির দিন রাত্রি হয় ১০ ঘণ্টা ১০ মিনিটে।

গ্রহদের মধ্যে শনির আকৃতি একটু অদ্ভুত। গোলাকার শরীরের কোমর ঘিরে তিনটি বলয় বা চক্র আছে মাঝে মাঝে অল্প অল্প ব্যবধানে। বলয় তিনটি নিরেট চাকার মত নয়, অসংখ্য চূর্ণ খণ্ডের সমষ্টি, ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরছে উপগ্রহের মত। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন শনির কোন উপগ্রহ খুব কাছে এসে পড়ায় শনির মাধ্যাকর্ষণ ও উপগ্রহটির ঘূর্ণন বেগের দোটানায় পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বলয় সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক রোসে (E. Roche) প্রমাণ করেছেন কোনও উপগ্রহ যদি গ্রহের ব্যাসার্ধের প্রায় আড়াই গুণের (২·৪৪ গুণ) মধ্যে এসে পড়ে তাহ'লে উপগ্রহটির এই দুর্দশা হবে। এই ব্যবধানের নাম রোসের সীমানা (Roche's limit)।

শনির গোল শরীরের ব্যাস ৭৪৫০০ মাইল, সবচেয়ে বড় বলয়টির ব্যাস ১৭১৫০০ মাইল, দ্বিতীয় বলয়টির ব্যাস ১৪৫০০০ মাইল, তৃতীয় বা সবচেয়ে কাছেরটির ব্যাস ১২৭০০০ মাইল। প্রথম বলয়টি ১০০০০ মাইল চওড়া, দ্বিতীয়টি ১৬০০০ মাইল চওড়া, কাছেরটি ১১৫০০ মাইল চওড়া। প্রথম ও দ্বিতীয় বলয়ের মধ্যে ব্যবধান ৩০০০ মাইল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলয়ের মাঝে ব্যবধান ১০০০ মাইল। শনির গোল শরীর থেকে কাছের বলয়টির ব্যবধান ৭০০০ মাইল। মধ্যের বলয়টি সব-চেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। বলয়গুলি কয়েক হাজার মাইল চওড়া হলেও অন্যদিকে পাতলা, ১০ মাইলের বেশী পুরু হবে না। তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে সব জড়খণ্ড দিয়ে শনির বলয় তৈরী হয়েছে তাদের আকার ১০ মাইলের চেয়ে অনেক ছোট হবে। হয়তো কয়েক ফুট বা কয়েক ইঞ্চি মাত্র।

তিনটি বলয় ছাড়া শনিগ্রহের আরো ন'টি উপগ্রহ বা চাঁদ আছে। অর্থাৎ সাজ-সজ্জা শনিরই সবচেয়ে বেশী।

ইউরেনাস (Uranus)

শনির চেয়েও ইউরেনাস গ্রহ দূরে। ইউরেনাস আয়তনে (volume) পৃথিবীর ৬৪ গুণ, ওজনে প্রায় ১৫ গুণ। ইউরেনাসের ব্যাস ৩২০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর চারগুণ।

উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ

ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন। প্রথমে তিনি এটাকে নক্ষত্র বলে ভুল করে-ছিলেন। কয়েকদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করবার পর বুঝলেন এটি অতি ধীরে ধীরে পুর্বদিকে সরছে নক্ষত্রদের মধ্য দিয়ে। তারপর আরো দেখলেন যে এর নিজস্ব জ্যোতি নেই, সূর্যের আলোতে আলোকিত; কারণ চাঁদের মত ইউরেনাসের কলা কুমড়োর ফালির মত দেখা যাচ্ছে। সূর্য থেকে ইউরেনাস ১৭৮ কোটি মাইল দূরে, ৮৪ বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। ইউরেনাসের পাঁচটি চাঁদ দেখা যায়।

নেপচুন (Neptune)

ইউরেনাসকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন তার চাল-চলন অঙ্কের হিসাব মানছে না। প্রথমে তাঁদের মনে হলো নিকটবর্তী প্রকাণ্ড গ্রহ দুটির (শনি ও বৃহস্পতি) মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেই হয়তো ইউরেনাসের গতিবিধির এই ব্যতিক্রম হচ্ছে। কিন্তু সেই হিসাবে বিচার করে দেখা গেল তাতেও হিসাব ঠিক মিলছে না।

তখন তাঁদের সন্দেহ হলো, কাছাকাছি আর কোন গ্রহ নেই তো? বেশ তা যদি থাকে তবে হিসাব করে দেখা যাক কোথায় সে থাকতে পারে। হিসাব অনুযায়ী তাঁরা দূরবীন দিয়ে আকাশের সেই অংশ খুঁজতে লাগলেন। ঠিক! পাওয়া গেল একটা গ্রহ, নাম হলো নেপচুন।

নেপচুন আয়তনে প্রায় ইউরেনাসের সমান, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ১৬৫ বছরে। সূর্য থেকে নেপচুন ২৭৯ কোটি মাইল দূরে। নেপচুনের দু'টি চাঁদ দেখা গিয়েছে।

প্লুটো (Pluto)

নেপচুন আবিষ্কারের ৮৪ বছর পরে প্লুটো গ্রহটি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আবিষ্কৃত হয়। জীন্‌স্‌-এর টাইডাল থিওরি মতে কীভাবে গ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সে কথা আগে বলেছি। অন্য কোন নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণে সূর্য থেকে মোচার আকারে একটি বিরাট গ্যাসের স্তম্ভ বেরিয়ে আসে, সেটি ভেঙে গ্রহগুলি সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে সূর্যের কাছের ও দূরের গ্রহগুলি ছোট,

মধ্যেরগুলি (বৃহস্পতি, শনি) বড়। নেপচুনের চেয়েও প্লুটো দূরে, অতএব প্লুটো নেপচুনের চেয়ে ছোট হবে এটাই সম্ভব। তার ওপর প্লুটো চলে অতি ধীরে, সহজে বোঝা যায় না ওটা স্থির নক্ষত্র না চলন্ত গ্রহ। এজন্য প্লুটো এতদিন বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে ছিল।

অবশ্য প্লুটো সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে এটুকু জানা গিয়েছে যে সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৩৭২ কোটি মাইল, আর এ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে আড়াইশো বছরে একবার।

প্লুটোর চেয়েও দূরে যদি কোন গ্রহ থাকে তাহ'লে তাকে দেখতে পাওয়া খুবই দুষ্কর হবে। প্লুটোই আপাততঃ গ্রহজগতের শেষ সীমা।

সূর্য

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের কথা বললাম। এখন সূর্যের কথা বলি। গ্রহজগতের কেন্দ্রস্থলে সূর্য, সকল গ্রহ সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে বাঁধা। সূর্য কত প্রকাণ্ড তা কল্পনা করা কঠিন। পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের ওজন ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার (৩৩৩০০০) গুণ। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ একত্র করলেও সূর্য হয় তার ৭০০ গুণ।

সূর্যের উপরতলের উষ্ণতামাত্রা ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (ফুটন্ত জলের ১০০ ডিগ্রী)। সূর্যের ভিতর দিকে আরো গরম, কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতা সম্ভবতঃ চল্লিশ কোটি ডিগ্রী। অন্যান্য নক্ষত্রও এই রকম জ্বলন্ত বাষ্প দিয়ে তৈরী। আমাদের সূর্য আকাশের একটি মাঝারী আকারের নক্ষত্র ছাড়া আর কিছু নয়। রং একটু হলদে ভাবের।

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস ছাড়া নানান্ ধাতুও সূর্যের মধ্যে বাষ্পাকারে আছে। সূর্য ও নক্ষত্রদের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন। ধাতুর মধ্যে সূর্যের ভিতর লোহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব বস্তু এই ভীষণ উত্তাপে কী অবস্থায় আছে তা ভাববার কথা। গরম করলে কঠিন বস্তু তরল হয় ও ক্রমে বাষ্পে পরিণত হয়। লোহার কথাই ধরা যাক : ১৫৩০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে লোহা গলে যায়, ২৪৫০ ডিগ্রীতে ফুটতে থাকে এবং বাষ্প হয়ে উড়ে যায়।

গ্রহ	সূর্য হতে দূরত্ব (লক্ষ মাইল)	তুলনা মূলক দূরত্ব (পৃথিবী = ১০)	আবর্তন কাল	সূর্য প্রদক্ষিণ কাল	ব্যাস (মাইল)	গুরুত্ব বা ওজন (পৃথিবী = ১)	উপগ্রহের সংখ্যা
বুধ	৩৬০	৩.৯	৮৮ দিন	৮৮ দিন	৩১১০	০.০৪	০
শুক্র	৬৭০	৭.২	২২৪.৭ দিন	২২৪.০ দিন	৭৭০৫	০.৮১	০
পৃথিবী	৯২৮	১০.০	২৩ ঘ ৫৬ মি ৪ সে	৩৬৫.২৬ দি বা ১ বছর	৭৯১৩	১	১
মঙ্গল	১৪১০	১৫.২	২৪ ঘ ৩৭ মি ২২.৬ সে	১ ব ১০ মা ২২ দি	৪২০৭	০.১১	২
সীরিস (বৃহত্তম গ্রহকণিকা)	২৬০০	২৬.৫	—	৪ ব ৭ মা ১১ দি	৪৮০	০.০০৫	—
বৃহস্পতি	৪৮৩০	৫২.০	৯ ঘ ১০ মি	১১ ব ১০ মা ১৪ দি	৮৬৭৪০	৩১৮	১২
শনি	৮৮৬০	৯৫.৪	১০ ঘ ১০ মি	২৯ ব ৫ মা ১৭ দি	৭৪৫০০	৯৫	৯ এবং ৩ বলয়
ইউরেনাস	১৭৮১০	১৯১.৯	১০ ঘ ৪৫ মি	৮৪ ব ৫ দি	৩১৭০০	১৪.৬	৫
নেপচুন	২৭৯২০	৩০০.৭	১৫ ঘ ১২ মি	১৬৪ ব ৯ মা ১৮ দি	৩১১০০	১৭.৩	২
প্লুটো	৩৭২০০	৩৯৬.০	?	২৫০ ব	৩৮০০	০.৯	০

তালিকা ৫ : গ্রহ-উপগ্রহের হিসাব

কিন্তু সূর্যের মধ্যে দশ হাজার বিশ লক্ষ ডিগ্রীতে এদের কী অবস্থা? সাধারণ বাষ্প (vapour) বলতে যা বোঝায়, এত উত্তাপে কোন বস্তু সে অবস্থায় থাকতে পারে না। এত গরমে অণুপরমাণুর মৌলিক গঠনেই বিপর্যয় ঘটে। সকল বস্তুর অণুপরমাণুর মূল গঠনে আছে ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি (অধ্যায় ২০)। সূর্যের মধ্যে এত গরমে এরা সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে এক অপূর্ব খিচুড়ি সৃষ্টি করে। সৌর-বস্তুর এই অবস্থাকে না বলা যায় বাষ্প না বলা যায় তরল।

সূর্যের মাল-মশলা যে অবস্থাতেই থাক, তাকে মোটামুটি 'বাষ্প' বলা চলতে পারে। এত গরমে কোন জিনিস তরল অবস্থায় থাকবে একথা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু তাই বা কী করে বলি? বাষ্প বা বায়বীয় পদার্থ বলতে বুঝি খুব হালকা জিনিস। এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন ১ গ্রাম, এই মাপের বাতাসের ওজন এক গ্রামের হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। কিন্তু সূর্যের জ্বলন্ত 'গ্যাস'-এর ঘনত্ব জলের তুলনায় ১·৪ গুণ, অর্থাৎ জলের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ ভারি। এই কারণে 'গ্যাস' বা 'বাষ্প' বলতে খটকা লাগে। সূর্যের মধ্যে জ্বলন্ত বাষ্প কী করে এত ঘন হলো? সূর্যের মাধ্যাকর্ষণই হলো এর কারণ। প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ দিয়েই এই সব জ্বলন্ত বাষ্পকে ঘন সঙ্কুচিত করে রেখেছে।

সূর্যও নিজের মেরুদণ্ডের ওপর লাটিমের মতো ঘুরছে। এই আবর্তন খুব মন্থর, ২৫ দিন ৯ ঘণ্টায় একবার।

পৃথিবীর যেমন স্থল মণ্ডল, জলমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি আছে, সূর্যকেও তেমনি প্রধান তিনটি সৌরমণ্ডলে ভাগ করা যায়। ভিতরের প্রধান অংশের নাম আলোকমণ্ডল (photosphere), তার উপরে বর্ণমণ্ডল (chromosphere), এবং তারও উপরিভাগে ছটামণ্ডল (corona)। সূর্যের প্রধান অংশ হলো আলোকমণ্ডল, ভীষণ গরম, উত্তাপ ২ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তার উপরে বর্ণমণ্ডল, একটু কম গরম, তাহ'লেও জ্বলন্ত। বর্ণমণ্ডলটি সূর্যের প্রধান বায়ুমণ্ডল বলা যেতে পারে, গভীরতায় আট হাজার মাইল, আমাদের পৃথিবী ঠিক ডুবে থাকতে পারে। ছটামণ্ডল একেবারে ওপরে, হাল্কা আলোর মেঘের মতো। সূর্যের
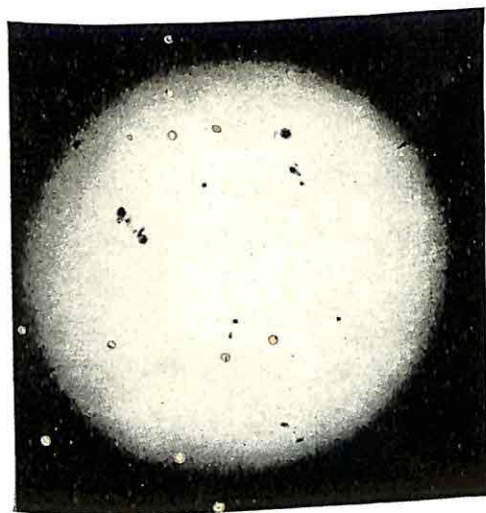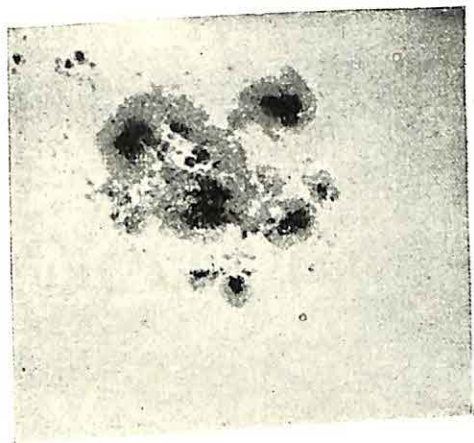
সৌরকলঙ্কের
বর্দ্ধিত চিত্র

সৌরকলঙ্ক

সৌরশিখা
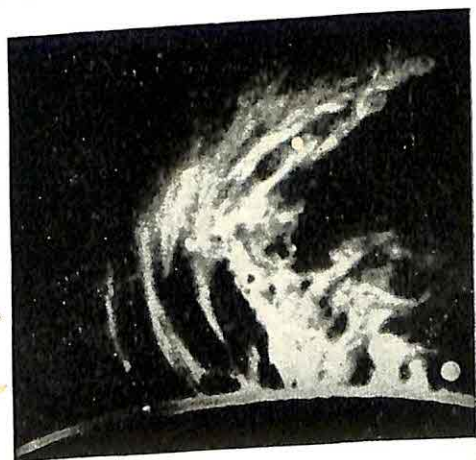
সূর্যের উপরিভাগের
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য
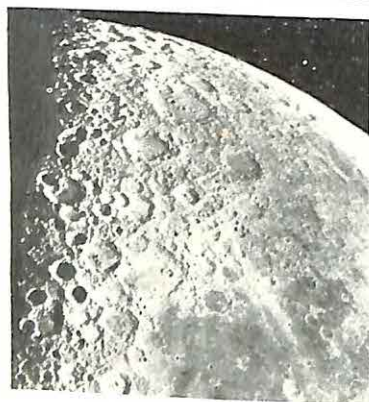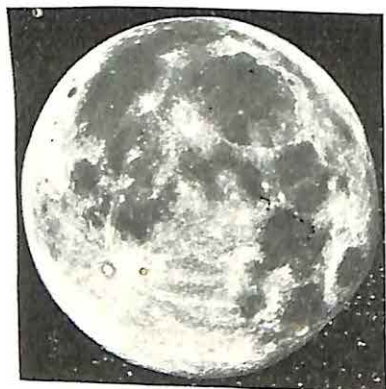
চাঁদের পাহাড়

পৃথিবী থেকে দূরবীণে নেওয়া ফোটো
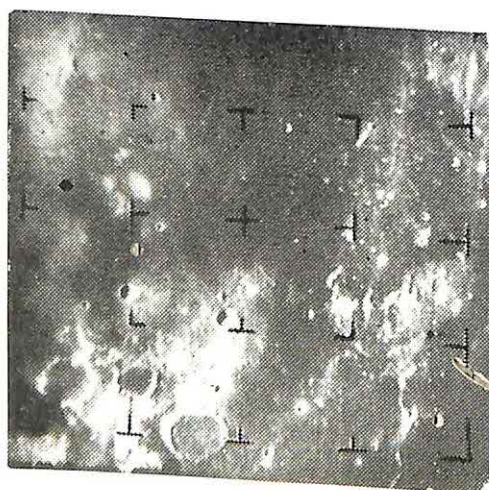
আমেরিকার চাঁদ রকেট রেঞ্জার-৭ থেকে পাঠানো রেডিও ফোটো, জুলাই ১৯৬৪ খৃঃ। সামনের পিঠের ছবি, চাঁদের ৪৮০ মাইল উপর থেকে তোলা।

(দি[illegible]র আমেরিকান দূতাবাসের সৌজন্যে)

লুনিক-৩ থেকে তোলা চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি, ১৯৫৯ খৃঃ।

(দিল্লীর রুশ দূতাবাসের সৌজন্যে)
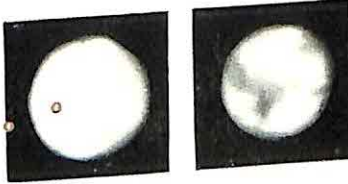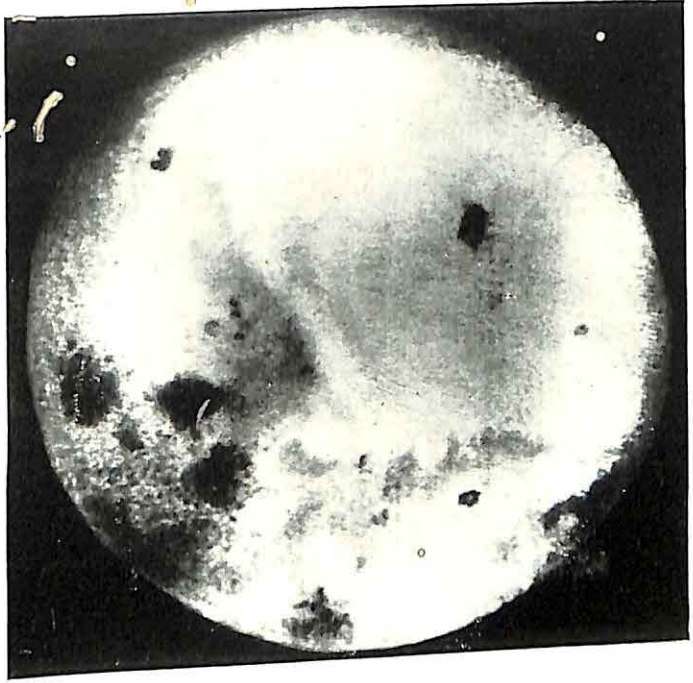
বামদিকের তিনটি শুক্রগ্রহের কলা। ডানদিকের দুটি মঙ্গল গ্রহ।

বৃহস্পতি গ্রহ।
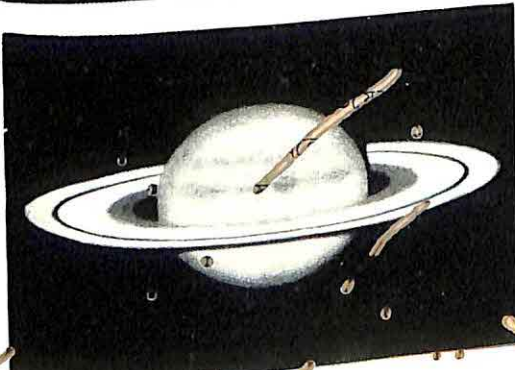
শনিগ্রহ।

ব্রুক্‌স্‌-ধূমকেতু—১৯১১ সালের ৩রা নভেম্বর এই ধূমকেতুটিকে দেখা গিয়েছিল

আরো কটি ধূমকেতু
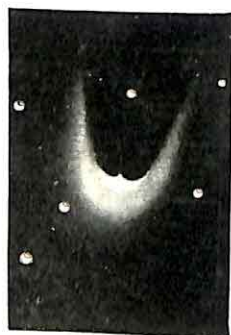
তেজ [illegible] বেশী যে ছটামণ্ডল সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন সূর্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাস হয় তখন ছটামণ্ডল দেখতে পাওয়া যায়।

দূরবীন দিয়ে সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়, তাকে বলে সৌরকলঙ্ক (sun spot)। চাঁদের কলঙ্ক যেমন চাঁদের পাহাড়ের ছায়া, সৌরকলঙ্ক সে জাতীয় নয়। সূর্যের জলন্ত পিঠ সব যায়গায় সমান গরম নয়, তাই সমান উজ্জলও নয়। এই কারণে কোন কোন যায়গা কালো দেখায়। কোন কোন সৌরকলঙ্ক হঠাৎ দেখা দিয়ে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন পরেই মিলিয়ে যায়। যেগুলি অধিক কাল স্থায়ী হয় তারা সূর্যের পিঠে এক দিক থেকে অন্যদিকে ধীরে ধীরে পরিভ্রমণ করে। স্থায়ী কলঙ্কগুলি এগারো বছরে এইভাবে ঘুরে আসে।

ঘরের বাতির আলোর তেজ দীপশক্তি বা candle power দিয়ে মাপা হয়। ঘরে বিজলি বাতি সাধারণতঃ ৪০, ৬০ বা ১০০ পাওয়ারের ব্যবহার হয়ে থাকে। সূর্যও একটি প্রকাণ্ড বাতি, এর তেজ ৩২৩×১০^{২৫} দীপশক্তির সমান (৩২৩×১০^{২৫} মানে ৩২৩ সংখ্যার পরে পঁচিশটি শূন্য দিয়ে লিখলে যে সংখ্যা হয়)। সূর্য কী পরিমাণ আলোক ও তাপশক্তি আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে তা কল্পনার অসাধ্য। আপনার দেহ ক্ষয় করে সূর্য এই বিপুল শক্তি বিকিরণ করছে। প্রত্যেকটি রশ্মিতে অতি সূক্ষ্ম জড়মান (mass) আছে, তাই সূর্য হ'তে তাপ ও আলোক নির্গমে তার দেহের জড়মানও ক্ষয় পাচ্ছে। আলোক শক্তির জড়মান সম্বন্ধে ১৯শ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করব। হিসাব করে দেখা যায় তাপ ও আলোক বিকিরণ করার ফলে সূর্যের ওজন কমে যাচ্ছে প্রতিদিনে প্রায় দশ লক্ষ কোটি মণ করে। সূর্যের এই ক্ষয়ের হার অতীব মারাত্মক বোধ হলেও তার বিরাট দেহের তুলনায় খুবই সামান্য। এইভাবে সূর্য নির্বাপিত নিঃশেষ হতে এখনও কোটি কোটি বছর দেরী আছে।

সূর্য সম্বন্ধে আর একটি [illegible]য়ের কথা আছে। কোন কোন নক্ষত্র হঠাৎ অতিরিক্ত উজ্জল হয়ে জ্বলে উঠতে দেখা যায়। এদের বলে নোভা (nova) বা নবতারা। এই সময় কোন কোনটির উজ্জলতা সাধারণ অবস্থার হাজার

গুণ বেড়ে যায়, আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। নক্ষত্রের অন্তর্দেশে অত্যধিক উত্তাপ ও চাপই এই বিপর্যয়ের কারণ। সূর্যও একটি নক্ষত্র বিশেষ। সূর্য যদি কখনো নবতারা রূপে জ্বলে ওঠে! তাহ'লে আমাদের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। এ হবে আমাদের কাছে প্রলয়াগ্নি। দূরবীন দিয়ে মাঝে মাঝে সূর্যের পিঠে লক্ষাধিক মাইল অগ্নিশিখা (সৌরশিখা) এখানে সেখানে উঠতে দেখা যায়। সৌরশিখাগুলি সূর্যের অন্তর্দেশে তীব্র তাপ ও চাপের পরিচয়। সৌরশিখারূপে এই অতিরিক্ত চাপ মাঝে মাঝে মুক্তি পায় বলেই রক্ষা, না হলে সমস্ত সূর্যটিই নবতারার মতো জ্বলে উঠতে পারত। সৌরশিখাগুলি সূর্যের ভিতরকার অতিরিক্ত চাপের মুক্তিপথ বলে এদের অনেক সময় সূর্যের 'সেফটি ভাল্‌ভ্' (solar safety valve) বলা হয়ে থাকে। ফোটো চিত্রে সৌরকলঙ্ক ও সৌরশিখা দেখান হয়েছে।

উল্কা ও ধূমকেতু

উল্কা ঃ সৌরজগতের মধ্যে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং গ্রহকণিকা এরাই হলো প্রধান; এদের কথা বলেছি। এছাড়া আরো কয়েক প্রকার বস্তুপিণ্ড সৌরজগতের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়, যেমন উল্কা (meteor) ও ধূমকেতু (comet)।

রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে অনেক সময় দেখা যায় আগুনের ফুলকির মতো কী যেন ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পরে আর একটা। সাধারণতঃ আমরা একে 'তারা পড়া' বা 'নক্ষত্র খসা' বলি। প্রকৃত পক্ষে এরা নক্ষত্র বা তারা নয়। এগুলি উল্কাপিণ্ড (meteorite), কোন-না-কোন পথে ঘুরছে। এইসব জড়পিণ্ড এক আধ ছটাক থেকে দু'একশ' মন পর্যন্ত ওজনে। কোনটি যদি কখনও পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে তবে পৃথিবীর টানে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে থাকে। যত কাছে আসে, উড়ন্ত উল্কাপিণ্ডের গতিবেগ ততই বাড়তে থাকে। এই গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে [illegible] থেকে ৫০ মাইল হ'তে দেখা গিয়াছে। উল্কাপিণ্ড যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে থাকে তখন বাতাসের সঙ্গে ঘষা লেগে গরম হ'তে হ'তে

জ্বলে-ওঠে। তখনই আমরা তাদের আগুনের ফুলকির মতো দেখতে পাই। সাধারণতঃ মাটিতে পড়বার আগেই পুড়ে শেষ হয়ে যায়, কোন কোনটি মাটিতেও এসে পড়ে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইয়োয়া প্রদেশে একটা প্রকাণ্ড উল্কাপাত হয়, অনেকটা পুড়ে গেলেও যেটুকু এসে পড়ল তারই ওজন ছিল পাঁচ মনের বেশী। গ্রীনল্যাণ্ডে একটা পড়েছিল, সেটার ওজন ছিল ৯৭০ মন। তবে বেশীর ভাগ দেখা যায় ৫-৭ সের ওজনের। আবার, সাইবেরিয়াতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে একটা পড়েছিল, ৩০০০ মন।

অন্ধকার রাতে, যখন আকাশে চাঁদ থাকে না, আকাশের দিকে নজর রাখলে প্রতি ঘণ্টায় ৬-৭টা উল্কাপাত দেখা যায়। কোন্ উল্কা কোন্‌দিকে কখন পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। সেদিক থেকে এর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। কিন্তু বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে উল্কাপাতের আধিক্য কেন হয় তা' ভাববার বিষয়। ১৩ই জুলাই ও ২৭শে নভেম্বর এইরকম উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় পৃথিবীর কক্ষপথে (orbit) কোন কোন স্থানে উল্কাপিণ্ডের আধিক্য আছে। পৃথিবী যখন এই স্থান দিয়ে যায় তখন উল্কাপিণ্ডদের টেনে নেয়। বিচার করে দেখা গেল ২৭শে নভেম্বর পৃথিবী যেখান দিয়ে যায় সেখান দিয়ে প্রায় একশ' বছর আগে বায়েলার ধূমকেতু (Baela's comet) পৃথিবীর কক্ষ অতিক্রম করত। কালক্রমে ধূমকেতুটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ঐ পথেই ছিটিয়ে থাকে। এই কারণে এখনও প্রতি বছর ২৭শে নভেম্বর পৃথিবী এখানে এসে পড়লে উল্কাপাত বেশী (উল্কাবৃষ্টি) হয়।

ধূমকেতু ঃ ধূমকেতু দেখতে অনেকটা হাল্কা মেঘের ঝাঁটার মত। সম্মুখে গোল মত মাথা, পিছনে ঝাঁটার মতো ঝুঁটিটি কোটি মাইল লম্বা। মাথা চলে আগে আগে, ঝুঁটি ঠিকরে থাকে পিছনে। লাঠির মাথায় মশাল জ্বালিয়ে দৌড়োলে মশালের মুণ্ডটি চলে আগে আগে, আগুনের শিখা (ঝুঁটি) উল্টোদিকে উঁচিয়ে থাকে, এই রকম একটা ছবি মনে জাগছে। মশাল ছুটছে বাতাসের মধ্য দিয়ে, তাই আগুনের শিখা বইছে পিছন দিকে। কিন্তু ধূমকেতু ছুটছে মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে, বাতাস নেই, বাধা নেই। অতএব ধূমকেতু ও মশালের তুলনা ঠিক হয় না। ব্যাপারটা এই যে ধূমকেতুর ঝুঁটি

এত হালকা যে সূর্যের আলোর চাপে (radiation pressure) ঝুঁটিটা সর্বদাই সূর্যের বিপরীত দিকে ঠিকরে থাকে। ধূমকেতুটি যখন সূর্য প্রদক্ষিণ করে তখন প্রতি পদে পদে এই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়।
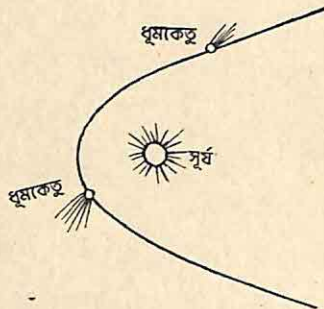
চিত্র —১১ : ধূমকেতুর কক্ষ।

কোন কোন ধূমকেতু সূর্যকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করে চিরতরে পলাতক হয়। আবার কোন কোন ধূমকেতু সূর্যের টানে বাঁধা প'ড়ে বারবার ঘুরে আসে; এদের বলে পর্যাবর্তক (periodic) ধূমকেতু। পর্যাবর্তক ধূমকেতুদের ভ্রমণকাল গ্রহদের ভ্রমণকালের মতো সুনির্দিষ্ট।

বায়েলার ধূমকেতুটির ভ্রমণকাল ছিল ৬½ বছর। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া-বাসী জ্যোতির্বিদ বায়েলা এই ধূমকেতু দেখতে পান। সাড়ে ছ' বছর পরে একে আবার দেখা গেল। তৃতীয় বারে একে নজরে রাখতে রাখতে কিছু দিনের মধ্যেই তাকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেতে দেখা গেল। চতুর্থবারে (১৮৫২ খৃঃ) এই দু-খণ্ডের একটি মাত্র দেখা গেল, তারপর আর দেখা যায় নি। বায়েলার ধূমকেতু এইভাবে চূর্ণ হয়ে যাবার পর থেকে প্রতি বছর ২৭শে নভেম্বর পৃথিবী এই যখন বায়েলার ধূমকেতুর পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে উল্কাপাতের আধিক্য দেখা যায়।

হ্যালির ধূমকেতুটিও খুব প্রসিদ্ধ। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ জ্যোতির্বিদ এডমণ্ড হ্যালি এই ধূমকেতু প্রথম দেখতে পান। তিনি এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ক'রে বুঝলেন এর পর্যাবর্তনকাল ৭৬ বছর। অতএব দ্বিতীয়বারে দেখা যাবে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে। দুঃখের বিষয় হ্যালি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মারা যান, নিজের গণনার ফলাফল দেখে যেতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর গণনা ঠিকই

হয়েছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই ধূমকেতুকে আবার দেখা গেল। হ্যালির ধূমকেতু শেষবার আসে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, আবার দেখা যাবে ১৯৮৬-তে।

ধূমকেতুর শরীর বিরাট, হাজার মাইল চওড়া, কোটি মাইল লম্বা। কিন্তু সে তুলনায় ওজন অতি অল্প। আয়তনে পৃথিবীর হাজার হাজার গুণ, কিন্তু ওজনে পৃথিবীর লক্ষ ভাগেরও কম। অর্থাৎ ঘনত্ব (density) বাতাসের চেয়েও কম। এক ঘনফুট আয়তনের বাতাস যত ভারী (খুবই সামান্য) ততখানি আয়তনে ধূমকেতুর মালমশলা নিলে আরও দুলক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র হবে। ধূমকেতুর এইরকম বিরল (rarefied) শরীরের মধ্য দিয়ে তাই দৃষ্টি বেশ চলে। ধূমকেতুর মধ্য দিয়ে পিছনের নক্ষত্রদের দেখতে কিছুই অসুবিধা হয় না।

ধূমকেতুর শরীরটা জলন্ত বাষ্প দিয়ে তৈরী নয়। কোটি কোটি ছোট ছোট কাঁকর বা ধূলিকণার মতো জিনিস দিয়ে তৈরী। ধূমকেতুর নিজের কোন আলো নেই, সূর্যের আলো পড়েই আলোর ছটার মতো দেখায়।

অধ্যায়—৬

নক্ষত্র জগৎ

লক্ষ লক্ষ তারা আমরা রাতের আকাশে দেখি। আমাদের কাছে সূর্য একটা প্রকাণ্ড জ্যোতিক মনে হলেও সূর্য আরো হাজার হাজার নক্ষত্রের মতো একটি নক্ষত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তাও এমন নয় যে সূর্য একটি প্রধান নক্ষত্র। অন্যান্য তারকাদের আয়তন উত্তাপ বিচার করলে দেখা যায় সূর্য একটি মাঝারি ধরনের নক্ষত্র। সূর্যের চেয়ে হাজার গুণ বড় নক্ষত্র আছে অনেক। সূর্যের চেয়ে বেশী উত্তপ্ত নক্ষত্রেরও অভাব নেই। আবার সূর্যের চেয়ে ছোট বা কম গরম তারাও প্রচুর আছে। কোন কোন নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে হাজার গুণ উজ্জ্বল, আবার সূর্যের চেয়ে কম উজ্জ্বল তারাও আছে।

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মোটামুটি ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সূর্য থেকে এই মুহূর্তে যে আলো রওনা হ'ল তা পৃথিবীতে পৌঁছাতে লাগবে ৮⅓ মিনিট, কারণ আলো চলে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে। সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছে যে নক্ষত্র সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতে লাগে ৪⅓ বছর। নক্ষত্রদের দূরত্ব এত বিরাট যে 'মাইল' হিসাবে বলা প্রায় অসম্ভব; সংখ্যাগুলি এত বড় হয়ে পড়ে যে আয়ত্ব করা যায় না। এক বছর ধরে চলে আলো যতদূর যায়, প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল ক'রে,—সেই দূরত্বকে নক্ষত্রজগতের মাপকাঠি ধরলে সুবিধা হয়। এই দূরত্বকে বলে এক আলোক বর্ষ (light year), মাইল হিসাবে ৫৮৭ হাজার কোটি মাইল। আমাদের কাছ থেকে ধ্রুবতারার দূরত্ব ৪৭ আলোক বর্ষ। আর্দ্রা নক্ষত্রের দূরত্ব ২০০ আলোক বর্ষ। সব চেয়ে দূরের নক্ষত্র দেখতে পাওয়া গিয়েছে প্রায় এক লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে।

আমাদের নক্ষত্ররাজ্যে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। সব নক্ষত্র চোখে দেখা যায় না, দূরবীন দিয়ে অনেক বেশী দেখা যায়। আমাদের

নক্ষত্র রাজ্য' মানে কী? আর কোথায় নক্ষত্র রাজ্য আছে? সে কথা পরে বলছি। খালি চোখে প্রায় তিন হাজার নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, এগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। সবচেয়ে বড় দূরবীন দিয়ে প্রায় দু'শো কোটি তারা দেখতে (বা ফোটো তুলতে) পারা যায়।

ছায়াপথ ঃ অন্ধকার রাতে যখন আকাশে চাঁদ থাকে না, মেঘও নেই, তখন ছায়াপথ দেখা যায়। অসংখ্য ঝিক্‌মিকে তারার মধ্য দিয়ে এই ছায়া পথ—সাদাটে হাল্কা মেঘের মতো দেখায়। বাইনাকুলার বা দূরবীন দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এটা মেঘ নয়, অসংখ্য তারা চিক্‌চিক্ করছে সেখানে। ছায়াপথের নক্ষত্রগুলি সব চেয়ে দূরে, আমাদের নক্ষত্ররাজ্য ছড়িয়ে আছে এই দিকে সবচেয়ে বেশী। আসলে এই নক্ষত্র জগতও সব নক্ষত্র নিয়ে চাকার মতো ঘুরছে, ফলে এই রাজ্যের নক্ষত্রগুলি ছড়িয়ে পড়েছে, অনেকটা যেমন ঘুরন্ত ভেজা চাকা থেকে বিন্দু বিন্দু জল ছিটিয়ে পড়ে। নক্ষত্র জগৎ যদি না ঘুরত তাহ'লে নক্ষত্রগুলি সমানভাবে আকাশের সব দিকে ছড়িয়ে থাকত, ছায়াপথ রেখা সৃষ্টি হ'ত না।

নক্ষত্রজগৎ না ঘুরলে কী হ'তো তা ভাববার কথা। না ঘুরলে সূর্য, নক্ষত্র সৃষ্টি হ'তো কিনা সন্দেহ। যদি ধরি নক্ষত্রজগৎ ঘুরছে না, তাহ'লে সব নক্ষত্রগুলি পরস্পর মাধ্যাকর্ষণের টানে একত্র জড়ো হয়ে পড়তো না কি? এই যুক্তি সৌরজগতের বেলাও খেটেছিল। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ যদি না ঘুরত তাহ'লে সবাই সূর্যের টানে সূর্যের উপর গিয়ে পড়ত। ঘুরছে বলেই মাধ্যাকর্ষণের টান কাটিয়ে চলতে পারছে। ব্যাপারটা ৪র্থ অধ্যায়ে সূর্য ও মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেছি।

নক্ষত্ররাজ্যও ঘুরছে। কুড়ি হাজার কোটি নক্ষত্র নিয়ে এই নক্ষত্রজগৎ ঘুরছে। একবার ঘুরতে লাগে ২৫ কোটি বছর! এই নক্ষত্র চক্রের কেন্দ্র (centre) কোথায়? সূর্য কি এই নক্ষত্র চক্রের কেন্দ্রস্থলে? না। আমরা আছি নক্ষত্রচক্রের কেন্দ্র ও পরিধির মাঝামাঝি। 'আমরা' মানে সূর্য বা সৌরজগৎ যা-ই ধরি না কেন। কারণ এই বিশাল নক্ষত্ররাজ্যের মধ্যে সূর্য বা সৌরজগৎ দুই-ই বিন্দুবৎ।

আমাদের তারার রাজ্যকে নানা নাম দিয়ে বলা যায়ঃ তারকা রাজ্য,

নক্ষত্র জগৎ, নক্ষত্র দ্বীপ (steller island), বা ছায়াপথ জগৎ (galactic system)। এই ছায়াপথ জগতের কেন্দ্রস্থল কোথায় তা মোটামুটি জানা গিয়েছে। ছায়াপথের উপর দিয়ে ধনুরাশির তারার মালা, এই খানটা ছায়াপথ খুব ঘন সাদাটে মেঘের মতো উজ্জ্বল। ওই ধোঁয়াটে জায়গাটাই আমাদের নক্ষত্ররাজ্যের কেন্দ্র, আমাদের কাছ থেকে প্রায় ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে! নক্ষত্ররাজ্যের এই কেন্দ্র থেকে পরিধি প্রায় ৬০,০০০ আলোকবর্ষ, অর্থাৎ ব্যাসার্ধ (radius) ৬০,০০০ আলোক বর্ষ। তাহ'লে আমাদের ছায়াপথ বা নক্ষত্ররাজ্যের ব্যাস (diameter) বা বিস্তৃতি ১,২০,০০০ আলোকবর্ষ। এটা দীর্ঘ ব্যাসের দিকে, অর্থাৎ নক্ষত্ররাজ্য ঘুরবার ফলে যে দিকটা ছড়িয়ে পড়েছে সেই দিকে। আড়াআড়ি দিকে চ্যাপ্টা, সে দিকে ক্ষুদ্র ব্যাস প্রায় ৩০,০০০ আলোক-বর্ষ।
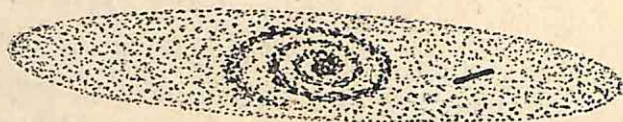
চিত্র—১২ঃ আমাদের নক্ষত্র জগৎ বা ছায়াপথ রাজ্য। ছোট দাগের কাছে সৌরজগৎ।

আমাদের নক্ষত্র জগৎকে চ্যাপ্টা মুড়ির মোয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, একেবারে গোল মোয়া নয়, বেশ খানিকটা থ্যাবড়ানো হলে যেমন হয়। মুড়িগুলি যেন নক্ষত্র। তবে মোয়ার মধ্যে মুড়িগুলি গায়ে গায়ে লাগানো, নক্ষত্ররাজ্যের তারাগুলি খুব দূরে দূরে।

সূর্য, নক্ষত্র সবই ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হচ্ছে। কোটি কোটি বছর আগে আরো গরম ছিল। আরো আগে সব ছিল আরো ভীষণ গরম, বাষ্প বা গ্যাস হয়ে সব ছড়িয়ে ছিল এই মহাশূন্যের মাঝে। তখনও এই বিশাল গ্যাস-রাজ্য বা নীহারিকা (nebula) ঘুরছিল। ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হলে এই ঘুরন্ত গ্যাস থেকে নক্ষত্র পিণ্ড সৃষ্টি হলো। না ঘুরলে ঐ আদিম বাষ্প-জগৎ থেকে কখনো নক্ষত্র সৃষ্টি হতে পারতো না।

এটা শুধু যুক্তির কথা নয়। দূরবীন দিয়ে আরো অনেক ঘুরন্ত নক্ষত্র

অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা
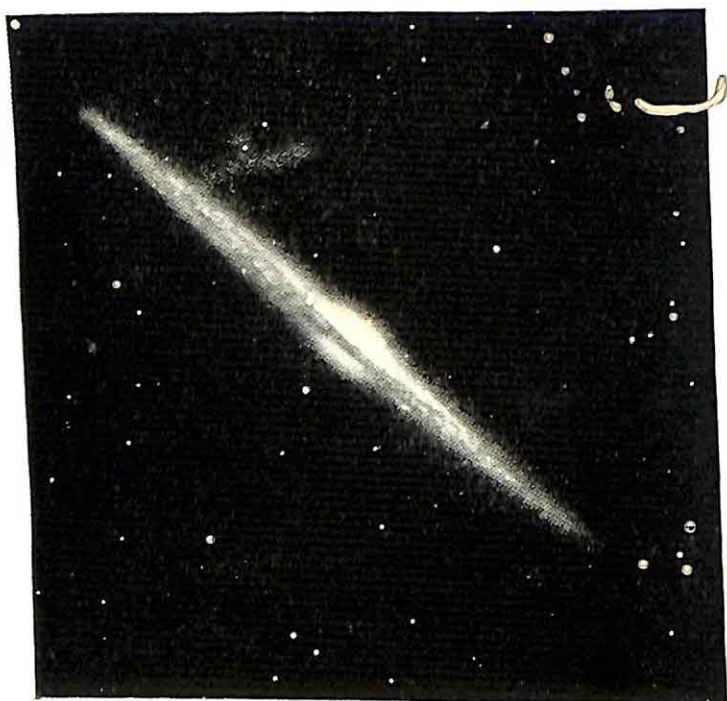
(১)

(২)

আরো দুটি নীহারিকা
(১) লেন্স্ বা চ্যাপ্টা (২) কুণ্ডলিত বা স্পাইরাল

জগৎ (spiral nebula) দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এরা আছে আমাদের নক্ষত্রজগৎ বা ছায়াপথ রাজ্যের বাইরে। এই কারণে এদের আর একটি নাম ছায়াপথাতীত নীহারিকা বা extragalactic nebula। প্রায় ১০ লক্ষ ছায়াপথাতীত নীহারিকা দেখতে পাওয়া গিয়েছে বড় দূরবীন্ দিয়ে, এদের মধ্যে গড়পড়তা ব্যবধান প্রায় ১৫ লক্ষ আলোকবর্ষ ক'রে। এদের বেশীর ভাগই 'ঘুরন্ত'। ছবি দেখলেই বোঝা যাবে। এই সব ঘুরন্ত নীহারিকার মধ্যে নক্ষত্রও সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায়; কিন্তু মাঝখানটায় রয়েছে বিরাট গ্যাসের দলা, সেখানে ঘূর্ণির জোর অল্প তাই গ্যাস ছিটিয়ে নক্ষত্র সৃষ্টি হতে পারে নি।

আমাদের নক্ষত্ররাজ্যের বাইরে যে সব নীহারিকা, সবাই ঘুরছে না। যেগুলি ঘুরছে না, সেগুলি চ্যাপটা হয়নি, নক্ষত্রও সৃষ্টি হয়নি। তবে বেশীর ভাগ নীহারিকাই ঘুরছে, কোনটা জোরে কোনটা আস্তে। যেগুলি জোরে ঘুরছে সেগুলি বেশী চ্যাপটা হ'য়ে পড়েছে, নক্ষত্রও বেশী সৃষ্টি হয়েছে। যেগুলি আস্তে ঘুরছে, সেগুলি তত ছড়িয়ে চ্যাপটা হয় নি, বেশী নক্ষত্রও তৈরী হয় নি, মধ্যের গ্যাসের পরিমাণ বেশী রয়ে গিয়েছে।

আমাদের নীহারিকা বা নক্ষত্ররাজ্য বেশ জোরে ঘুরছে, আদিম গ্যাস থেকে প্রায় পুরোপুরিই নক্ষত্র সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, তবে এখনও এর মধ্যে নক্ষত্র-না-হওয়া গ্যাস কোথাও কোথাও রয়ে গিয়েছে। আমাদের নক্ষত্ররাজ্য বেশ জোরে ঘুরছে, তাহ'লেও এই নক্ষত্রচক্র একবার পুরোপুরি ঘুরতে লাগে ২৫ কোটি বছর। নক্ষত্র দ্বীপের আবর্তন সে হিসাবে খুবই মন্থর, কিন্তু এই বিশাল বিস্তৃত জগৎ এত ধীর ভাবে ঘুরলেও ঘূর্ণন-কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি মাইল দূরের নক্ষত্রগুলিকে চলতে হয় প্রচণ্ড বেগে। সূর্য আছে নক্ষত্র দ্বীপের কেন্দ্র ও পরিধির মাঝামাঝি, কেন্দ্র থেকে ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে। ফলে সূর্য এই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০ মাইল বেগে। আমরাও চলেছি সূর্যের সঙ্গে।

অধ্যায়—৭

বিচিত্র নক্ষত্র

আকাশে নানা প্রকার নক্ষত্র আছে। কোনটি সাদা, কোনটি লাল, কোনটি হলদে, কোনটি আবার নীলাভ। কোন তারা আমাদের সূর্যের সমান, কোনটি সূর্যের সহস্রাংশ, কোনটি আবার সূর্যের লক্ষগুণ। কোন নক্ষত্র নিঃসঙ্গ একক, কোনটি যুগল (binary), কোনটি বহু সঙ্গীবিশিষ্ট। উজ্জ্বলতায় নানা প্রকার পার্থক্য আছে, উত্তাপ মাত্রাও বিভিন্ন, ঘনত্বও হয় নানা রকম। অর্থাৎ আকাশ বিচিত্র নক্ষত্রের হাট। এখানে কয়েক প্রকার নক্ষত্রের পরিচয় দেওয়া হল।

যুগল নক্ষত্র ঃ খালি চোখে সকল নক্ষত্রকেই এক একটি আলোর বিন্দুর মতো মনে হয়। শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে এদের অনেককেই যুগল নক্ষত্র (binary star) বলে চেনা যায়। যুগল নক্ষত্রের দুইটি সঙ্গী পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে।

সকল জ্যোতিষ্কই অল্প বিস্তর আবর্তনশীল, যেমন, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, সূর্য এমন কি সারা নক্ষত্র দ্বীপও। নক্ষত্ররাও নিজের নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে, কোনটি আস্তে, কোনটি জোরে। এইভাবে ঘোরার ফলে কোন কোন নক্ষত্র ভেঙ্গে দু-টুকরো হয়ে 'যুগল' নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছে, যুগল হয়েও তাদের ঘোরার বিরাম নেই। যুগল নক্ষত্রের দুটি অংশ সমান সমান বা ছোট বড় হতে পারে। আল্‌ফা মহিষাসুর নক্ষত্রটি যুগল, দুই খণ্ড প্রায় সমান সমান। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হ'লো লুব্ধক, এটিও যুগল এবং এর বড় খণ্ডটি ছোট খণ্ডের হাজার গুণ।

যুগল নক্ষত্র ঘোরার ফলে কখন কখন এক অংশ অন্য অংশের পিছনে আড়াল হয়ে পড়ে, তখন নক্ষত্রের প্রভা কম বলে মনে হয়। আবার যখন ঘুরে এসে পাশাপাশি হয় তখন আলোর তেজ (প্রভা) বেড়ে যায়। এই ব্যাপারকে নক্ষত্র গ্রহণ বলা যেতে পারে। এই ধরনের যুগলকে গ্রহণমান

যুগল (eclipsing binary) বলে। গ্রহণমান যুগলের প্রভার হ্রাস বৃদ্ধি থেকে এদের আবর্তনকাল (period of rotation) সহজেই জানা যায়। প্রভাব হ্রাস বৃদ্ধি (বা আবর্তন) কয়েকদিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে দেখা যায় বিভিন্ন যুগল নক্ষত্রের।

যুগল ছাড়াও বহু-সঙ্গী বিশিষ্ট নক্ষত্রও দেখতে পাওয়া যায়, সব অংশগুলি প্রদক্ষিণ করে।

তারকাগুচ্ছ ঃ দূরবীন দিয়ে আকাশের কোন কোন অংশে কাছাকাছি হাজার হাজার নক্ষত্রের জটলা দেখা যায়। এদের বলে তারকাগুচ্ছ (star cluster)। কোন কোন তারকাগুচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার তারা থাকে। আমাদের নক্ষত্ররাজ্যে প্রায় ৭০টি তারকাগুচ্ছ দেখা গিয়েছে।

নবতারা ঃ মাঝে মাঝে এক একটি নক্ষত্র হঠাৎ খুব উজ্জ্বল ও বিস্তৃত হয়ে উঠতে দেখা যায়। এদের বলে নবতারা (nova)। কেন যে এরকম ভীষণ ব্যাপার ঘটে তা এখনও ঠিক করে বলা যায় না। সম্ভবতঃ নক্ষত্রের মধ্যে তাপ ও চাপ বেড়ে গিয়ে এভাবে হঠাৎ জলে ওঠে, ফুলে ওঠে। কয়েক-দিন ধরে এভাবে বাড়তে বাড়তে আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

নবতারার বিষয় একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এরা কম বেশী উজ্জ্বল হলেও নবতারা হ'য়ে যখন উজ্জ্বলতম প্রভা ধারণ করে তখন সবগুলিই সমান উজ্জ্বল হয়। এই অবস্থায় সকল নবতারাই সূর্যের ২৫ গুণ প্রভা ধারণ করে। নবতারা কচিৎ দু-একটি দেখা যায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ঈগল নক্ষত্রটি নবতারারূপে (Nova Aquila) জলে উঠতে দেখা গিয়েছিল।

শ্বেত বামন। নক্ষত্রগুলি নানা আকারের হয়। কতকগুলি নক্ষত্র সাধারণ নক্ষত্রের তুলনায় আয়তনে খুব ছোট, যেমন লুব্ধক ও প্রশ্বার ছোট সঙ্গীদুটি। সঙ্গীরূপে ছাড়াও পৃথকভাবে এই প্রকার ক্ষুদ্রায়তন নক্ষত্র দেখা যায়। ফান মানেন (Van Mannen) এই জাতীয় 'বামন' নক্ষত্র (dwarf star) আবিষ্কার করেন। আয়তনে ছোট হলেও এরা ভীষণ গরম, সূর্যের চেয়েও; এবং দেখতে ঝক্‌ঝকে সাদা। এই কারণে এদের শ্বেতবামন তারা (white dwarf star) বলা হয়ে থাকে।

শ্বেতবামন নক্ষত্রের উপাদান বস্তু বা মালমাশলার 'ঘনত্ব' (density) বৈজ্ঞানিকদের চমক লাগিয়ে দিয়েছে। এরা আকারে ছোট, কিন্তু ওজনে ভীষণ ভারী। হিসাব করে দেখা যায় যে শ্বেত বামনের মালমশলা একসেরি গ্লাসে নিতে পারলে তার ওজন হবে ৯০০০ মন। কোনও জিনিস এত ঘন কী করে হতে পারে তা ভেবে বৈজ্ঞানিকরা অবাক হয়ে গিয়েছেন।

লোহিত ও পীতদানব। আবার অতি বিরাটকায় দানব নক্ষত্রও দেখতে পাওয়া যায়। যাদের রং লাল্‌চে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে লোহিত দানব নক্ষত্র (red giant), যেগুলি হলদে রঙের তাদের বলা হয় পীত-দানব (yellow giant)। কালপুরুষ (orion) নক্ষত্রপুঞ্জের উত্তর কোণে একটা বেশ উজ্জ্বল লাল্‌চে রঙের তারা আছে, তার নাম আর্দ্রা। এটি লোহিত দানব নক্ষত্র, আয়তনে সূর্যের ৪,৩০,০০,০০০ গুণ!

ব্রহ্মহৃদয় (capella) নক্ষত্রটি যুগল, এবং যুগলের দুটি অংশই পীত-দানব। বড়টি আয়তনে সূর্যের ১৩০০ গুণ, ছোটটি সূর্যের ৩০০ গুণ।

বেপমান নক্ষত্র (variable star)। যুগল নক্ষত্র সম্পর্কে বলেছি এক অংশ যখন অন্য অংশের আড়ালে যায় তখন প্রভা কম দেখায়, আবার ঘুরে পাশে এলে প্রভা বেশী দেখায়। কিন্তু তাদের নিজস্ব প্রভা কমে-বাড়ে না, আড়াল হওয়ার জন্যই কম বেশী মনে হয়।

তবে এমনও নক্ষত্র আছে যাদের নিজস্ব প্রভাই কমে-বাড়ে। ধ্রুব-তারাকে মধ্যে রেখে সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিপরীত দিকে শিবি (Cepheus) নক্ষত্রপুঞ্জ। এদের মধ্যে যেটি উজ্জ্বলতায় চতুর্থ সেটির প্রভার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। বহুদিন থেকে বৈজ্ঞানিকরা এটি লক্ষ্য করেছেন। এই জাতীয় তারাকে বলে বেপমান বা পরিবর্তনশীল নক্ষত্র (variable star)। শিবির এই নক্ষত্রের বেপনকাল ৫⅓ দিন, এই সময়ের মধ্যে প্রভার সম্পূর্ণ হ্রাসবৃদ্ধি হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার প্রভার নিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধি চলছে। 'মীর' নক্ষত্রটিও (Mira Ceti) বেপমান, ১১ মাস ধরে উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি চলে। প্রায় তিনশ বছর আগে একজন জার্মান জ্যোতির্বিদ ফাব্রিসীয়ুস এই নক্ষত্রটির প্রভা-পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। এরও আগে শিবি নক্ষত্রের প্রভার হ্রাসবৃদ্ধি আবিষ্কার

হয়েছিল। এখন এইরকম বেপমান সকল নক্ষত্রদেরই 'শিবি-পরিবর্তনশীল' জাতীয় নক্ষত্র (Cepheid Variables) বা 'সেফাইড' বলা হ'য়ে থাকে।

সেফাইড জাতীয় তারা সম্পর্কে একটা অদ্ভুত নিয়ম লক্ষ্য করা গিয়েছে। সমান উজ্জ্বল বেপমান নক্ষত্রদের বেপনকালও সমান ; উজ্জ্বলতরদের বেপনকালও বেশী। যেসব সেফাইডের বেপনকাল ৪০ ঘণ্টা, তাদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য সূর্যের ২০০ গুণ, যেগুলির বেপনকাল ১০ দিন তাদের উজ্জ্বলতা সূর্যের ১৬০০ গুণ ইত্যাদি। যদি এমন একটি ক্ষীণ নক্ষত্র দেখা যায়, যার বেপনকাল ৫$\frac{১}{৩}$ দিন তাহ'লে বুঝতে হবে তার প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য ৪র্থ শিবির মতোই, শুধু অধিক দূরত্বের জন্যই ক্ষীণ-প্রভ দেখাচ্ছে।

আবিষ্কারটি খুব মূল্যবান, কারণ এই সূত্র থেকে তাদের দূরত্ব নির্ণয় করা যাবে। উদাহরণ ধরা যাক : একটি নক্ষত্র দেখা গেল যার বেপনকাল ৫$\frac{১}{৩}$ দিন, এবং দৃশ্যতঃ এর ঔজ্জ্বল্য ৪র্থ শিবির এক নবমাংশ। এই নক্ষত্রের দূরত্ব কী করে নির্ণয় করা যাবে? প্রথমতঃ, বেপনকাল থেকে বোঝা গেল এটির প্রকৃত প্রভা ৪র্থ শিবির সমান, কারণ বেপনকাল সমান। তাহ'লে সমান উজ্জ্বলতার নক্ষত্রটির উজ্জ্বলতা এক নবমাংশ দেখাচ্ছে কেন? উত্তর হবে, এই নক্ষত্রটি ৪র্থ শিবির তুলনায় অনেক দূরে আছে বলে। কত দূরে আছে? এর উত্তর সহজ। সমান উজ্জ্বল হয়েও যখন উজ্জ্বলতা এক-নবমাংশ দেখাচ্ছে তখন বুঝতে হবে এটি আছে ৪র্থ শিবির তুলনায় তিনগুণ দূরে। তিনগুণ দূরত্বে আলোর তেজ এক-নবমাংশ হয়ে পড়ে ($\frac{১}{৩} \times \frac{১}{৩} = \frac{১}{৯}$), চারগুণ দূরত্বে আলোর তেজ ষোল ভাগের একভাগ ($\frac{১}{৪} \times \frac{১}{৪} = \frac{১}{১৬}$) হয়, দশগুণ দূরত্বে আলোর তেজ একশ ভাগের একভাগ ($\frac{১}{১০} \times \frac{১}{১০} = \frac{১}{১০০}$) হয়, ইত্যাদি। এইভাবে সেফাইড নক্ষত্রর বেপনকাল থেকে জানা যায় তাদের প্রকৃত উজ্জ্বলতা, আর আপাতঃ (apparent) উজ্জ্বলতা থেকে জানা যায় তাদের দূরত্ব।

আমাদের নক্ষত্র রাজ্যের বাইরে আরো অনেক নক্ষত্র রাজ্য বা নক্ষত্রদ্বীপ আছে সে কথা বলেছি। ঐ সব ছায়াপথাতীত নীহারিকার মধ্যে অনেক তারা আছে, তাদেরও দূরবীন দিয়ে দেখা যায়। ঐসব নক্ষত্রদের মধ্যে কোন কোনটি সেফাইড জাতীয় বেপমান তারাও আছে। তাদেরও একই

নিয়ম। এই উপায়ে ছায়াপথাতীত নিহারীকাদেরও দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব।

নক্ষত্র মেঘ। তারকাগুচ্ছ বলতে যতগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ বোঝায়, নক্ষত্র-মেঘ বলতে বোঝায় আরো অনেক বেশী তারকার সমষ্টি। এত বেশী তারা একত্র থাকায় মেঘের মতো দেখায়। এই কারণে একে বলে নক্ষত্র-মেঘ (star cloud)। দক্ষিণ মেরু বিজয়ী ম্যাগেলান (Magellan) দক্ষিণ মেরু আকাশে এই রকম একটি নক্ষত্র-মেঘ প্রথম লক্ষ্য করেন। এইজন্য একে ম্যাগেলানের মেঘ (Magellanic Cloud) বলা হয়ে থাকে।

দক্ষিণ আকাশের এই নক্ষত্র মেঘের মধ্যে হাজার-হাজার তারা আছে, শুধু তাই নয়, অনেক তারাই ভীষণ উজ্জ্বল। আমাদের আকাশে লুব্ধক নক্ষত্র সবচেয়ে উজ্জ্বল। দক্ষিণ আকাশের এই নক্ষত্র-মেঘের মধ্যে লুব্ধকের চেয়েও উজ্জ্বল তারা আছে, অন্ততঃ পাঁচ লক্ষটি। লুব্ধক আমাদের সূর্যের চেয়ে ২৬ গুণ উজ্জ্বল। এছাড়া ঐ নক্ষত্র-মেঘের মধ্যে আরো অনেক তারা আছে। আরও মজা এই যে এর মধ্যে অনেকগুলি বেপমান নক্ষত্র থাকায় নক্ষত্র-মেঘটির দূরত্ব বেশ ভাল ভাবেই জানা গিয়েছে। আমাদের কাছ থেকে নক্ষত্র-মেঘটির দূরত্ব ৯৫০০০ আলোকবর্ষ, আর বিস্তৃতিতে ৬০০০ আলোকবর্ষ। এই রকম আরও একটি নক্ষত্র-মেঘ দেখা গিয়েছে ধনুরাশির মধ্য দিয়ে।

নক্ষত্র-প্রভা। নক্ষত্রদের আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে যেমন তাদের জাতি বিভাগ করা গেল, উজ্জ্বলতা বা প্রভা অনুসারেও তাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়ে থাকে। উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলি প্রথম প্রভার নক্ষত্র (first magnitude star), যেমন, লুব্ধক (sirius), প্রশ্বা (procyon), আর্দ্রা (betelgeux), মঘা (regulus), ব্রহ্মহৃদয় (capella) ইত্যাদি। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অধিকাংশই দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্র। খালিচোখে পঞ্চম (বড় জোর ষষ্ঠ) প্রভার নক্ষত্র পর্যন্ত নজরে আসে। শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে বিংশতি প্রভা (20th magnitude) পর্যন্ত দেখা যায়।

অধ্যায়—৮

নক্ষত্র পরিচয়

কোনও নক্ষত্রের ঠিকানা জানতে হলে আগে জানা দরকার নক্ষত্রদের শহর, অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ। কতগুলি নক্ষত্র নিয়ে প্রাচীন মুনিঋষি ও জ্যোতিষ্কারকরা এক একরকম ছবি কল্পনা করতেন, সেই অনুসারে নক্ষত্র-পুঞ্জের নামকরণ হ'তো। সচরাচর জন্তুজানোয়ার ও সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে নাম দেওয়া হ'তো, যেমন, সিংহ নক্ষত্রপুঞ্জ বা সিংহরাশি, বৃশ্চিক, মৎস্য, ধনু ইত্যাদি। এইভাবে নক্ষত্রপুঞ্জ চিনতে ও মনে রাখতে সুবিধা ; এই সব প্রাচীন পৌরাণিক নাম এখনও চলে আসছে। ভারতীয় নামের সঙ্গে রোমান নামের বিশেষ মিল দেখা যায়, যেমন, সিংহরাশি—Leo, বৃশ্চিক—Scorpio, কর্কট—Cancer, ইত্যাদি। রোমানদের বর্ষগণনাও আরম্ভ হয় মার্চ মাস থেকে, মার্চ মাসে আমাদের বৈশাখ। মার্চ মাস বছরের প্রথম মাস বলে সেপ্টেম্বর অর্থে সপ্তম মাস, অক্টোবর—অষ্টম মাস এইরকম দাঁড়ায়।

নক্ষত্রপুঞ্জ (Constellation) যেমন জীব জন্তু ইত্যাদির নামে নামকরণ হয়েছে, এক একটি নক্ষত্র দেবদেবীর নামে নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন, বশিষ্ট, মায়াবতী……।

নক্ষত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জের পরিচয় দিতে সুবিধা হবে বলে আকাশকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবো : উত্তর আকাশ, মধ্য আকাশ আর দক্ষিণ আকাশ। নক্ষত্র মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে।

উত্তরাকাশ

সপ্তর্ষিমণ্ডল। উত্তর আকাশের প্রধান নক্ষত্রপুঞ্জ সপ্তর্ষিমণ্ডল। ইংরেজী নাম Great Bear (বড় ভালুক) বা Ursa Major। সাতটি তারা সাজিয়ে আছে অনেকটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের (?) মতো, কেউ বলে লাঙলের
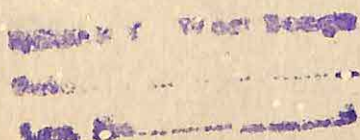
মতো। জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো ধরলে উপর দিক থেকে সাতটি প্রধান নক্ষত্রের নাম যথাক্রমে—ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। বশিষ্ঠ নক্ষত্রের ইংরেজী নাম Mizar ; এটি যুগল নক্ষত্র, সাধারণ দূরবীন দিয়েই দেখা যায়।
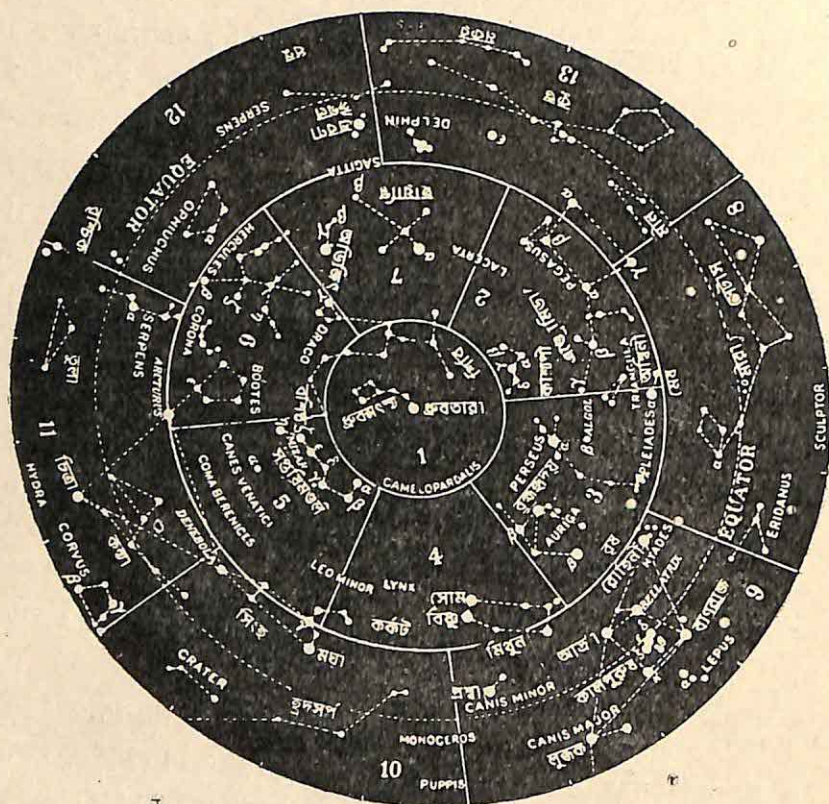
চিত্র—১৩ঃ উত্তর আকাশ।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাহায্যে সহজেই ধ্রুবতারা চেনা যায়। জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো ধরে উপরের দুটি তারা যোগ করে প্রথমটির দিকে সরল রেখা বাড়িয়ে দিলে একটা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল নক্ষত্র পাওয়া যায়, সেটাই ধ্রুবতারা।

ধ্রুবমৎস্য। ধ্রুবতারার কাছে আরও ছ'টি স্বল্প প্রভার নক্ষত্র আছে। ধ্রুবতারা নিয়ে এই সাতটির নাম ধ্রুব মৎস্য, ইংরেজী নাম Little Bear (Ursa Minor) বা ছোট ভালুক।

ধ্রুবতারা। রাত্রির যে কোন সময়ে এবং বৎসরের যে কোন ঋতুতে ধ্রুবতারাকে আকাশের একই অংশে স্থির অধিষ্ঠিত দেখা যায়। অন্যান্য নক্ষত্র যেমন ২৪ ঘণ্টায় আকাশ ঘুরে আসে, উদয় অস্ত হয়, ধ্রুবতারার তেমন হয় না। পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের জন্যই সূর্য ও নক্ষত্রদের উদয় অস্ত হয়। কিন্তু ধ্রুবতারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড বরাবর থাকায় তাকে ঘুরতে দেখা যায় না, মনে হয় সমস্ত নক্ষত্রপট ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ধ্রুবতারা উত্তর দিক নির্দেশক নক্ষত্র বলে পরিচিত। ধ্রুবতারার দূরত্ব এখান থেকে ৪৭ আলোক বর্ষ।

কাশ্যপী (Cassiopia)। ধ্রুবতারা থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল যত দূরে, ঠিক তত দূরেই বিপরীত দিকে কাশ্যপী নক্ষত্রপুঞ্জ। কাশ্যপীর উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি ইংরেজী w অক্ষরের মতো সাজানো। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে কাশ্যপী নক্ষত্রপুঞ্জে একটি নবতারা (nova) জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছিল।

শিবি (Cepheus)। কাশ্যপী ও ধ্রুবতারার মাঝামাঝি এই নক্ষত্র-পুঞ্জটি। এর বিশেষত্ব, এর চতুর্থ নক্ষত্রটি, যার নাম ডেল্টা সেফাইড (delta cepheid)। গ্রীক বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষর ডেল্টা। গ্রীক বর্ণমালা: আল্‌ফা, বিটা, গামা, ডেল্টা, এপসিলন ইত্যাদি। যে কোন নক্ষত্রপুঞ্জের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাকে বলা হয় আল্‌ফা নক্ষত্র, পরের উজ্জ্বলটি বিটা নক্ষত্র, তার পরেরটি গামা নক্ষত্র···এই রকম। শিবি নক্ষত্রপুঞ্জের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে বলব আল্‌ফা সেফাইড (Alpha Cepheid); দ্বিতীয় উজ্জ্বলটি বিটা সেফাইড ইত্যাদি। ডেল্টা সেফাইড নক্ষত্রটি বেপমান (variable) সে কথা আগেই বলেছি. এর প্রভা নিয়মিত ভাবে হ্রাস বৃদ্ধি হয় ৫⅓ দিনে।

উত্তর ভাদ্রপদা (Andromeda)। কাশ্যপী নক্ষত্রমালার দক্ষিণে এণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ। এর পূর্বসীমায় যে নক্ষত্রটি (প্রভায় তৃতীয়, অর্থাৎ গামা এণ্ড্রোমিডা), সেটি যুগল। দূরবীনের মধ্য দিয়ে এ দুটিকে ভারি

সুন্দর দেখায়। বড় সঙ্গীটি হলদে রঙের, ছোটটি একটু সবুজ। যেন পোখরাজ ও পান্না।

এই নক্ষত্রটির একটু পশ্চিম দিয়ে একটি ছায়া পথাতীত নীহারিকা দেখতে পাওয়া যায়। এই নীহারিকাটি ৯ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে, আমাদের নক্ষত্র জগতের বাইরে এণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়ে দেখা যায় বলে একে এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা বলে। এণ্ড্রোমিডা নিহারীকার ছবি ফোটো চিত্রে দেখান হয়েছে।

ছায়াগ্নি (Cygnus)। এণ্ড্রোমিডার পশ্চিমে ছায়াগ্নি নক্ষত্রপুঞ্জ। চারিটি প্রধান নক্ষত্রের মধ্যে উজ্জ্বলতমটি প্রথম প্রভার নক্ষত্র। ছায়াগ্নি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়ে বহুদূর বিস্তৃত বাষ্পরাশী হাল্কা মেঘের মতো দেখায়, এই নীহারিকা (nebula) আমাদের নক্ষত্রজগতের অন্তর্ভুক্ত। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করেছি, আমাদের নক্ষত্ররাজ্যের আদিম গ্যাস বেশীর ভাগই জমে নক্ষত্রে পরিণত হলেও কোন কোন স্থানে না-জমা গ্যাস নীহারিকার মতো ছড়িয়ে আছে। ছায়াগ্নি নীহারিকা তারই এক উদাহরণ।

ছায়াগ্নির একটি প্রথম প্রভার নক্ষত্র আছে অভিজিৎ (vega); এর প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য স্থর্যের পঞ্চাশ গুণ।

হারকিউলিস: ছায়াগ্নি ও অভিজিতের পশ্চিমে হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জ। এর প্রধান নক্ষত্রটি যুগল ; একটির রং কমলা, অন্যটি হাল্কা সবুজ রঙের। হারকিউলিসের মধ্য দিয়ে একটি তারকাগুচ্ছ দেখতে পাওয়া যায়, এই গুচ্ছে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার নক্ষত্র আছে।

ব্রহ্মহৃদয় (Capella)। ধ্রুবতারা হ'তে হারকিউলিসের ঠিক বিপরীত দিকে একটি প্রথম প্রভার নক্ষত্র আছে, তার নাম ব্রহ্মহৃদয়। এই উজ্জ্বল তারাটি অরিগা (Auriga) নক্ষত্রপুঞ্জের প্রধান বা 'আলফা' নক্ষত্র। এইজন্য ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রের আর এক নাম আলফা অরিগা। মোটামুটি, ধ্রুবতারাকে মাঝে রেখে অভিজিৎ ও ব্রহ্মহৃদয় দুই দিকে প্রায় সমান দূরে। ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রটি যুগল। যুগলের দুইটি পীতদানব নক্ষত্র, বড়টি স্থর্যের ১৩০০ গুণ, ছোটটি ৩০০ গুণ আয়তনে। এরা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে সাড়ে তিন মাসে। পৃথিবী হ'তে দূরত্ব ৫২ আলোক বর্ষ।

দক্ষিণাকাশ

উত্তরাকাশের যতগুলি নক্ষত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জের কথা উল্লেখ করেছি, দক্ষিণাকাশের তার চেয়ে কম বলব। ভারতবর্ষ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত, এই কারণে আকাশের উত্তরাংশই সম্পূর্ণ দেখতে পাই। দক্ষিণ আকাশের উত্তরাংশই কিছুটা দেখতে পাই। দক্ষিণ আকাশের সবটা দেখতে
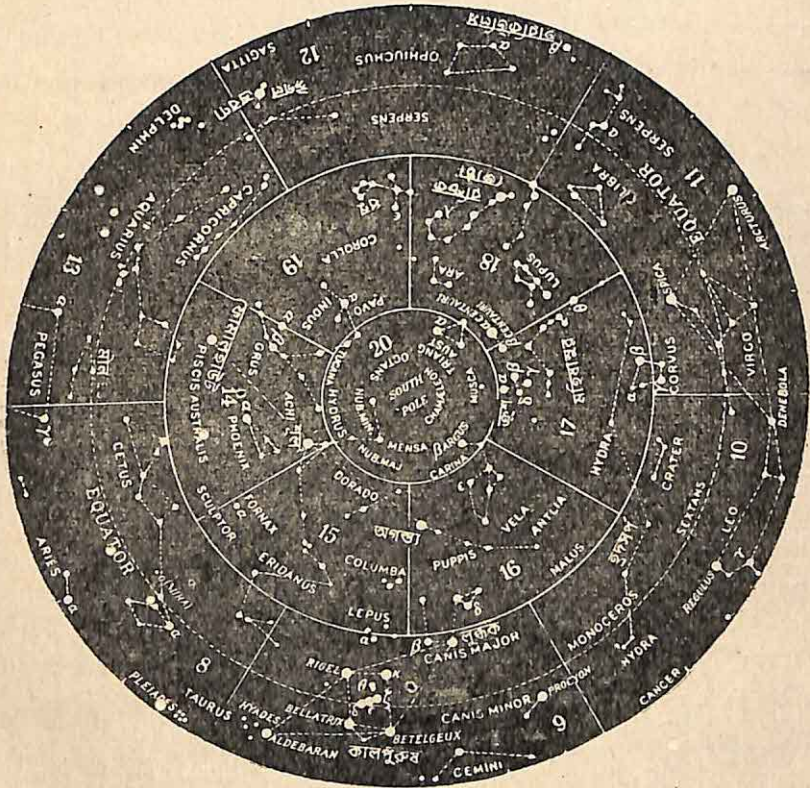
চিত্র—১৪ : দক্ষিণ আকাশ

পাই না। দক্ষিণ নভোমেরু আমরা কখনও দেখতে পাই না, ঐ অংশ সর্বদাই আমাদের দিকচক্রবালের (horizon) নীচে চির অস্তমিত থাকে। তেমনি পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধবাসীদের কাছে উত্তরাকাশের কিছু অংশ ঐভাবে

অ-দেখা থেকে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কোন কোন স্থান থেকে ধ্রুবতারা, কাশ্যপী, সপ্তর্ষিমণ্ডল ইত্যাদি কখনও দেখা যায় না।

যাই হোক ভারতবর্ষ বিষুবরেখার খুব বেশী উত্তরে নয় বলে আমরা দক্ষিণ আকাশের বেশ কিছুটা দেখতে পাই। বাংলা দেশ বিষুবরেখার মোটামুটি ২৩ ডিগ্রী উত্তরে। সে হিসাবে দক্ষিণ নভোমেরুর চারিদিকে ২৩ ডিগ্রী অবধি বাংলা দেশ থেকে দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতে গেলে দক্ষিণাকাশের আরো কিছুটা দেখা যাবে। তেমনি, দিল্লী বা কাশ্মীর থেকে দক্ষিণাকাশ অনেকটা কাটা পড়বে।

মহিষাসুর (Centaur)। এই নক্ষত্রপুঞ্জটি সৌর জগতের সবচেয়ে কাছে। এর মধ্যে তিনটি নক্ষত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য, উজ্জ্বলতম দুটি (আলফা ও বিটা মহিষাসুর) এবং প্রক্সিমা মহিষাসুর। প্রক্সিমা (proxima) অর্থে 'নিকট'। প্রক্সিমা মহিষাসুর নক্ষত্রটি আমাদের নিকটতম তারা, দূরত্ব ৪·২৭ (প্রায় সওয়া চার) আলোকবর্ষ। সৌরজগৎ ও প্রক্সিমা মহিষাসুরের মধ্যে আর কোনও তারা নেই। এই দূরত্ব মাইল হিসাবে ২৫০০০০০ কোটি মাইল। প্রক্সিমা মহিষাসুর ছোট তারা, লালচে রঙের, উজ্জ্বলতায় সূর্যের দু'হাজার ভাগের একভাগ মাত্র।

আলফা মহিষাসুর নক্ষত্রের দূরত্ব একটু বেশী, ৪·৩১ আলোকবর্ষ। এটি যুগল, দুটি সঙ্গীই সূর্যের সমান সমান, বর্ণেও সূর্যের মত পীতাভ।

আলফা ও বিটা মহিষাসুর নক্ষত্র দুটিই প্রথম প্রভার নক্ষত্র। এত কাছাকছি দুইটি প্রথম প্রভার নক্ষত্র আর কোথাও দেখা যায় না।

দক্ষিণ ক্রুশ (Crux বা Southern Cross)। আলফা ও বিটা মহিষাসুরের ঠিক পশ্চিমে এই নক্ষত্রপুঞ্জ। উজ্জ্বল চারিটি নক্ষত্র নিয়ে ক্রুশ চিহ্নের মতো মনে হয়। উজ্জ্বলতম 'আলফা'টি সবচেয়ে দক্ষিণে, দ্বিতীয়টি (বিটা) পূর্বসীমায়, তৃতীয়টি (গামা) উত্তরে, ও চতুর্থটি (ডেল্টা) পশ্চিমে। গামা হ'তে আলফার দিক দক্ষিণদিক নির্দেশক। উত্তরাকাশে যেমন ধ্রুবতারা, দক্ষিণাকাশের নভোমেরু কেন্দ্রে তেমন কোন প্রধান নক্ষত্র নেই।

অগস্ত্য, শূল ও ফোমালহাউট (Canopus, Achernar, Fomal-

haut): দক্ষিণ আকাশের এই তিনটি প্রথম প্রভার নক্ষত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনটি নক্ষত্র সরল রেখায় অবস্থিত। এদের মধ্যে ফোমালহাউট সবচেয়ে উত্তরে। ইংলণ্ড থেকে শুধু ফোমালহাউটকে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশ ইংলণ্ডের তুলনায় প্রায় ৩০° ডিগ্রী দক্ষিণে, এখান থেকে আমরা তিনটিকেই দেখতে পাই।

মধ্যাকাশ

আকাশের এই অংশটি আমাদের মাথার উপর খুব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত। এই অংশে অনেকগুলি প্রধান নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। রাশিচক্রের বারোটি নক্ষত্রপুঞ্জ ভিন্ন আরা কয়েকটির কথা বলব। রাশিচক্র সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। রাশিচক্রের ১২টি 'রাশি' বা নক্ষত্রপুঞ্জের নাম: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। রাশিচক্রের এই বারোটি নক্ষত্রপুঞ্জ মোটামুটি ৩০ ডিগ্রী ব্যবধানে মধ্যাকাশ চক্রে অবস্থিত।

কালপুরুষ (Orion)। মধ্যাকাশে কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। বসন্তকালে সন্ধ্যার সময় এবং হেমন্ত কালে মধ্য রাতে মাথার উপর দেখতে পাওয়া যায়। কালপুরুষের প্রধান চারিটি তারা একটি প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ সৃষ্টি করেছে, মধ্যে তিনটি নক্ষত্র সারিবদ্ধ ভাবে কাছাকাছি। কালপুরুষের একটু দক্ষিণ পূর্বে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধক (sirius)। লুব্ধকের সাহায্যে কালপুরুষকে সহজেই চেনা যায়।

পুরাণের গল্প অনুসারে চার কোণার চারিটি তারা হ'লো যমরাজের (কালপুরুষের) দুটি হাত, দুটি পা; মধ্যের তিনটি তাঁর কোমরবন্ধ (belt of Orion)। কোমরবন্ধ থেকে আর কয়েকটি স্বল্প-প্রভ নক্ষত্র বাঁকা রেখায় রয়েছে, যেন কোমরবন্ধ থেকে যমরাজের তরবারি ঝুলছে। কালপুরুষের উত্তর ও দক্ষিণ সীমার নক্ষত্র দুটি (আর্দ্রা ও বাণরাজ) প্রথম প্রভার নক্ষত্র। উত্তরেরটি (আর্দ্রা) লোহিত দানব নক্ষত্র, আয়তনে সূর্যের আড়াই কোটি গুণ, প্রকৃত তেজে ১২০০ গুণ। বাণরাজ নক্ষত্রটি উজ্জ্বল শ্বেত, উজ্জ্বলতায় সূর্যের ১৫০০০ গুণ।

লুব্ধক (Sirius)। কালপুরুষের নিকট লুব্ধক নক্ষত্রটি সবচেয়ে ঝক্‌ঝকে দেখায়, চিনতে একটুও কষ্ট হয় না। লুব্ধক নক্ষত্র আয়তনে সূর্যের প্রায় চারগুণ, তেজে সূর্যের ছাব্বিশ গুণ। এটি যুগল নক্ষত্র, ছোট সঙ্গীটি শ্বেতবামন নক্ষত্র।

লুব্ধক নক্ষত্রটি কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে হলেও কালপুরুষের তারা বলে একে ধরা হয় না। Canis Major বা বৃহৎ কুকুর নামক নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত এই লুব্ধক। তবে ক্যানিস মেজর নক্ষত্রপুঞ্জে লুব্ধক ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য তারা নেই।

বৃষরাশি (Taurus)। কালপুরুষের এক দিকে লুব্ধক, অন্য দিকে প্রায় তত দূরে বৃষরাশি বা বৃষ নক্ষত্রপুঞ্জ। এই নক্ষত্রপুঞ্জটি রাশিচক্রের অন্তর্গত। বৃষরাশির প্রধান নক্ষত্র রোহিণী (Aldebaran)। লুব্ধক ও আর্দ্রা সরল রেখায় যুক্ত ক'রে পশ্চিম দিকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলে মেষ রাশির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অশ্বিনী (প্রথম প্রভার নক্ষত্র) পাওয়া যাবে।

মিথুন রাশি (Gemini)। লুব্ধকের সামান্য উত্তরে মিথুন রাশি। মিথুনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রদুটি সোমতারা ও বিষ্ণুতারা (Castor and Pollux) নামে খ্যাত। বিষ্ণুতারাটি যুগল, সঙ্গীদুটি পরস্পর প্রদক্ষিণ করছে ৩০৬ বছর ধরে। পরে জোরালো দূরবীন দিয়ে দেখা গেল আরও একটি স্বল্প প্রভা নক্ষত্র ওখানে আছে। তাহ'লে বিষ্ণুতারা তিন তারার সমষ্টি, শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটিই যুগল।

প্রভাস বা প্রশ্বা (Procyon)। বিষ্ণু ও সোম তারার সামান্য দক্ষিণে প্রশ্বা বা প্রভাস নক্ষত্র। এটি খুব উজ্জ্বল, প্রথম প্রভার নক্ষত্র। লুব্ধক যেমন ক্যানিস মেজর নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত; প্রশ্বা তেমনি ক্যানিস মাইনর নক্ষত্রপুঞ্জের প্রধান নক্ষত্র। লুব্ধকের মতো প্রশ্বাসও যুগল নক্ষত্র এবং ছোট সঙ্গীটি শ্বেতবামন তারা।

সিংহরাশি (Leo)। প্রশ্বা, বিষ্ণুতারা প্রভৃতির পূর্বদিকে সিংহ রাশি। এই নক্ষত্রমালা বেশ অনেকটা বিস্তৃত। সিংহ রাশির প্রধান নক্ষত্র মঘা (Regulus) প্রথম প্রভার নক্ষত্র। মঘা থেকে আরম্ভ করে উত্তর দিকে

কয়েকটি নক্ষত্র কাস্তের মতো বাঁকা রেখায় রয়েছে, যেন সিংহের মুখ। মঘা থেকে উত্তরফাল্গুনী পর্যন্ত সিংহের দেহ বিস্তৃত।

কন্যারাশি (Virgo)। সিংহরাশির একটু দক্ষিণ-পুবে কন্যারাশি। এর প্রধান নক্ষত্র চিত্রা (Spica), প্রথম প্রভার নক্ষত্র।

হ্রদসর্প (Hydra)। প্রশ্বা ও মঘার মাঝামাঝি থেকে কতগুলি স্বল্প প্রভার তারা আঁকাবাঁকা সারিবদ্ধ ভাবে চিত্রা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এর নাম হ্রদ সর্গ।

তুলারাশি (Libra)। কন্যারাশির পূর্বে তুলারাশি। তুলা বা তুলাদণ্ড মানে দাঁড়িপাল্লা। আকাশে মেষরাশির ঠিক বিপরীত দিকে (১৮০°) তুলারাশি। তার মানে একটি যখন উদয় হচ্ছে অন্যটি তখন অস্ত যাচ্ছে।

বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)। তুলারাশির একটু পূর্ব-দক্ষিণে বৃশ্চিক রাশি। এর প্রধান নক্ষত্র জ্যেষ্ঠা (Aantares) লোহিত দানব নক্ষত্র, আয়তনে সূর্যের নয় কোটি গুণ। আর্দ্রা, রোহিণী ও জ্যেষ্ঠা এই তিনটি বিখ্যাত লোহিত দানব নক্ষত্র, এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠাই সবচেয়ে লাল ও সবচেয়ে বড়।

ধনুরাশি ও মকররাশি (Sagittrius, Capricornus)। বৃশ্চিকের পূর্বদিকে ধনু ও মকর রাশি। এদের মধ্যে একটিও প্রথম প্রভার নক্ষত্র নেই, দুটি রাশিই স্বল্পপ্রভা নক্ষত্রের সমষ্টি।

ইগল বা একুইলা (Aquila, the Eagle)। মকর রাশির সামান্য উত্তর পশ্চিমে এই নক্ষত্রপুঞ্জ। তিনটি তারা পাশাপাশি, মধ্যেরটি উজ্জ্বল, যেন ঈগল পাখী আকাশে উড়ছে। মধ্যের তারাটি ঈগলের দেহ, দু'পাশে দুটি পাখা। মধ্যের তারাটি প্রথম প্রভার নক্ষত্র, নাম শ্রবণা (Altair)। এই তিনটি তারা হটাৎ দেখলে কালপুরুষের কোমরবন্ধের সঙ্গে ভুল হ'তে পারে।

ঈগল নক্ষত্রপুঞ্জের একটি তারা ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে হটাৎ খুব উজ্জ্বল ও বিস্তৃত হয়ে উঠতে দেখা যায়। নাম দেওয়া হ'লো ঈগল নবতারা (Nova Aquila)। আবার কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হলো। নবতারা অবস্থায় এই নক্ষত্রের উপরিতলের উষ্ণতা (surface

temperature) উঠেছিল ৬৫,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ সূর্যের উপরিতলের টেম্পারেচারের এগার গুণ।

কুম্ভ ও মীনরাশি (Aquarius, Pisces)। মকরের পূবে কুম্ভ, কুম্ভের পূবে মীনরাশি। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন নক্ষত্র নেই।

সেটাস্ (cetus)। মীনরাশির একটু পুব দক্ষিণে এই নক্ষত্রপুঞ্জটি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের মধ্যে প্রথম প্রভার নক্ষত্র একটিও নেই, দুই মাত্র দ্বিতীয় প্রভার, নয়টি তৃতীয় ও চতুর্থ প্রভার, অন্যগুলি আরো ক্ষীণ।

এই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে মার নক্ষত্রটি (Mira Ceti) উল্লেখযোগ্য। মার নক্ষত্রটি বেপমান অর্থাৎ উজ্জ্বলতার নিয়মিত হ্রাস বৃদ্ধি হয় ১১ মাসে। সব চেয়ে বেশী উজ্জ্বল অবস্থায় দ্বিতীয় প্রভার নক্ষত্রে পরিণত হয়। তারপর প্রভা কমতে কমতে নবম প্রভায় নামে, তারপর আবার উজ্জ্বলতা বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় প্রভা থেকে পঞ্চম বা ষষ্ঠ পর্যন্ত খালিচোখে দেখা যায়, প্রভা তার চেয়েও যখন কমে যায় তখন দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়। এই কারণে খালিচোখে মার নক্ষত্রকে কয়েকমাস দেখা যায়, আর কয়েকমাস লুপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

মার নক্ষত্রটি যুগল। মজা এই যে, যুগলের বড়টি লোহিত দানব, ছোটটি শ্বেত বামন। মজার যুড়ি। লোহিত দানবটি আয়তনে সূর্যের তিন কোটি গুণ।

নক্ষত্র	দূরত্ব (আলোকবর্ষ)	ঔজ্জ্বল্য (সূর্য = ১)	ব্যাস (সূর্য = ১)	বিশেষত্ব
লুব্ধক (Sirius)	৮.৬	২৬	১.৫৮	দৃশ্যতঃ উজ্জ্বলতম। যুগল। ছোটটি শ্বেতবামন।
প্রশ্বা (Procyon)	১০.৫	৫.৫	১.৮	যুগল। ছোটটি শ্বেতবামন।
আলফা মহিষাসুর (Alpha Centauri)	৪.৩	১.১২ ০.৩২	১.০৭ ১.২২	যুগলের দুইটি সূর্যের মতো, রংও পীতাভ। সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র-পরিবার।
আর্দ্রা (Betelgeux)	২০০	১২০০	৩৫০	লোহিত দানব।
বাণরাজ (Rigel)	৫০০	১৫০০	৩০	বর্ণে নীলাভ।
জ্যেষ্ঠা (Antares)	৩৮০	৪০০০	৪৫০	বৃহত্তম লোহিত দানব।
রোহিণী (Aldebaran)	৫৭	৯০	৪০	যুগল। দুটিই পীত দানব।
মার (Mira ceti)			৩০০	যুগল। বড়টি লোহিত দানব ছোটটি শ্বেতবামন বেপমান। বেপনকাল ১১ মাস।
ধ্রুবতারা (Pole star)	৪৭			উত্তর দিক নির্দেশক। যুগল। বেপমান। বেপনকাল ৪ দিন।

তালিক ৬ঃ কয়েকটি প্রধান নক্ষত্র

অধ্যায়—৯

রাশিচক্র, দিন ও বৎসর গণনা

মধ্য আকাশের বারোটি নক্ষত্রপুঞ্জ পুব পশ্চিম চক্রে প্রায় সমান দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে। এই বারোটি নক্ষত্রপুঞ্জ বা রাশির নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। সম্পূর্ণ চক্রের মাপ ৩৬০ ডিগ্রী কোণ, অতএব এক একটি রাশি ৩৬০ ÷ ১২ = ৩০ ডিগ্রী কোণ জুড়ে বিস্তৃত। বারো মাসে পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রী পরিক্রম করে আসে, অতএব পৃথিবী প্রতিমাসে ৩০° করে কক্ষপথে এগোয়। এই কারণে আমাদের কাছে মনে হয় সূর্য এক এক মাসে এক এক রাশিতে প্রবেশ করে।

ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে বলি। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে সূর্যের চারিদ্বিকে, সূর্যের কাছে থেকে। নক্ষত্রগুলি ছড়িয়ে আছে সূর্য থেকে অনেক অনেক দূরে। 'কাছে' 'দূরে' কথা দুটি তুলনামুলক অর্থে ব্যবহার করেছি। পৃথিবী থেকে যে কোন সময় সূর্যের দিকে তাকালে দেখব সূর্য রয়েছে পিছনের নক্ষত্রপটের উপরে। কিন্তু দিনের বেলা আকাশে তারা দেখা যায় না সূর্যের তেজের জন্য, তবে দূরবীনের মধ্য দিয়ে দিনের আকাশেও নক্ষত্র দেখা যায়। সূর্য যদি এত উজ্জ্বল না হতো তাহ'লে খালি চোখেই দেখতে পেতাম সূর্য রয়েছে নক্ষত্র পটের কোন স্থানে। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে বলে মনে হতো সূর্য সরছে নক্ষত্র পটের উপর দিয়ে। এক মাসে পৃথিবী ৩০ ডিগ্রী ঘুরলে মনে হবে সূর্যই যেন নক্ষত্র পটের উপর ৩০ ডিগ্রী সরে গিয়েছে; ছিল মেষ রাশির উপর, পরের মাসে সূর্য সরে গিয়ে বৃষ রাশির উপর গিয়ে পড়ল। নক্ষত্রপটের উপর দিয়ে সূর্য দিনের পর দিন এই ভাবে চলতে থাকে। অবশ্য পৃথিবীর বাৎসরিক সূর্য-প্রদক্ষিণের জন্যই সূর্যের এই আপত গতি (apparent motion)। নক্ষত্রপটের উপর দিয়ে সূর্যকে যে পথে চলতে দেখা যায়

তাকে বলে রবিপথ বা ক্রান্তিবৃত্ত বা অয়ন বৃত্ত। পৃথিবী সূর্যকে বছরে একবার ঘুরে এলে সূর্যও আবার আগেকার রাশিতে ফিরে আসে।

পয়লা বৈশাখ থেকে আমাদের বছর আরম্ভ, ঐ দিন সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে। বৈশাখ মাস ধরে মেষ রাশি ভোগ ক'রে (অর্থাৎ মেষ রাশির মধ্য দিয়ে চ'লে) সূর্য বৃষ রাশিতে উপনীত হয়। এই ভাবে
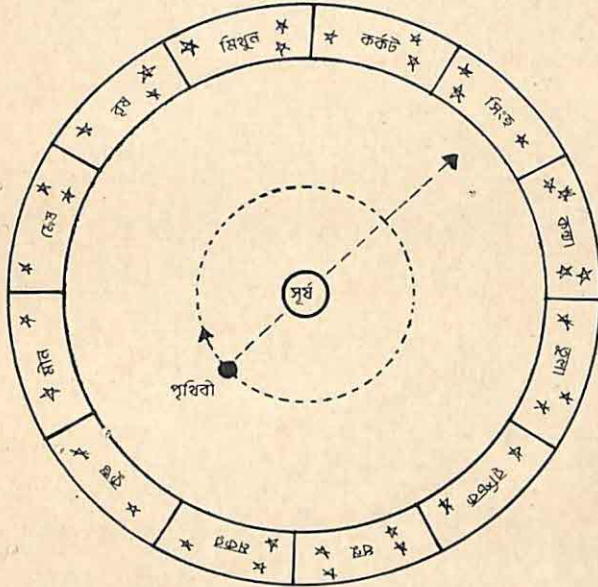
চিত্র—১৫ : রাশিচক্রের মধ্য দিয়ে সূর্যের আপাত গতি।

ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন রাশির মধ্য দিয়ে চলে পরের বছরে পয়লা বৈশাখ সূর্য আবার মেষ রাশিতে ফিরে আসে। মাসের শেষ দিনে সূর্যের এক রাশি ভোগ শেষে অন্য রাশিতে সংক্রমণ আরম্ভ হয় বলে মাসের শেষদিনকে 'সংক্রান্তি' বলে।

সূর্যের এই ভ্রমণ ৩৬৫¼ দিনে পরিপূর্ণ হয়, অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যকে ঐ সময়ে একবার প্রদক্ষিণ ক'রে আসে। এটাই হ'লো একবছর সময়। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই রাশিচক্র অনুসারে শুদ্ধভাবে বর্ষ গণনার রীতি প্রচলিত।

এবার বর্ষ গণনার সঙ্গে দিন গণনার একটু সূক্ষ্ম বিচার করা যাক। আমরা জানি একদিন বা ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার পূর্ণভাবে আবর্তিত হয়। কিন্তু 'একদিন' ও 'একবার পূর্ণ আবর্তন' কথা দুটির অর্থ খুব সরল নয়। এক সূর্যোদয় থেকে দ্বিতীয় সূর্যোদয় পর্যন্ত আমরা একদিন ধরি, এই সময়কে ২৪ ভাগ করে এক এক ঘণ্টা ধরা হয়, আমাদের ঘড়ি এই নিয়মে চলে। আমরা ভাবলাম এই সময়ে পৃথিবী ঠিক একবার আবর্তন করল। কিন্তু তা' নয়, এক সূর্যোদয় থেকে দ্বিতীয় সূর্যোদয় ঘটাতে পৃথিবীকে পূর্ণ আবর্তনের চেয়ে একটু বেশী ঘুরতে হয়েছে। কারণ, এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী তার কক্ষপথে একটু এগিয়েছে, ফলে সূর্য যেন একটু পিছিয়েছে। এজন্য দ্বিতীয় দিনে পৃথিবী পূর্ণ আবর্তনের চেয়ে একটু বেশী না ঘুরলে সূর্যোদয় হবে না। সূর্যোদয় অনুসারে ২৪ ঘণ্টার দিনকে বলে সৌর দিবস বা সাবন দিন (solar day)।

এইভাবে প্রতিদিন একটু একটু বেশী ঘুরে সারা বছরে পৃথিবীকে একবার বেশী আবর্তন করতে হয়, অর্থাৎ বছরের ৩৬৫¼ দিনে পৃথিবীকে ৩৬৬¼ বার আবর্তন করতে হয়।

নক্ষত্রের উদয় অস্ত অনুসারে দিন গুনলে এই পার্থক্যটা হ'তো না, কারণ পৃথিবী সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করছে, নক্ষত্রদের নয়। পৃথিবীর ঠিক পূর্ণ আবর্তনে নক্ষত্ররা আবার ঠিক এক যায়গায় আসে, অতিরিক্ত আবর্তনের প্রয়োজন হয় না। তাহ'লে নক্ষত্রের উদয়াস্ত অনুসারে যে 'দিন' হয় তার সময়কাল (নাক্ষত্রিক দিন বা siderial day) সৌর দিনের চেয়ে একটু ছোট। কতটুকু ছোট তা সহজেই হিসাব করা যায়, বছরে এক দিনের পার্থক্য, অর্থাৎ দিনে ৩ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড। তাহ'লে সৌর দিবস ২৪ ঘণ্টায়, নক্ষত্র দিবস ২৩ ঘণ্টা, ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। যদি কারো ঘড়ি দিনে ৩ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড দ্রুতবেগে চলে, সেই ঘড়ি অনুসারে প্রতি রাত্রে একই সময়ে নক্ষত্রগুলি আকাশের একই স্থানে দেখা যাবে। এই রকম নাক্ষত্রিক দিবস সূচক ঘড়ি (siderial clock) জ্যোতিষ মানমন্দিরে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায়—১০

ডপলারের সূত্র ও নক্ষত্রগতি নির্ণয়

আগে অনেকবার বলেছি নক্ষত্রগুলি আকাশে স্থির, বছরের পর বছর ধরে তাদের স্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায় না। এমন কি, দু'তিন হাজার বছর পূর্বে জ্যোতির্বিদরা নক্ষত্রদের অবস্থান সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়ে ছিলেন তার সঙ্গে এখনকার অবস্থানের কোনও গরমিল দেখা যায় না।

তা'হলেও বর্তমানে জানা গিয়াছে ঐ সব স্থির নক্ষত্ররাও একেবারে স্থির নয়। নক্ষত্রগুলি এত দূরে যে তাদের কোন গতিবেগ থাকলে তা ধরা খুবই কঠিন হ'বে সন্দেহ নাই।

সূর্য ২৫ দিনে একবার লাটিমের মতো ঘোরে। অন্যান্য নক্ষত্ররাও অল্প-বিস্তর আবর্তমান। এই হল একরকমের নড়াচড়া। তারপর, যুগল নক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করতে দেখা যায়, সে-ও হ'লো আর একরকমের গতি। সমগ্র ছায়াপথ নিয়ে নক্ষত্রজগৎ ঘুরছে। এই ঘূর্ণিরূপী নক্ষত্র দ্বীপের প্রত্যেকটি নক্ষত্র তাহলে চলে বেড়াচ্ছে। ঘূর্ণি-কেন্দ্রের কাছেরগুলি জোরে এবং দূরেরগুলি ধীরে চলছে, এই কারণে নীহারিকাগুলি প্যাঁচালো ঘূর্ণির মতো দেখায়। নীরেট চাকার মতো ঘুরলে কাছেরগুলি আস্তে, দূরের গুলি জোরে চল্‌তো। কিন্তু নক্ষত্ররাজ্যে নক্ষত্রগুলি কোনও নীরেট চাকার সঙ্গে গাঁথা নয়, সবাই ছাড়া ছাড়া, কিছুটা গ্যাস, কিছুটা দলা বাঁধা নক্ষত্র-পিণ্ড। এই কারণে ঘূর্ণির কেন্দ্রের কাছে যারা তাদের ঘুরতে হচ্ছে জোরে, দূরেরগুলি ঘুরছে আস্তে। এরকম দেখা যায় জলের ঘূর্ণিতে বা বাতাসের ঘূর্ণিতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলেছি আমাদের নক্ষত্ররাজ্য ঘূর্ণির মতো ঘুরছে, আর এই ঘূর্ণির টানে সূর্য ঘুরছে প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০ মাইল বেগে। সূর্য রয়েছে এই ঘূর্ণি-ছায়াপথের কেন্দ্র ও পরিধির মাঝামাঝি। যে নক্ষত্রগুলি সূর্যের তুলনায়

ঘূর্ণি-কেন্দ্রের কাছে তারা ঘুরছে জোরে, পরিধির দিকে (দূরে) যেগুলি—সেগুলি পিছিয়ে পড়ছে। কিন্তু এই নক্ষত্র জগৎ একবার পূর্ণ আবর্তিত হ'তে ২৫ কোটি বছর লাগে। কিন্তু যত জোরে বা যত আস্তেই ঘুরুক, নক্ষত্ররা ঘুরে বেড়াচ্ছে সে কথা ঠিক। নক্ষত্রের এই গতির জন্য দৃষ্টির আড়াআড়ি ভাবে এদের চলতে দেখব। কিন্তু নক্ষত্রদের দূরত্ব এত বিপুল যে শত শত বছর ধরে দেখলেও নক্ষত্রদের স্থানচ্যুতি বোঝা প্রায় অসম্ভব।

দৃষ্টি রেখার আড়াআড়ি চললে স্থানচ্যুতি তবু বোঝা সম্ভব। কিন্তু যদি কোন নক্ষত্র দৃষ্টি রেখা বরাবর এগিয়ে আসে বা পিছিয়ে যায় তা'হলে কী করে তা বুঝব ? মনে হবে একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এরকম গতিবেগ নিরূপণ করা বিজ্ঞানের কাছে অসম্ভব নয়, বরং সহজ। এটা নক্ষত্রের আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে করা যায়। এই অভিনব পদ্ধতিটি বুঝিয়ে বলছি।

একটা উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করি। স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, ট্রেন আসছে। ট্রেনটি এই স্টেশনে থামবে না, তাই সবাইকে হুঁশিয়ার করে একটানা বাঁশী বাজাতে বাজাতে স্টেশন পার হয়ে চলে গেল। সকলেই লক্ষ্য করলাম ইঞ্জিনটা আমাদের অতিক্রম করতেই বাঁশীর সুর হঠাৎ খাদে নেমে গেল। অর্থাৎ অগ্রসরশীল বাঁশীর সুর ছিল চড়া, অপসরণশীল বাঁশীর সুর লাগল নীচু বা মোটা বা গম্ভীরতর। ইঞ্জিনের ড্রাইভার বাঁশীর সুর বদলায়নি। প্ল্যাট-ফর্মের উপর যে যেখানেই থাক প্রত্যেকের কানেই মনে হল আমার সামনে দিয়ে পার হয়ে যেতেই বাঁশীর সুর খাদে নেমে গেল। রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ি হর্ন বাজাতে বাজাতে যখন আমাদের অতিক্রম করে যায় তখনও হর্ণের সুর হঠাৎ খাদে নেমে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছি শব্দের সুর নির্ভর করে শব্দ তরঙ্গের কম্পন হারের উপর। যত দ্রুত হারে শব্দতরঙ্গ আসে সুর ততই চড়া বা সরু হয়, যদি স্বল্প হারে আসে তা'হলে সুর মোটা বা খাদে হয়। ইঞ্জিন যদি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে বাঁশী বাজায় তাহ'লে একরকম সুর শুনব ; কিন্তু যদি এগিয়ে আসতে আসতে বাঁশী বাজায় তাহ'লে প্রতি সেকেণ্ডে শব্দতরঙ্গের কম্পন বেশী আসবে, সুরও চড়া মনে হবে। তেমনি বাঁশি যখন ইঞ্জিনের সঙ্গে ছুটে চলে যাচ্ছে

দূরে, তখন প্রতি সেকেণ্ডে শব্দতরঙ্গ কম এসে পৌঁছাচ্ছে, সুরও তাই মোটা লাগছে।

তা'হলে দেখা গেল ট্রেনের গতি বেগের সঙ্গে ট্রেনের বাঁশীর সুরের একটা সম্পর্ক আছে, এবং বাঁশীর সুরের তারতম্য থেকে ট্রেনের গতিবেগ নির্ণয় করা যেতে পারে।

আলোর বেলাতেও এই ধরনের যুক্তি খাটবে, কারণ আলোও এক প্রকার তরঙ্গ। আলোর রং নির্ভর করে আলোক তরঙ্গের কম্পন হারের ওপর। আলোর এই কম্পনহার বর্ণালীমাণ যন্ত্র দিয়ে মাপা যায়, একথা তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছি।

নক্ষত্র থেকে আলো আসছে। সে আলো বর্ণালী মাণ-যন্ত্রে বিশ্লেষণ করলে রঙের স্তর দেখা যায়, এই রঙের স্তরকে বলে বর্ণালী বা বর্ণছত্র। বর্ণালীর একদিকে লাল অন্যদিকে বেগুনী রং মধ্যে (রামধনুর মতো) অন্যান্য রং। বর্ণালীর রঙীন আলোর মধ্যে অধিকাংশই রঙীন রেখাভাবে একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত একে একে দাঁড়িয়ে থাকে। এক একটি রঙীন রেখা বা বর্ণালী রেখা (spectral line) এক এক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা আলোর কম্পনহার সূচক। এইভাবে আলোর কম্পনহার নিখুঁত ভাবে মাপা যায়। কোন রঙের আলো বা বর্ণালীরেখা কোন্ দ্রব্য (ক্যালসীয়াম, সোডিয়াম, লৌহ ইত্যাদি) জ্বলে উৎপন্ন হয়েছে তাও জানা আছে, এবং ঐ সব আলোর কম্পনহারও জানা আছে।

ইঞ্জিনের বাঁশীর উদাহরণ অনুসারে বোঝা যাবে যে, কোন একটি নক্ষত্র যদি আমাদের কাছ থেকে খুব জোরে পিছিয়ে যায় তাহ'লে তার স্বাভাবিক আলোর তরঙ্গের কম্পন হারে ঘাটতি পড়বে। কারণ আলোর প্রথম কম্পন বা তরঙ্গ যেখান থেকে রওনা হ'লে, দ্বিতীয়টি তার চেয়ে দূর থেকে রওনা হবে, তৃতীয়টি আরও একটু দূরে থেকে, ইত্যাদি, কারণ নক্ষত্রটি পিছিয়ে যাচ্ছে। তা'হলে পশ্চাৎগামী আলোর (বা নক্ষত্রের) রং স্বাভাবিক থাকছে না! কম্পনহার কমলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ে। বর্ণালীতে এটা লাল সীমার দিক। এই কারণে পশ্চাৎগামী নক্ষত্রদের বর্ণালী রেখাগুলি তাদের স্বাভাবিক স্থান ছেড়ে লাল সীমার দিকে একটু একটু করে সরে দাঁড়ায়।

কতটুকু লালের দিকে সরেছে তা মাপলেই জানা যায় নক্ষত্রটি কত বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে।

তেমনি কোনও আলো যদি খুব জোরে এগিয়ে আসে তাহ'লে কম্পনহার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী মনে হবে বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছোট বলে মনে হবে। সে ক্ষেত্রে বর্ণালী রেখাগুলি স্বাভাবিক স্থান ছেড়ে বেগুনী সীমার দিকে একটু একটু সরে দাঁড়াবে। কতটুকু বেগুনীর দিকে সরেছে তা মাপলেই জানা যাবে কত জোরে আলোটি (বা নক্ষত্রটি) এগিয়ে আসছে।

এই সূত্রটির নাম ডপ্‌লারের সূত্র (Doppler's principle)। নক্ষত্র জগতের গতিবিধি জানবার এটি একটি চমৎকার কৌশল।

একটা মোটা কাল্পনিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করি। একটা হলুদ রঙের বল যদি প্রতি সেকেণ্ডে আঠারো-উনিশ হাজার মাইল বেগে ছুঁড়ে ফেলা যায় তাহ'লে তার রং লাল দেখাবে। প্রতি সেকেণ্ডে আটদশ হাজার মাইল বেগে ছুঁড়তে পারলে হলুদে রঙের বলটি একেবারে লাল না দেখালেও কমলা রঙের দেখাবে। আলোর গতিবেগ এত বেশী (প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল) যে, ডপ্‌লারের নিয়ম অনুসারে বলের রং বদলাতে হ'লে ঐরকম একটা প্রচণ্ড গতিবেগের প্রয়োজন হয়। কামানের গোলাও এত জোরে যায় না। তাই বলছি, এটি একটি কাল্পনিক উদাহরণ। অনেক নক্ষত্র ও নীহারিকাদের বর্ণালীতে লোহিতাপশরণ বা লোহিত বিচ্যুতি (red shift of spectrum) দেখা যায়, অর্থাৎ বর্ণালীর রংগুলি স্বাভাবিক অবস্থান থেকে লালের দিকে একটু সরে দাঁড়াতে দেখা যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে ওরা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই রঙের তারতম্য (লোহিতাপশরণ) চোখে দেখে বোঝা যায় না, সূক্ষ্ম বর্ণালীমান যন্ত্রে মাপা যায়।

কোন নক্ষত্র যদি এগিয়ে আসে তাহ'লে তার বর্ণালীতে হবে বেগুনী বিচ্যুতি (violet shift), অর্থাৎ বর্ণালীর রংগুলি বেগুনী সীমার দিকে একটু সরে দাঁড়াবে। এমন উদাহরণও আছে।

কোন কোন যুগল নক্ষত্র আমাদের থেকে এত দূরে এবং তাদের সঙ্গীদুটি এত কাছাকাছি যে শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও তাদের আলাদা করে দেখা

যায় না। বিঞ্জু তারার তিনটি নক্ষত্রই এইরকম যুগল কিন্তু এদের বর্ণালীতে এক মজার ব্যাপার দেখা যায়। কিছুকাল ধরে এদের বর্ণালী রেখাগুলি একবার লালের দিকে আর কিছুকাল ধরে বেগুনীর দিকে ধীরে ধীরে গতায়াত করে। এ থেকে বোঝা যায় সেখানে যুগল নক্ষত্র ঘুরছে। যখন যুগলের উজ্জ্বল সঙ্গীটি ঘুরে পিছিয়ে যাচ্ছে তখন বর্ণালী রেখার লোহিতাপশরণ হচ্ছে, আর যখন ঘুরে এগিয়ে আসছে তখন হচ্ছে বেগুনী বিচ্যুতি। বর্ণালীর এই দোলন থেকে সুদূর যুগল নক্ষত্রের অস্তিত্ব ও ঘূর্ণনকাল জানা গেল, দূরবীন দিয়ে 'যুগল' বলে বোঝা না গেলেও এই জাতীয় যুগল নক্ষত্রকে বর্ণালীন বা বর্ণছত্রীয় যুগল (spectroscopic binary) বলে।

ডপ্‌লারের সূত্রের আর দু-একটি প্রয়োগের কথা বলি। সূর্য ঘুরছে লাটিমের মতো ঘুরছে, তার মেরুদণ্ডের ওপর। সৌর ২৫ দিনে একবার। কলঙ্কের গতি থেকে বোঝা যায়। এ কথা আগে আলোচনা করেছি। সৌর কলঙ্ক সূর্যের উপরিতল ঘুরে পিছনে চলে যায়, আবার অন্য ধার দিয়ে ঘুরে আসে। সূর্যের কটিদেশ বা বিষুব দেশ দিয়ে ঘুরে আসা মানে ২৭ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করা। সূর্যের উপরিতল প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। যে অংশ ঘুরে এগিয়ে আসছে সূর্যের সেই অংশের বর্ণালীতে বেগুনী বিচ্যুতি দেখা যায়। তেমনি যে অংশ ঘুরে পিছিয়ে যাচ্ছে তার বর্ণালীতে লোহিতাপশরণ হয়। এ থেকেও বোঝা যায় যে সূর্য স্থির নয়, লাটিমের মতো ঘুরছে।

নক্ষত্রকে দূরবীনের মধ্য দিয়েও আলোর বিন্দুর মতোই দেখায়, সূর্যের মত চাকতি দেখায় না। বর্ণালীমান যন্ত্রে নক্ষত্রের আলো এসে পড়ে গোটা তারাটা থেকে, নক্ষত্র বিন্দুকে ডাইনে বাঁয়ে অর্ধেক করে ভাগ করা যায় না। অথচ নক্ষত্রগুলি সূর্যের মতো, কোন কোনটি সূর্যের চেয়ে অনেক বড়। তারাও লাটিমের মতো ঘুরছে। নক্ষত্রের যে অংশ ঘুরে এগিয়ে আসছে সেই অর্ধেকের বর্ণালীতে বেগুনী বিচ্যুতি হবে, অন্য অর্ধেক ঘুরে পিছিয়ে যাচ্ছে বলে সেই অর্ধেকের বর্ণালীতে হবে লোহিতাপশরণ। কিন্তু নক্ষত্র দেহের অর্ধেক অর্ধেক নিয়ে বর্ণালী বিচার করা সম্ভব নয়, যেটা নিকটের সূর্যের করা সম্ভব। এই কারণে নক্ষত্রের বর্ণালীতে বেগুনী বিচ্যুতি ও লোহিতাপশরণ

একই সময়ে দেখা যাবে। তার মানে, বর্ণালী রেখাগুলি একটু লালের দিকেও সরবে, বেগুনীর দিকেও সরবে, ফলে রেখাগুলি একটু চওড়া বা ধ্যাব্ড়া হবে। এই থেকে বোঝা যায় নক্ষত্ররাও লাটিমের মতো ঘুরছে।

আমাদের নক্ষত্ররাজ্যের বাইরে আরো নক্ষত্ররাজ্য আছে। তাদের বলে ছায়াপথাতীত নীহারিকা (extragalactic nebulae)। এই সব সুদূর নীহারিকাদের আলোক বিশ্লেষণ করলে তাদের বর্ণালীতে যথেষ্ট পরিমাণে লোহিতাপশরণ লক্ষ্য করা যায়। ডপ্লারের সূত্র দিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় ওরা প্রচণ্ড বেগে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব।

অধ্যায়—১১

বিস্তারশীল পরিমিত ব্রহ্মাণ্ড

জড়জগতের নানা প্রকারের বস্তু খণ্ডের কথা আলোচনা করেছি, এক এক জাতীয় বস্তু নিয়ে সমষ্টিগত ভাবেও তাদের দলবদ্ধ করে দেখতে চেষ্টা করেছি। পৃথিবী, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি পৃথকভাবে দেখেছি আবার তাদের সবাইকে নিয়ে সৌর-জগতের একটা একীভূত সত্তার ধারণা জন্মেছে। সৌরজগৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটি ছোট অংশ। সূর্য একটি নক্ষত্র বিশেষ, অনেক নক্ষত্র যুগল বা বহু সঙ্গীবিশিষ্ট। সমগ্র নক্ষত্র নিয়ে আমাদের নক্ষত্ররাজ্য বা ছায়াপথ রাজ্য (galactic system)। এই নক্ষত্ররাজ্যও ব্রহ্মাণ্ডের একটি অংশ; দেখা গেল আমাদের নক্ষত্ররাজ্যের মতো আরো অনেক নক্ষত্ররাজ্য পৃথক পৃথক ভাবে মহাকাশে ছড়িয়ে আছে। মহাকাশ যেন মহা সমুদ্র ; নক্ষত্ররাজ্যগুলি যেন এক একটি দ্বীপ। এই জন্য নক্ষত্ররাজ্যগুলিকে নক্ষত্রদ্বীপ বলা হয়ে থাকে।

নক্ষত্ররাজ্য বা নক্ষত্রময় নীহারিকাগুলিই সবচেয়ে বড় বস্তুপিণ্ড বা জড় সমাবেশের পরিচয়। এক একটির বিস্তৃতি প্রায় লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাপী। এদের মধ্যে গড়পড়তা ব্যবধান ১৫ লক্ষ আলোকবর্ষ। এরকমের প্রায় ২০ লক্ষ নক্ষত্র জগৎ দেখা গিয়েছে।

এই সব নক্ষত্রদ্বীপগুলি কি মহাকাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? না। এরা সবাই সবার কাজ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। নক্ষত্রদ্বীপ নিয়ে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড গঠিত। অতএব বুঝতে হবে ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকরা উপমাস্বরূপ বলেন, রবারের বেলুনের গায়ে অনেকগুলি কালির ফোঁটা এঁকে ফোলালে যেমন প্রত্যেকটি বিন্দুর দূরত্ব পরস্পর থেকে বাড়তে থাকে, ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিস্তৃতির ফলে নীহারিকাদের ব্যবধানও তেমনি বেড়ে চলেছে। আরো একটি উপমা আছে: বোমা ফাটলে খণ্ডগুলি

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, খণ্ডগুলির ব্যবধান মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়তে থাকে, বোমা খণ্ডের ঝাঁকটিও আয়তনে বাড়তে থাকে।

নীহারিকাদের অপসরণ বেগের (speed of recession) একটি অত্যন্ত সরল নিয়ম দেখা যায়ঃ যে নীহারিকা যতদূরে তার অপসরণ বেগও সেই অনুপাতে বেশী। নীচের তালিকা থেকেই তা বোঝা যাবে।

নীহারিকার নাম বা পরিচয় সংখ্যা	দূরত্ব আলোকবর্ষ	অপসরণ বেগ
N. G. C. 385	২৯০ লক্ষ	সেকেণ্ডে ৩০৪৩ মাইল
N. G. C. 4884	৩৯৬ „	„ ৪১৬১ „
সিংহ রাশিস্থ নীহারিকা	১১৬৫ „	„ ১২২০০ „
মিথুন রাশিস্থ নীহারিকা	১৫০০ „	„ ১৫৭০০ „

এই তালিকা থেকে দেখা যায় প্রতি এক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্ব পিছু অপসরণ বেগের হার প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১০½ মাইল করে। যে কোন নীহারিকার দূরত্ব জানা থাকলে এই সূত্রের সাহায্যে তার অপসরণ বেগ হিসেব করে বলে দেওয়া যায়। যেমন, কোন নীহারিকা যদি ২০০০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে থাকে, তাহ'লে তার অপসরণ বেগ হবে প্রতি সেকেণ্ডে ২০০০ × ১০½ মাইল, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ২১০০০ মাইল।

ব্রহ্মাণ্ডের ক্রম বিস্তারশীলতার চাক্ষুস প্রমাণ নীহারিকা বর্ণালীর লোহিতাপশরণ (ডপ্‌লারের সূত্র, অধ্যায় ১০)। সব নীহারিকাদেরই দূরে সরে যেতে দেখা যায়, শুধু চার পাঁচটি ছাড়া। এই গুটিকয়েক নীহারিকা আছে আমাদের নক্ষত্র রাজ্যের কাছে, ফলে তাদের অপসরণ বেগও অল্প। এদিকে সূর্যের সঙ্গে আমরা চলেছি প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০ মাইল বেগে, আমাদের নক্ষত্ররাজ্যের আবর্তনের জন্য। কোন নীহারিকা যদি প্রতি সেকেণ্ডে ১০০ মাইল বেগে পিছিয়ে যায় আর আমরা যদি প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০ মাইল বেগে এগুতে থাকি তাহ'লে মনে হবে নীহারিকাটি প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ মাইল বেগে এগিয়ে আসছে; অথচ আসলে নীহারিকাটি আমাদের ছায়াপথ রাজ্য থেকে দূরেই সরে যাচ্ছে। এই ভাবে বিচার করলে দেখা

যায় সব নীহারিকাই প্রকৃতপক্ষে পিছিয়ে যাচ্ছে, কোনটি কোনটির কাছে এগিয়ে আসছে না।

নীহারিকা যত দূরে তার অপসরণ বেগও তত বেশী। আরও জানা গেল, প্রতি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্ব পিছু সেকেণ্ডে ১০২ মাইল অপসরণ গতিবেগ। তা'হলে অনেক কিছু ভাববার আছে।

নীহারিকা বা নক্ষত্রদ্বীপগুলি যেন চতুর্দিকে ছিট্‌কে পড়ছে। এদের নিয়েই ব্রহ্মাণ্ড, অতএব ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ আয়তনে বাড়ছে বা বিস্তৃত হচ্ছে। এই ব্যাপারটিকে ফাটা বোমার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিস্ফোরণের ফলে খণ্ডগুলি চতুর্দিকে ছিট্‌কে যায়। মুহূর্তে মুহূর্তে টুকরোগুলির ঝাঁক ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যেমন নীহারিকাদের ঝাঁক চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে বেড়ে চলেছে। তেমনি প্রত্যেক খণ্ড থেকে প্রত্যেকটির দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলেছে। আরও একটি সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে। ফাটা বোমার সব টুকরো-গুলিই সমান বেগে ধায় না, কোনটি জোরে কোনটি আস্তে। তার ফলে টুক্‌রাগুলি কোনটি দূরে কোনটি কাছে। যেগুলি দূরে সেগুলির গতি বেগও বেশী, কারণ গতিবেগ বেশী বলেই এগিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ যে টুকরো যত দূরে তার গতি বেগও সেই অনুপাতে বেশী। নীহারিকাদের বেলাও ঐরকম নিয়ম দেখেছি।

আগেই বলেছি নীহারিকা যত দূরে তার অপসরণ গতিবেগও তত বেশী। তাহ'লে দূরত্বের কি সীমা নেই, গতিবেগেরও কি সীমা নেই? প্রতি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্ব পিছু সেকেণ্ডে ১০২ মাইল অপসরণ বেগ ধরলে দেখা যায় যে নীহারিকা ১৭৭ কোটি আলোকবর্ষ দূরে তার অপসরণ বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬০০০ মাইল, অর্থাৎ আলোর গতিবেগের সমান হবে। এর চেয়েও দূরে যদি কোন নীহারিকা থাকে তাহ'লে তার অপসরণ গতিবেগ হতে হবে আলোর গতিবেগের চেয়েও বেশী। কিন্তু আইনস্টাইন প্রমাণ করেছেন, কোন বস্তু আলোর সমান বা অধিকতর বেগে চলতে পারে না, কারণ এই গতিবেগে কোন জড় বস্তুর অস্তিত্ব থাকাই সম্ভব নয়।

তাহ'লে ১৭৭ কোটি বা মোটামুটি ২০০ কোটি আলোকবর্ষই নীহারিকাদের দূরতম দূরত্ব। অর্থাৎ জড় ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান দূরতম পরিমাপ এখান থেকে

সব দিকে দুশো কোটি আলোকবর্ষ, অথবা বলা যায়, ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস (diameter) চারশো কোটি আলোকবর্ষ।

তবে কি ব্রহ্মাণ্ড অসীম নয়, সসীম? কথার সূক্ষ্ম অর্থ না ধরলে বলা যায় ব্রহ্মাণ্ড সসীম, ২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে এর সীমা। সূক্ষ্ম বিচারে একথায় একটু ভুল হবে। কারণ সসীম বললে একটা সীমা বা বাধা বা প্রান্তের ধারণা মনে আসে। কিন্তু বিশ্বের কোন গণ্ডী নেই, কোনও সীমারেখা নেই, কেউ ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে চলে যেতে পারে না।

এই কারণে বলা উচিত ব্রহ্মাণ্ড পরিমিত (finite) অথচ অসীম (boundless)। পরিমিত হয়েও অসীম হ'তে বাধা নেই, কথা দুটি ঠিক বিপরীতার্থক নয়। পরিমিত মাণে যার পরিমাণ আছে, পরিমাপ আছে। পরিমিত হলেই সীমাবদ্ধ হয় না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: এক ইঞ্চি ব্যাসের একটি বৃত্ত আঁকলাম। এই বৃত্তরেখার পরিমাপ ৩ৡ ইঞ্চি অর্থাৎ পরিমিত। কিন্তু এই বৃত্ত রেখার আরম্ভ বা শেষ (সীমা) কোথায়? সীমা নেই। একটা পিঁপড়ে যদি "এই রেখাটির পরিমাপ মাত্র ৩ৡ ইঞ্চি, আমি আধমিনিটে এর সীমা ছাড়িয়ে যাবো" বলে বৃত্তরেখার ওপর দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে তাহ'লে কোন দিনই সে বৃত্ত রেখার সীমা খুঁজে পাবে না। সে বারবার ঘুরে আসবে। তেমনি, ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ২০ কোটি বর্গমাইল অর্থাৎ পরিমিত। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে ভূপৃষ্ঠের উপর ঘুরে বেড়ালেও কেউ ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারবে না। সে বারবার ঘুরে আসবে।

পরিমিত অথচ সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের বেলাতেও ঐ রকম যুক্তি খাটে। কেউ ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। মানুষের তো বেশী দূর যাবার ক্ষমতাই নেই, রকেটেরও না, মানুষের তৈরী কৃত্রিম চাঁদের পাল্লাই বা কতটুকু। কিন্তু যদি আলোর কথা ধরি? সূর্য থেকে, নক্ষত্র থেকে, এমন কি ঘরের বাতি থেকে আলো ছুটে চলেছে সব দিকে আকাশের মধ্য দিয়ে। সব আলোই ছুটছে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে। এই আলো কোথায় যায়? ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে চলে যেতে পারে না কি? পারে না। আলোক রশ্মিকে চিরকাল এই পরিমিত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকতে হয়, বারবার তাকে এর মধ্যে ঘুরে ঘুরে চলতে হয়।

এই যুক্তিতে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন কোন নীহারিকার ঠিক বিপরীত দিকেও তাকে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ কিছু আলো নীহারিকা থেকে সরাসরি আমাদের দিকে আসছে, সেদিকে আমরা তাকে সরাসরি দেখতে পাবো। আবার কিছু আলো ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসছে ঠিক বিপরীত দিক থেকে, অতএব বিপরীত দিকে তাকালেও (বা দূরবীন লক্ষ্য করলে) ঐ নীহারিকাটি দেখতে পাবো। অবশ্য ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসা আলো হ'য়ে পড়বে অত্যন্ত ক্ষীণ, এজন্য খুব শক্তিশালী দূরবীনের প্রয়োজন হবে।

মজার কথা এই যে, দুটি নিকটতম নীহারিকার ঠিক উল্টোদিকে দুটি অস্পষ্ট নীহারিকা দেখতে পাওয়া যায়। এদের সরাসরি ভাবে স্পষ্ট দেখা যায় এণ্ড্রোমিডা ও ট্র্যাঙ্গুলাম নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়ে। ঠিক উল্টো দিকে অর্থাৎ দূরবীনকে ১৮০ ডিগ্রী কোণে ঘোরালে খুব অস্পষ্ট আবছা নীহারিকা দেখা যায়। অনেকে বলছেন ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসা আলো দিয়ে ওদেরই আবার বিপরীত দিকে দেখা যাচ্ছে। এ যদি সত্যি হয় তাহ'লে এর চেয়ে অদ্ভুত আবিষ্কার আর কী হ'তে পারে? কিন্তু বর্তমানের দূরবীনের শক্তির কথা বিচার করলে একটু সন্দেহ হয়ঃ এই ১০০ বা ২০০ ইঞ্চি দূরবীন দিয়ে কি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসা ক্ষীণ আলো দেখা সম্ভব? হয়তো ঐ দিকে সত্যিই অন্য আর দুটো নীহারিকা আছে, তাদেরই দেখছি।

ব্রহ্মাণ্ড পরিমিত হ'লে তার জড়মানও (mass) পরিমিত। জড়মান পরিমিত হ'লে তার মধ্যে আদি কণা ইলেকট্রন, প্রোটনের সংখ্যাও পরিমিত।

বিজ্ঞানের গণনা অনুসারে বিস্তারশীল পরিমিত ব্রহ্মাণ্ডের হিসাব এই রকমঃ

(১) সৃষ্টির সুরুতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ (radius) ছিল $১'০৬৮ \times ১০^{৯}$ আলোকবর্ষ।

(২) বর্তমানে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ ২×১০^{৯} আলোকবর্ষ।

(৩) বর্তমানে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জড়মান (mass) $১'০৮ \times ১০^{২২}$ সূর্য বা $৫'৭৩ \times ১০^{৫০}$ মন।

(৪) নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ইলেকট্রন সংখ্যা $১'২৯ \times ১০^{৭৯}$।

(৫) " " প্রোটনের " ঐ

অধ্যায়—১২

ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমপরিণতি

এ পর্যন্ত সৌরজগৎ, নক্ষত্র, নিহারীকা, ছায়াপথ ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের খণ্ড উপাদানগুলির আলোচনা করেছি। জ্যোতিক প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে একবার সমগ্র বিশ্বের গঠনের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নেব।

স্থান, কাল, জড় ও শক্তি নিয়ে এই বিপুলব্রহ্মাণ্ড গঠিত। এর বিশালতা কল্পনার অতীত, ধারণার অতীত। এই বিশালতা আমরা কখনও ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না, কল্পনার খেই হারিয়ে যায়। তবু বিজ্ঞানের দেওয়া মাপকাঠিতে কতগুলি সংখ্যা ধরে ধরে কোন রকমে এই বিরাটত্বের ছবি আয়ত্ব করবার চেষ্টা করি। "অমুক নক্ষত্রটি আমাদের কাছ থেকে ৪৭ আলোকবর্ষ দূরে" বলে আমরা ভাবলাম বেশ বুঝলাম। কিন্তু এই বিশাল দূরত্ব সম্বন্ধে কোন একটা স্পষ্ট ধারণা কি আমাদের মনে জাগে? "নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ওজন ৫.৭৩×১০^{৫০} মণ"। কত সহজে, কত সংক্ষেপে ব্যক্ত করলাম। কিন্তু মনে এই বিশালতার কি ছাপ পড়ল? বিশালতা কি ভাবে অনুভব করলাম?

মানুষের সাধারণ অনুভূতি ও বিজ্ঞানের ধারণা পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে। দুটির সংযোগে আমাদের বোধশক্তি নতুন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের বিরাট কালের তুলনায় মানুষের জীবন কাল যেন চোখের পলক মাত্র। হাজার হাজার বংশ ধরে মানুষ যত পরিবর্তনই দেখুক না কেন, ব্রহ্মাণ্ডের মাপকাঠিতে এই সব পরিবর্তন অতি তুচ্ছ। তবু এরই মধ্য থেকে মানুষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ও ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনা করতে চেষ্টা করেছে, কিছুটা সফলও হয়েছে।

ছায়াপথাতীত নীহারিকাগুলির দূরত্ব লক্ষ, কোটি আলোকবর্ষ। অর্থাৎ বর্তমানে যে আলোর সাহায্যে আমরা তাদের দেখছি বা ফোটোগ্রাফ নিচ্ছি, সেই আলোক নীহারিকা হতে রওনা হয়েছে লক্ষ, কোটি বছর আগে। তাই নীহারিকাগুলি শুধু দূরত্বেরই পরিচয় নয়, সুদূর অতীতেরও সাক্ষ্য।

বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে যে দূরতম নীহারিকা মিথুন রাশির মধ্য দিয়ে দেখতে পাই তার দূরত্ব ১৫ কোটি আলোকবর্ষ। অতএব আমরা আজ ১৫ কোটি বছরের প্রাচীন বস্তু দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করবার ঃ এই সব সুদূর নীহারিকাদের সঙ্গে কাছেরগুলির বা আমাদের নক্ষত্ররাজ্যের মিল দেখা যায়। অথচ এদের যে চেহারা আজ দেখছি সেটা তাদের আজকের চেহারা নয়, কারো কয়েক লক্ষ বছর আগেকার কারো বা কয়েক কোটি বছর আগেকার চেহারা। কিন্তু দেখছি একই রকমের সকলকে দেখতে, নতুন বা পুরোনো চেহারা বলে কোনরকম পার্থক্য বোঝা যায় না। কারণ বিশ্বের স্থিতিকালের তুলনায় কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি বছরের ব্যবধান সামান্যই। বৈজ্ঞানিকরা বলেন এই নক্ষত্রময় বিশ্বজগতের বয়স সম্ভবতঃ পাঁচ থেকে দশ লক্ষ কোটি বছর।

নক্ষত্রময় নীহারিকা সৃষ্টি হবার আগেও ঐ সব জড় উপাদান ছিল একাকার হয়ে মিশে। কতদিন সে ভাবে জড় উপাদান আকারহীন গ্যাসের মতো ছিল সে কথা বলা আরো কঠিন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বলেন জড়ের এই সত্ত্বাও অনাদি অনন্তকাল ধরে ছিল না, বিশ্বের গঠন পদার্থ (matter) সৃষ্টি হয়েছে কোন এক সময়, সম্ভবতঃ দুশো লক্ষ কোটি বছর হয়। জড় পদার্থের যদি সুরু বা জন্ম হয়ে থাকে, তা হ'লে তা কিসের থেকে হলো? জড়ের আগে কি ছিল? ছিল শক্তি (energy বা radiation), এই শক্তি দানা বেঁধে জড়কণা সৃষ্টি হয়েছে। জড় ও শক্তির মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, একটি অন্যটিতে রূপান্তরিত হ'তে পারে। সে কথা অধ্যায় ১৯-এ আলোচনা করব।

এই হ'লো সৃষ্টির আংশিক স্থিতির মোটামুটি হিসাব। ভবিষ্যতের দিকে আরো কত কোটি বছর পড়ে আছে। এইবার ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ পরিণতি অর্থাৎ অবসান, নির্বাণ বা প্রলয়ের দিকে কল্পনাকে ফেরানো যাক। বৈজ্ঞানিকেরা এদিকটাও ভেবেছেন। প্রাচীন ঋষিগণ খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয়ের কথা বলেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও বলেছেন সুদূর ভবিষ্যতে একপ্রকার প্রলয়ই হবে, মহাপ্রলয়ও সম্ভব, খণ্ডপ্রলয়ও সম্ভব।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই, জগতের নানা জাতীয় শক্তির শেষ

পরিণতি তাপে। কয়লা, তেল, খাদ্য প্রভৃতিতে নিহিত রাসায়নিক শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, সূর্যের শক্তি, নক্ষত্রের শক্তি, জলপ্রপাতের শক্তি, দেহের শক্তি—সবেরই চরম পরিণতি তাপ শক্তিতে। এই কারণে নানা জাতির শক্তির রূপান্তরে বিশ্বে তাপশক্তির অনুপাত ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। শক্তি অবিনশ্বর, রূপান্তর হয় মাত্র। সেদিক থেকে বিচার করলে বিশ্বের সমস্ত শক্তির পরিমাণ সমান থাকবে। কিন্তু সব শক্তি যদি তাপে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ সব উত্তাপ (temperature) যদি সমান হয়ে পড়ে তাহ'লে এত বিপুল তাপ-শক্তিও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, শক্তির কার্যকারিতা বিনষ্ট হবে। এ অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ড হবে বদ্ধ জলাশয়ের মতো নিশ্চল, জীবজন্তু বা উদ্ভিদ থাকবে না, কোথাও কিছু নড়বে না, চলবে না। এই চিত্র ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয়ের চিত্র, দিগন্ত বিস্তৃত তাপমরুর চিত্র।

খণ্ডপ্রলয়ের চিত্রও কল্পনা করা যায়। সূর্য ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে, ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ বছর পরে নিভে যাবে। অথবা নবতারার (nova) মতো জ্বলেও উঠতে পারে, তাহ'লেও সৌরজগতে খণ্ডপ্রলয় হবে।

অধ্যায়—১৩

অণু পরমাণু

বিশাল জগৎ থেকে এবার সূক্ষ্ম জগতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। কোটি কোটি মাইল দূরস্থ লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত নক্ষত্রজগৎগুলি যেমন বিস্ময়কর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণু ইলেকট্রনের কথা তার চেয়েও চমকপ্রদ। জ্যোতিষ্করাজ্য যেমন কল্পনাতীত বিরাট, পরমাণুজগৎ তেমনি কল্পনাতীত সূক্ষ্ম। লক্ষাধিক আলোকবর্ষ দূরস্থ নীহারিকাদের যদিও দূরবীনের সাহায্যে দৃষ্টিপথে আনা যায়, পরমাণু বা ইলেকট্রনকে কোন মতেই দেখা যায় না। বর্তমানে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধনশক্তি (magnifying power) বিশ হাজার থেকে এক লক্ষ পর্যন্ত। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ এত প্রচণ্ড বিবর্ধনশক্তি দিতে পারে। এ দিয়ে শুধু রোগের বীজাণু দেখা যায় তা নয়, বীজাণুর শরীরের প্রত্যেকটি গঠনও স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু পরমাণুর গঠন বৈচিত্র্য দেখা অসম্ভব। অথচ চোখে দেখতে না পেলেও আমরা অণুপরমাণু সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছি। এমন কি, চোখে দেখা জ্যোতিষ্ক জগতের তুলনায় এই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু রাজ্যের নিয়মকানুন বৈজ্ঞানিকদের কাছে অধিক পরিচিত হয়ে উঠেছে।

সকল বস্তুই বারেবারে খণ্ডিত করা যায়। বারেবারে খণ্ডিত করলে খণ্ডগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কণায় পরিণত হয়। মানুষের মনে বহুকাল আগেই প্রশ্ন উঠেছিল—বস্তুর এই বিভাজ্যমানতার কি কোন সীমা নেই? যতবার ইচ্ছা ততবারই কি খণ্ডিত বিভক্ত করা যায়?

দু-হাজার বছর আগে কোন কোন ভারতীয় (কণাদ) ও গ্রীক দার্শনিক এই মত পোষণ করতেন যে বস্তুর বিভাজ্যমানতার একটা সীমা আছে, ছোট করে ভাঙতে ভাঙতে এক জায়গায় এসে থামতে হবে, কারণ, সকল বস্তুই মূলতঃ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অখণ্ডনীয় কণার সমষ্টি। এই মূল কণা আর ভেঙে

দু-ভাগ করা যাবে না। এই হ'লো আণবিক মতবাদের দার্শনিক ও কাল্পনিক গোড়াপত্তন। এ সময় কারো মত ছিল, অণুগুলি অতি ক্ষুদ্র কঠিন বর্তুলাকার, কেউ আবার মনে করতেন অণুগুলির মধ্যে প্রাণশক্তিও নিহিত থাকে। সে যাই হোক, বৈজ্ঞানিক আণবিকবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন ইংরেজ রসায়নবিদ ডাল্টন (John Dalton), ১৮১০ খৃষ্টাব্দে।

অণু ও পরমাণুর পার্থক্য: কোন বস্তুকে বারেবারে ভাঙলে অবশেষে এমন এক কণায় উপনীত হওয়া যায় যাকে আর খণ্ড করা যায় না। এই কণার নাম বস্তুর অণু (molecule), ডাল্টন প্রথমে বলেছিলেন পরমাণু (atom)। পরে বোঝা গেল কোন বস্তুর "ক্ষুদ্রতম কণা, যা আর ভাঙা যায় না" এই কথার মধ্যে দুই প্রকার অর্থ আছে। এক অর্থে ভাঙা যায় না, অন্য অর্থে ভাঙা যায়। ফলে 'অণু' ও 'পরমাণু' এই দুটি পৃথক শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাহ'লে একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একবিন্দু জলকে বারেবারে বিভক্ত করতে করতে এমন একটি সূক্ষ্ম কণা পাওয়া গেল যার ছোট 'জলকণা' আর পাওয়া যায় না। এই ক্ষুদ্রতম কণায় জলের সমস্ত ধর্মই বজায় আছে। এই রকম লক্ষ লক্ষ কণা একত্র করলে একটি জলের ফোঁটা সৃষ্টি হবে। ক্ষুদ্রতম জলকণাকে বলব জলের অণু (molecule of water)। একে আর ভাঙা যায় না, 'জল' হিসাবে ভাঙা যায় না।

কিন্তু এই সবচেয়ে ছোট জলের কণাকে আরো তিন খণ্ড করা যায়: এক খণ্ড হবে অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণু, অন্য দুটি হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু। এই তিন খণ্ডের কোনটিই জল নয়, দুটি বিভিন্ন জাতের গ্যাস।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ: তা'হলে জল হলো যৌগিক পদার্থ (compound বা chemical compound), কারণ বিভিন্ন উপাদান (অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন) যুক্ত হ'য়ে তৈরী হয়েছে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন হ'লো মূল উপাদান বা মৌলিক পদার্থ (element বা chemical element)।

এখন বোঝা গেল বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণা বা অণু কেন এক হিসাবে আর ভাঙা যায় না, অথচ অন্য হিসাবে ভাঙা যায়। জলের অণুই হ'লো জলের সবচেয়ে ছোট কণা, একে ভাঙলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস হয়ে দাঁড়াবে। তাহ'লে জল হিসাবে ভাঙা গেল না, অথচ ভাঙা গেল অন্য দু-জাতের গ্যাসের পরমাণুতে।

তেমনি লবণ। লবণের চরম ক্ষুদ্রতম কণা লবণের অণু। একে দুখণ্ড করলে পাওয়া যাবে সোডিয়াম ধাতুর একটি পরমাণু ও ক্লোরিণ গ্যাসের একটি পরমাণু, দুটির কোনটিই লবণ নয়। লবণ যৌগিক পদার্থ, সোডিয়াম ও ক্লোরিণ মৌলিক পদার্থ।

অণু ও পরমাণু এবং মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের মানে বোঝা গেল। কিন্তু একটা ভুল ধারণা জন্মাবার সম্ভাবনা আছে। মনে হতে পারে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম খণ্ডকে বলব অণু; আর মৌলিক পদার্থের বেলা বলব পরমাণু, মৌলিক পদার্থের অণু বলে কিছু নেই। এটা ভুল। মৌলিক পদার্থের অণু, পরমাণু দুই-ই হ'তে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাসের এক একটি কণা হ'লো হাইড্রোজেনের অণু (hydrogen molecule), দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু (hydrogen atom) যোগ করে একটি হাইড্রোজেন অণু। রাসায়নিক উপায়ে বা বিদ্যুৎ চালিয়ে এই জোড় ভাঙা যায়। তেমনি চারটি ফস্‌ফরাস পরমাণু জুড়ে একটি ফসফরাস অণু। ফস্‌ফরাস্ মৌলিক পদার্থ। গন্ধকও। আটটি গন্ধকের পরমাণু জুড়ে একটি গন্ধকের অণু। মৌলিক পদার্থে যুগল বা বহু পরমাণুযুক্ত অণু যেমন আছে (হাইড্রোজেন, ফ্রস্‌ফরাস, গন্ধক ইত্যাদি), একক অণুর পরমাণুও আছে অনেক মৌলিক পদার্থে। সোডিয়াম, লোহা, তামা ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ। এদের এক একটি অণু এক একটি পরমাণুর সমান, অর্থাৎ এদের অণু আর পরমাণুতে পার্থক্য নাই। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, মৌলিক পদার্থের অণু সংগঠনে পরমাণুর একত্ব ও বহুত্বের পার্থক্য থাকতে পারে।

মোটামুটি হিসাবে ৯২টি মৌলিক পদার্থের কথা জানা গিয়েছে। আরো কয়েকটি মৌলিক পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা গিয়েছে, কিন্তু এখনি সে সূক্ষ্ম বিচারে যাবো না।

মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৯২টি হ'লেও তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। মৌলিক পদার্থের নানা প্রকার সংযোগে নানা প্রকার পদার্থ তৈরী হতে পারে। কত জিনিস কয়েকটি মাত্র মৌলিক পদার্থ নানা মাত্রায় যুক্ত হ'য়ে তৈরী। একই মৌলিক পদার্থ কত বস্তুতে। হাইড্রোজেনের কথাই ধরা যাক। জলের একটি উপাদান অংশ হ'লো হাইড্রোজেন, সে কথা আগেই বলেছি ; দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে জলের একটি অণু তৈরী : ফরমুলা H_2O হলো। তেমনি একটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি নাইট্রোজেন পরমাণু এবং তিনটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি নাইট্রিক এসিড অণু তৈরী (ফরমুলা HNO_3)। হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন—তিনটিই গ্যাস, কোনটিই অম্লাস্বাদ (টক) নয়, কোনটিই বিষাক্ত নয়, কোনটিই গায়ের চামড়াকে পুড়িয়ে দেয় না। কিন্তু নাইট্রিক এসিড ? তরল নাইট্রিক এসিডের সঙ্গে ঐ তিনটি গ্যাসের কোনও মিল আছে ? হাইড্রোজেন কত বস্তুর উপাদান : জল, নাইট্রিক এসিড, মোমবাতি, চিনি, আরো কত কী। তেমনি অক্সিজেনও। তারপর অঙ্গারের (carbon) কথা ধরা যাক। অঙ্গারের একটা সহজ চেহারা কয়লা। অঙ্গার বা কার্বন একটি মৌলিক পদার্থ। কয়লা আছে কাঠে, মোমবাতিতে, শরীরের রক্ত-মাংসে, মার্বেল পাথরে, লেখবার সাদা খড়িতে, কাগজে, কাপড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর একটি মৌলিক উপাদানের কথা ধরি, ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম আছে চুলে, শরীরের হাড়ে, শামুকের বা ঝিনুকের খোলায়, খড়িতে, গ্যাসের মশলায় (যাকে বলে কার্বাইড, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বাইড), মার্বেল পাথরে, কাচে ইত্যাদি। আবার একই উপাদান সংযোগে একাধিক যৌগিক পদার্থ হতে পারে : যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে জল হয় (H_2O), আবার হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) হয়। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি মাত্র মৌলিক পদার্থ দিয়ে কতগুলি যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে। এ যেন বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে শব্দ রচনার মতো। অ আ ক খ প্রভৃতি অক্ষর কটিই বা আছে ? কিন্তু তাদের নিয়ে কত হাজার হাজার শব্দ রচিত হয়! অক্ষরগুলি মৌলিক, শব্দ বা বাক্যগুলি যৌগিক।

পারমাণবিক ভার :—জড় জগতের মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন সবচেয়ে লঘু বা হাল্‌কা। প্রত্যেকটি অণু পরমাণুর নির্দিষ্ট ভার বা ওজন আছে। এদের এক একটির ওজন এত সামান্য যে সের, ছটাক বা গ্র্যাম (gramme) অনুসারে বলতে অসুবিধা হয়। অথচ এদের ওজন জানতে হবে, বলতে হবে, তুলনা করতে হবে। হাইড্রোজেন পরমাণু সবচেয়ে ওজনে ছোট, তাই হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ধরা হয় '১'। এটাই যেন অণু পরমাণু রাজ্যের বাটখারা। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর আসল ওজন হ'লো ১.৬৬×১০^{-২৪} **গ্র্যাম** (প্রায় ১০০০ গ্র্যামে ১ সের হয়)। ঐ ওজন মানে ১.৬৬ ÷ ১'এর পর ২৪টি শূন্য অর্থাৎ ১.৬৬কে হাজার কোটি কোটি কোটি দিয়ে ভাগ করলে যত হয় তত গ্র্যাম। ধারণা করাই মুশকিল। এই কারণে হিসাব সহজ করে নেওয়া হয়েছে, হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন '১' ধরা হবে। হাইড্রোজেন অণুর ওজন তাহ'লে ২, কারণ দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে একটি হাইড্রোজেন অণু। অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৬ গুণ, অতএব অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ষোল। জলের অণুর (H_2O) ওজন কত? আঠারো। কারণ দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ২, আর একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ১৬, যোগ করলে ১৮ হয়। এই '১৮' ওজন হ'লো হাইড্রোজেনের তুলনায়। যদি আসল ওজন (গ্র্যামে) জানতে হয় তাহ'লে জলের অণুর ওজন হবে $১৮ \times ১.৬৬ \times ১০^{-২৪}$ গ্র্যাম অর্থাৎ ২৯.৮৮×১০^{-২৪} গ্র্যাম।

হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভার (atomic weight) যেমন ১, অক্সিজেনের ১৬, তেমনি অঙ্গারের পারমাণবিক ভার ১২, এ্যালুমিনিয়ামের ২৭, লোহার ৫৬, সীসের ২০৭, প্লাটিনামের ১৯৫, সোনার ১৯৭ ইত্যাদি। সবচেয়ে ভারী পরমাণু ইউরেনিয়ামের, ওজন ২৩৮ (হাইড্রোজেনের তুলনায়)। অন্যত্র (২১শ অধ্যায়) পরমাণুভারের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হয়েছে।

তাপ ও আণবিক গতি : জড় বস্তুর তিনরূপ : কঠিন (solid), তরল (liquid), ও বায়বীয় (gaseous)। কোন বস্তুর মধ্যেই অণুগুলি স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকে না। বায়বীয় পদার্থে আণবিক গতিবেগ সবচেয়ে বেশী, তরল বস্তুতে একটু কম, কঠিন বস্তুতে খুবই অল্প। বায়বীয় ও তরল

বস্তুর অণুগুলি যেখানে সেখানে ছুটে বেড়ায়। ঘরের মধ্যে ফুল রাখলে সারা ঘর গন্ধে ভরে ওঠে। ফুলের সুগন্ধ আসে এক প্রকার রাসায়নিক তরল পদার্থ থেকে। এর নির্যাস বার করে এসেন্স তৈরীও হয়। এই সুগন্ধ বাষ্পের আকারে ওঠে, ঘরে বায়ু চলাচল না থাকলেও সেই বাষ্প সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, কারণ বাষ্প অণুগুলি স্থির থাকে না, ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তেমনি এক দোয়াত জলে সন্তর্পণে একটি কালির বড়ি ফেলে দিলে ক্রমশঃ সমস্ত দোয়াতের জল কালিবর্ণ হয়ে ওঠে। এই গলে যাওয়া বা মিশে যাওয়ার কারণ হলো তরল পদার্থের (যেমন দোয়াতের জল) আণবিক গতিবেগ। কিন্তু কঠিন পদার্থে অণুগুলি পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ বলে তারা স্বস্থান ছেড়ে ছুটোছুটি করতে পারে না, আপন আপন স্থানে থেকে কম্পিত হয় মাত্র।

বস্তুকে উত্তপ্ত করলে তার আণবিক গতি বৃদ্ধি পায়। এই কারণে গরম জলে চিনি সহজে গলে। সাধারণ বায়ুর আণবিক গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫০০ গজ, ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড মাত্রায় গরম করলে এই গতিবেগ হয়ে দাঁড়ায় সেকেণ্ডে ৫৮০ গজ। একথা শুনলেই মনে হবে, সেকি এযে কাল-বৈশাখী ঝড়েরও হাজার গুণ। না, দুটি দু-রকম ব্যাপার। আণবিক গতিবেগের জন্য হাওয়া বা ঝড় হয় না। বন্ধ ঘরের বাতাসের মধ্যেও অণু-গুলির এই ভীষণ দৌরাত্ম্য চলে, আমরা তা বুঝতে পারি না। বায়ুর প্রত্যেকটি অণু প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে, কিন্তু সব কটি একত্রে একই দিকে ছুটছে না। একটি হয়তো পুব দিকে ছুটছে, পাশেরটি ছুটছে পশ্চিম মুখে, কোনটি উত্তর দিকে, কোনটি দক্ষিণ দিকে, কোনটি উপর দিকে, কোনটি নিচের দিকে। কোটি কোটি অণুর এই জগাখিচুড়ি, উল্টোপাল্টা ধাক্কায় ঘরের মধ্যে কারো মাথার চুল পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না। আমরা বলছি ঘরে হাওয়া চলাচল একদম বন্ধ।

গ্যাস বা বায়ু যত উত্তপ্ত হয় অণুর গতিবেগ ততই বেড়ে চলে। অর্থাৎ তাপশক্তি রূপায়িত হয় আণবিক গতিশক্তিতে। সূর্যের বায়ুমণ্ডলের যে উত্তাপ তাতে সৌর-বাষ্পে আণবিক গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় দেড় মাইল করে।

বায়বীয় বা বাষ্পীয় অণুর গতিবেগের জন্যই 'চাপ' (gas pressure) অনুভূত হয়। রবারের বেলুনে বাতাস ভরলে ফুলে থাকে। আমরা বলি ভিতরের বাতাসের চাপে বেলুনটি ফুলে আছে। এই চাপের মূল অর্থ কী? ভিতরের বায়ু-অণুগুলি ছুটোছুটি ক'রে রবারের উপর অবিশ্রান্ত আঘাত করছে, সেই কারণে বেলুনটি সঙ্কুচিত হতে পারছে না। বেলুনটাকে একটু গরম করলে আর একটু বেশী ফুলে উঠবে, কারণ গরমে ভিতরের অণুগুলির ছুটোছুটির মাত্রা বাড়বে, ধাক্কা দেবার ক্ষমতা বাড়বে অর্থাৎ চাপ বাড়বে। এই কারণে গরমের দিনে রাস্তায় বেরুনোর আগে মোটর গাড়ীর চাকার হাওয়া (প্রেসার) একটু কমিয়ে নিতে হয়। গরম পিচের রাস্তায় গাড়ী চললেই চাকার প্রেসার বেড়ে যায়।

আমরা জানি বাষ্পের চাপে ইঞ্জিনের চাকা ঘোরে। বাষ্পের চাপের মূলেও রয়েছে বাষ্প-অণুদের গতিবেগ। এক একটি জলীয় বাষ্পের অণু কতটুকু, কতই বা ঠেলতে পারে? প্রায় ৩০০০,০০০০০০০ লক্ষ কোটি বাষ্প-অণুর ওজন এক গ্র্যাম মাত্র। ধাক্কার জোর শুধু গতিবেগই পোষায় না, ভারও চাই। এ থেকে আমরা অণুমান করতে পারি কত কোটি কোটি বাষ্প-অণুর ধাক্কায় এত বড় বড় রেলগাড়ী চলে।

ব্রাউনীয় গতি ঃ বস্তুর অণু চোখে দেখতে পাই না। জল বা বাতাসে অণুর ছুটোছুটিও দেখতে পাই না। কিন্তু ওরা যে অবিশ্রান্ত ছুটোছুটি করে তার নানা প্রমাণ আছে, সেকথা বলেছি। অণুদের দেখা না গেলেও তাদের ছুটোছুটির চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া যায় সুন্দর ভাবে। ইংরেজ উদ্ভিদবিদ রবার্ট ব্রাউন চাক্ষুস প্রমাণের পন্থা আবিষ্কার করেন। রবার্ট ব্রাউন দেখলেন, স্থির বাতাসে বা বাটির জলে যদি খুব সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা মোমের কণা ভেসে থাকে তা'হলে তারা আপনা থেকেই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে, জ্যান্ত পোকার মতো। কিন্তু ধূলিকণা বা মোমের কণার প্রাণ নেই, হাত-পা নেই, পাখা নেই। তবে কী করে ওরা অনবরত নড়ে চড়ে বেড়ায়? আবার, কণাগুলি যত ছোট হবে তাদের নড়া-চড়াও তেমনি বাড়ে। এই নড়াচড়া খুবই হিজিবিজি অনির্দিষ্ট ধরনের, কোন এক নির্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করে চলে না। এই সব ভাসমান কণাগুলি মাইক্রস্কোপের মধ্য দিয়ে দেখলে দেখা যাবে

একদিকে একটু চলে পরমুহূর্তে অন্যদিকে চলতে লাগল, তার পরেই থম্‌কে আবার অন্য দিকে। এই পাগ্‌লা গতির কোনও স্থিরতা নেই কখন কোন দিকে চলবে। কখনও থামে না, কিলবিল ক'রে অনবরত নড়ে বেড়াচ্ছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ব্রাউনীয় গতি (Brownian motion)। সূক্ষ্ম ভাসমান কণার উপর বাতাস বা জলের অণুর অবিশ্রান্ত ধাক্কার ফলেই ওরা অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে। খেলোয়াড়দের পদাঘাতে ফুটবল যেমন এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়, এও তেমনি।

কিন্তু তফাত এই যে, খেলোয়াড়দের শরীরের তুলনায় বলটি ছোট। কিন্তু জল বা বাতাসের অণুগুলির তুলনায় ভাসমান কণা অনেক বড়। এর ফলে হাজার হাজার অণু এসে একই সঙ্গে একটি ভাসমান কণাকে ধাক্কা দিচ্ছে চতুর্দিক থেকে। কণাটি যদি বড় হয় তাহ'লে অনেক বেশী অণু এসে চতুর্দিক থেকে ধাক্কা দেবে, অণুগুলি বুঝেশুনে পরস্পর জোট করে একই দিকে ধাক্কা দিচ্ছে না, ফলে সব দিকের ধাক্কার জোর কাটাকাটি হয়ে যাবে, ভাসমান কণাটি নড়বে না। কিন্তু যদি ভাসমান কণাটি খুব ছোট হয় তাহ'লে খুব অল্প সংখ্যক অণু ধাক্কা দেবে, এ অবস্থায় ওদের সবার ধাক্কা পরস্পর ঠিক ভাবে কাটাকাটি হওয়া সম্ভব না, ধাক্কার জোর কম বেশী হয়ে বেসামাল (unbalanced) হয়ে পড়বে, কণাটি নড়বে। এই কারণে ভাসমান কণা যত ছোট হয় তার ব্রাউনীয় গতিবেগও তেমনি বাড়ে। আবার, জল বা বাতাসকে গরম করলেও কণার ঐ গতি বেড়ে যায়।

অধ্যায়—১৪

তাপ ও উত্তাপ

সাধারণ কথায় যা-ই বলি না কেন, স্পর্শদ্বারা আমরা তাপ অনুভব করি না, অনুভব করি উত্তাপ বা উষ্ণতা। তাপ ও উষ্ণতায় প্রভেদ আছে। তাপ এক প্রকার শক্তি (energy), উষ্ণতা তপ্ত বস্তুর অবস্থা বিশেষ। মিষ্ট-দ্রব্য ও মিষ্টত্বে যেমন প্রভেদ, তাপ ও উষ্ণতায় সেই ধরনের পার্থক্য। মিষ্টত্ব থেকে মিষ্ট দ্রব্যের পরিমাণ পাওয়া যায় না, তেমনি কেবল উষ্ণতা থেকে তাপ-শক্তির পরিমাণ বোঝা যায় না। এক পেয়ালা জলে দু-চামচ চিনি দিলাম, জলটা বেশ মিষ্টি লাগল। এক বালতি জলে দশ চামচ চিনি মেশালাম, সে জল মিষ্টি হ'লো কি হ'লো না বোঝাই গেল না। তাহ'লে মিষ্টত্ব থেকে বলা যায় না কোথায় কত পরিমাণ চিনি আছে। তেমনি, উষ্ণতা থেকে তাপ-শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। ফুলঝুরির একটি জলন্ত কণা উষ্ণতায় হাজার ডিগ্রী, কিন্তু ঐ ছোট আগুনের ফুলকিতে কতটুকুই বা তাপশক্তি থাকে? ফুলঝুরির জলন্ত ফুলকিতে হাত দিলেও ছ্যাঁকা লাগে না। কারণ হাতে ঠেকবা মাত্র ঐ সামান্য তাপশক্তি হাতে শুষে নেয়, জলন্ত ফুলকি তক্ষুণি ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

গরম চায়ের কাপে হাত দিলে গরম লাগে। বরফ দেওয়া সরবতের গ্লাসে হাত দিলে ঠাণ্ডা লাগে। আমাদের শরীরের উত্তাপের তুলনায় চায়ের কাপটি বেশী গরম বা উত্তপ্ত, সেই কারণে কাপ থেকে তাপ হাতে আসে। তখন গরম লাগে। ঠাণ্ডা গ্লাসেরও একটা উত্তাপ আছে, সেটা আমাদের হাতের উত্তাপের তুলনায় অল্প। এজন্য হাতের তাপ বেরিয়ে যায় গ্লাসের গায়ে। তখন হাতে ঠাণ্ডা লাগে। 'ঠাণ্ডা' 'গরম' কথা দুটি তুলনামূলক। ছুঁয়ে বুঝতে অনেক সময় গোলমাল লাগতে পারে। একই জিনিসকে এক সময় ঠাণ্ডা অন্য সময় গরম মনে হতে পারে। সেটা নির্ভর করে হাতের

উত্তাপ অনুসারে। একটা সোজা উদাহরণ দিচ্ছি। তিন বালতি জল পাশা-পাশি রাখলাম। প্রথমটিতে ঠাণ্ডা জল, দ্বিতীয়টিতে একটু গরম মেশানো, তৃতীয়টিতে বেশী গরম জল মেশানো। প্রথম বালতিতে হাত ডুবিয়ে দ্বিতীয়টিতে ডোবালে গরম লাগবে। কিন্তু আগে তৃতীয়টিতে ডুবিয়ে তার পরেই দ্বিতীয় বালতির জলে হাত ডোবালে ঠাণ্ডা মনে হবে।

ঠাণ্ডা-গরম বা উষ্ণতা মাপা যায় কী করে? থার্মোমিটার দিয়ে। কোন বস্তু উত্তপ্ত হ'লে তার আয়তন বাড়ে। গ্যাসের কথা বলেছি। বেলুনে গ্যাস ভরে উননের ধারে সাবধানে একটু গরম করতে পারলে আরও একটু ফুলে উঠবে। শুধু গ্যাস নয়, তরল বা কঠিন পদার্থও গরমে আয়তনে বাড়ে। এই ব্যাপারটাই থার্মোমিটার তৈরী করতে কাজে লাগানো হয়।

থার্মোমিটারে থাকে একটি সরু কাচের নল, কাচটি মোটা, কিন্তু নলটি খুব সরু—চুলের মতো সরু। এজন্য একে বলে কৈশিক নল (capillary tube)। নলের এক মাথায় পারদ বা পারা (mercury) ভরবার মতো একটু মোটা নল। কৈশিক নলের অন্য মুখ বন্ধ। গরম জিনিসে পারদ ভাণ্ডটি ছোঁয়ালে বা গরম জলে ডোবালে পারা আয়তনে বাড়তে থাকে, আর কৈশিক নল বেয়ে উঠতে থাকে। কত দূর উঠবে তা নির্ভর করে ডোবানো জলের উত্তাপ অনুসারে। থার্মোমিটারের পারা আর বাটির গরম জলের উত্তাপ যতক্ষণ না সমান সমান হয় ততক্ষণ পারার দাঁড়ি উঠতে থাকে। সমান সমান গরম হয়ে গেল আর ওঠে না, যতক্ষণই ডুবিয়ে রাখা যাক্ না কেন। ডাক্তারী থার্মোমিটারে যদি লেখা থাকে '১ মিনিট' তার মানে জ্বর দেখবার জন্য এক মিনিট রাখলেই যা উঠবার উঠবে। কিন্তু যদি বেশীক্ষণ রাখা যায়, ক্ষতি নেই, বেশী উঠবে না। শরীরের উত্তাপ ও পারার উত্তাপ একবার সমান সমান হয়ে গেলে পারার দাঁড়ি আর উঠবে না।

এবার দেখা যাক থার্মোমিটারে কী ক'রে 'ডিগ্রী' দাগ কাটা হয়। কাচ নলের মধ্যে পারা ভরে থার্মোমিটার তৈরী হ'লে দাগ কাটবার পালা। প্রথমে বরফের মধ্যে থার্মোমিটারকে ডোবান হয়। ঠাণ্ডায় পারার দাগ নামতে নামতে এক যায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যায়। এটা হলো বরফের টেম্পারেচার ঃ এখানে দাগ কাটা হয় শূন্য (০) দিয়ে। তারপর থার্মোমিটারকে জলে ডুবিয়ে

গরম করা হয়। অবশেষে জল ফুটতে থাকে। গরম পেয়ে পারার দাঁড়ি উঠতে উঠতে ফুটন্ত জলের উত্তাপ অনুসার এক যায়গায় দাঁড়িয়ে যায়। এইখানে দাগ দেওয়া হয় '১০০' দিয়ে। তারপর ০ আর ১০০ দাগের মধ্যে ১০০টি সমান ভাগ ক'রে দাগ কাটা হয়। এক একটি দাগ এক এক সেন্টিগ্রেড
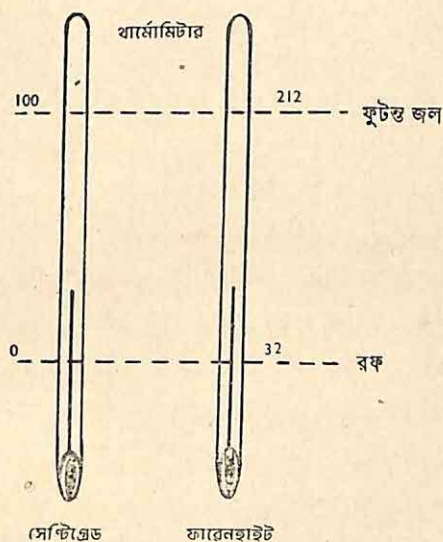
চিত্র—১৬ : থার্মোমিটার।

উত্তাপ মাত্রা হ'লো। এবার ইচ্ছে করলে ১০০ ডিগ্রী মাত্রার উপর দিকে আরো সমান সমান দাগ কোটে বাড়িয়ে যাওয়া যায়, তাহ'লে পাওয়া যাবে ১০১, ১০২, ১০৩ ডিগ্রী ইত্যাদি। তেমনি আবার ০ ডিগ্রীর নিচের দিকেও সমান সমান ডিগ্রী দাগ কাটা হয়ঃ ০ ডিগ্রী নিচের দিকে এক এক দাগে হবে —১,—২,—৩ ডিগ্রী ইত্যাদি।

সেন্টিগ্রেড মাত্রা ছাড়া আর একটি উত্তাপ মাত্রা আছে,—ফারেনহাইট মাত্রা (Fahrenheit degree) বরফে ডুবিয়ে যেখানে পারার দাঁড়ি নামল সেখানে দাগ দিয়ে লেখা হয় ৩২ ডিগ্রী, আর ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে যেখানে উঠল সেখানে দাগ দিয়ে লেখা হয় ২১২ ডিগ্রী ফারেনহাইট। বত্রিশ আর ২১২-র ব্যবধান হচ্ছে ১৮০, এজন্য ঐ দুই দাগের মাঝে সমান ভাবে ১৮০ ভাগ

করে দাগ কাটা হয়, প্রত্যেকটি দাগ হ'লো ১ ডিগ্রী ফারেনহাইট করে। এ-ক্ষেত্রেও ২১২° ফাঃর (ফুটন্ত জলের উত্তাপ) উপর দিকে সমান ভাগে দাগ কেটে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, সেগুলি হবে ২১৩, ২১৪, ২১৫···ডিগ্রী (ফাঃ)। তেমনি ৩২° ফাঃ নিচে সমান ভাগ করে দাগ কেটে গেলে হবে ৩১, ৩০, ২৯ ডিগ্রী (ফাঃ) ইত্যাদি। এইভাবে বত্রিশ ঘর নামলে হবে ০° ফাঃ, তারও নিচে গেলে হবে—১°,—২°,—৩°··· ইত্যাদি।

থার্মোমিটারে উষ্ণতার মাত্রা কাটতে বরফ ও ফুটন্ত জলের তাপমাত্রাকে সচরাচর নির্দিষ্টমান ধরা হয়। বরফের উত্তাপকে সেন্টিগ্রেড মাত্রায় শূন্য ধরা হয়, ফারেনহাইট ৩২ ; ফুটন্ত জলের তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেড মাত্রায় ১০০ ডিগ্রী, ফারনহাইটে ২১২ ডিগ্রী ধরা হয়।

বরফই সবচেয়ে ঠাণ্ডা জিনিস নয়। বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা জিনিস হতে পারে। শুধু তাই নয়, বরফকেও বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা করা যায়। বরফের কুচির সঙ্গে লবণ মেশালে আরও ঠাণ্ডা হয়। কুলফি বরফ বা আইসক্রীম তৈরী করতে বরফ-লবণ মিশিয়ে এইরকম হিম-মশলা (freezing mixture) ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে কুলফি বা আইসক্রীমের কৌটো ডুবিয়ে রাখা হয় জমানোর জন্য। বরফ-লবণ মেশালে টেম্পারেচার নেমে যায়—২৫° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত (শুধু বরফ ০° সেন্টিঃ)। আইসক্রীম তৈরী করতে আজকাল আইসক্রীমের কারখানায় 'শুক্‌নো বরফ' (dry ice) ব্যবহার হয়। শুকনো বরফ হলো জমান কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস (solid corbondioxide) ; গুঁড়ো নূনের ডেলার মতো দেখতে। গলে জল হয় না, একেবারে গ্যাস হয়ে উড়ে যায়। এইজন্য একে শুকনো বরফ বলা হয়। এর টেম্পারেচার বরফের চেয়ে ৭৮° সেন্টিগ্রেড নিচে, অর্থাৎ—৭৮° সেন্টিঃ।

এর চেয়েও ঠাণ্ডা জিনিস হয়। অক্সিজেন গ্যাসকে—১৮৩° সেন্টিগ্রেডে তরল ও—২১৮° সেন্টিতে জমিয়ে কঠিন (solid) খণ্ডে পরিণত করা যায়।

শত সহস্র বা লক্ষ ডিগ্রী গরম বস্তু দেখা যায়। সূর্য, নক্ষত্র কী ভীষণ গরম। এদিকে যেন টেম্পারেচারের কোন সীমা সংখ্যা নেই। কিন্তু বরফের চেয়ে হাজার ডিগ্রী ঠাণ্ডা কিছু নেই, কিছু হতেও পারে না। হিসাব করে দেখা গিয়েছে—২৭৩° সেন্টিগ্রেড মাত্রার নিচে কোনও টেম্পারেচার হতে পারে

না। অর্থাৎ—২৭৩° সেন্টিঃ হ'লো শীতলতার চরম নিম্নধাপ। এই গণনা অনুসারে—২৭৩° সেন্টিঃকে উষ্ণতার চরম শূন্য (absolute zero temperature) বলা হয়। এ পর্যন্ত—২৭২° সেন্টিগ্রেড অবধি শীতল বস্তু সৃষ্টি করতে পারা গিয়েছে, জমাট হিলিয়াম গ্যাস (solid helium) তৈরী করে। আর এক ডিগ্রী নামতে পারলেই উষ্ণতা মাত্রার চরম সীমায় পৌঁছানো যাবে।

তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর মধ্যে তাপ চালনা করলে তাপের অনুপাতে বস্তুর উষ্ণতা বা টেম্পারেচার বাড়ে। উষ্ণতা মাপতে যেমন ডিগ্রী বা মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাপশক্তি পরিমাণ করবার জন্যও তেমনি তাপ-মাত্রা স্থির করা হয়েছে। তাপমাত্রার নাম ক্যালোরী (calorie)। এক গ্র্যাম জলকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপ-মাত্রায় তুলতে যতটুকু তাপশক্তি লাগে তাকেই বলে এক ক্যালোরী তাপশক্তি। সাধারণ জলের উষ্ণতা ধরা যাক ৩০° সেন্টিগ্রেড। তাহ'লে এক সের (১৮২০ গ্র্যাম) জল ফোটাতে কত ক্যালোরী দরকার হবে ? দেখছি এ ক্ষেত্রে জলের উত্তাপ বাড়াতে হবে ৩০° থেকে ১০০°, অর্থাৎ ৭০ সেন্টিঃ। দেখেছি ১ গ্র্যাম জলকে আরো ১° গরম করতে লাগে ১ ক্যালোরী। তাহ'লে ১৮২০ গ্র্যাম জলকে আরো ৭০° গরম করতে লাগবে ১৮২০ × ৭০ = ১, ২৭, ৪০০ ক্যালোরী।

সমান ওজনের ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে সমান উত্তাপ মাত্রায় গরম করতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়। এক গ্র্যাম জলকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড গরম করতে লাগে ১ ক্যালোরী। কিন্তু এক গ্র্যাম তেল বা ঘি এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড গরম করতে লাগে প্রায় আধ ক্যালোরী মাত্র। আবার এক গ্র্যাম লোহা বা তামা এক সেন্টিগ্রেডে গরম করতে লাগে প্রায় $\frac{১}{১০}$ ক্যালোরী, রুপোয় লাগে মাত্র $\frac{১}{২০}$ ক্যালোরী (অর্থাৎ সহজেই তেতে ওঠে) তেমনি আবার এক গ্র্যাম হাইড্রোজেন গ্যাসকে এক ডিগ্রী তাতাতে লাগে ৬ ক্যালোরী, অক্সিজেনে মাত্র ০·৩৫ ক্যালোরী। এক গ্র্যাম বস্তুকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড গরম করতে যত তাপ শক্তি বা ক্যালোরী লাগে তাকে বলে বস্তুর আপেক্ষিক তাপ (specific heat)। তাহ'লে জলের আপেক্ষিক তাপ ১, লোহা বা তামার মোটামুটি $\frac{১}{১০}$, রুপোর $\frac{১}{২০}$ হাইড্রোজেনের ৬ ইত্যাদি।

আপেক্ষিক তাপ জানা থাকলে কতখানি কোন জিনিস কতটা গরম করতে কত ক্যালোরী দরকার হবে তা সহজেই হিসাব ক'রে বলে দেওয়া যায়। ধরা যাক তেলের আপেক্ষিক তাপ ½, অর্থাৎ এক গ্র্যাম তেল এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড গরম করতে লাগে ½ ক্যালোরী। তা'হলে আধসের (৯১০ গ্র্যাম) তেল ২০০ ডিগ্রী সেন্টিঃ গরম করতে কত ক্যালোরী লাগবে ? লাগবে ½ × ৯১০ × ২০০ = ৯১০০০ ক্যালোরী। অর্থাৎ তাপ (ক্যালোরী) = আপেক্ষিক তাপ × জড়মান (গ্র্যাম) × উত্তাপ বৃদ্ধি (সেন্টিগ্রেড)।

গরম জিনিস আর ঠাণ্ডা জিনিস ঠেকিয়ে রাখলে গরম জিনিস থেকে ঠাণ্ডা জিনিসের মধ্যে তাপ প্রবাহিত হয়। ফলে গরমটি ঠাণ্ডা হতে থাকে আর ঠাণ্ডাটি গরম হতে থাকে। তাপ প্রবাহ চলতে থাকে যতক্ষণ না দুটির উত্তাপ বা টেম্পারেচার সমান সমান হ'য়ে যায়। উত্তাপ সমান হ'য়ে গেলে তাপ প্রবাহ বন্ধ হ'য়ে যায়। এক হিসাবে, তাপ প্রবাহ যেন জলপ্রবাহের মতো। জল যেমন উঁচু থেকে নিচু দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাপ তেমনি উঁচু উষ্ণতামান থেকে নিচু উষ্ণতামানের দিকে যায়।

কঠিন বস্তুর একদিক গরম করলে ক্রমে ক্রমে অন্যদিকও গরম হ'য়ে ওঠে। একটা লোহার শিক আগুনে ঢোকালে অন্য দিকও ক্রমশঃ তেতে ওঠে। যে মুখটা আগুনে সেটা প্রথমে গরম হ'লো, ঐ দিকের তাপ চলে আসতে লাগল ঠাণ্ডা দিকটাতে। কী করে এলো ? গরম মুখটা তেতে লাল হ'লো ; সেখানকার অণুগুলি তাপশক্তি নিয়ে কাঁপতে লাগল, ফলে পরের পরের স্তরের অণুগুলিও উত্তেজিত হ'য়ে উঠতে লাগল, অর্থাৎ তেতে উঠতে লাগল। অথচ লোহার শিকের কোন অণুই এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ছুটে গেল না, যেন তাপশক্তির উত্তেজনা এক অণু থেকে পাশের অণুতে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে দিতে লাগল। এই ভাবে তাপশক্তি কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতে লাগল। একে বলে তাপের পরিচলন (heat conduction)।

তরল বস্তুর মধ্য দিয়ে তাপের প্রবাহ একটু অন্যভাবে হয়। চায়ের জলের কেটলি চড়িয়ে দিলাম উনুনের উপর। জলের নিচের স্তর প্রথমে গরম হ'লো। কঠিন বস্তুর মতো এই তাপ স্তরে স্তরে উপরে উঠতে পারতো। 'কিন্তু তরল বস্তুর অণুগুলি পরস্পর দৃঢ় সংবদ্ধ নয়। জলের নিচের স্তর গরম

হতেই তার আয়তন বেড়ে গেল, অর্থাৎ হাল্কা হ'য়ে গেল। উপরের জল তখনও তার চেয়ে ঠাণ্ডা ও ভারী (বা ঘন)। নিচের গরম হাল্কা জল ভেসে উঠতে চাইল, উপরের ঠাণ্ডা ঘন জল নিচের দিকে নামতে চাইল। এইভাবে নিচের তাপ সহজেই উপরে প্রবাহিত বা পরিবাহিত হ'লো। তরল পদার্থের এই তাপ প্রবাহের পদ্ধতিকে বলে পরিবহন (convection)। বায়বীয় পদার্থের মধ্যেও এইভাবে তাপস্রোত সৃষ্টি হয়। ঘরের মধ্যে মানুষ থাকলে বা আগুন জ্বালালে ঘরের বাতাস গরম হয়। গরম বাতাস হাল্কা হ'য়ে ছাদের দিকে ওঠে, ভেন্টিলেটার দিয়ে বেরিয়ে যায়, দরজা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢোকে।

পরিচলন ও পরিবহণ ছাড়াও তাপ চলাচল করে আর এক পদ্ধতিতে। কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ পরিচালিত হয় পরিচলন নিয়মে, তরল ও বায়বীয় পদার্থে পরিবহণ নিয়মে। অর্থাৎ পরিচলন ও পরিবহণ প্রক্রিয়ায় তাপ চলাচল করে কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ অবলম্বন করে। কিন্তু সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে কঠিন, তরল বা বাতাসের যোগ কোথায়? তাহ'লে সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসে কী করে? এখন বোঝা যাচ্ছে, জড় পদার্থের যোগাযোগ ছাড়াও তাপ চলতে পারে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসে বিকিরণ (radiation) পদ্ধতিতে, আলোর মতো। তাপ-রশ্মি ও আলোক-রশ্মিতে মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। এমন কি সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে তাপ-রশ্মির সাহায্যে ফোটো তোলা যায়। তাপরশ্মি ও ইন্‌ফ্রারেড আলো সম্বন্ধে ৩য় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

অধ্যায়—১৫

আলোক তরঙ্গ

প্রায় দু-হাজার বছর আগে মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া নগরে টলেমী (Ptolemy) আলোক রশ্মির গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করেন। টলেমী ছিলেন গণিতবিদ্ ও জ্যোতির্বিদ্। নানা রকম পরীক্ষা করে তিনি আলো চলাচলের কতগুলি সূত্র নিরূপণ করলেন : যেমন, সমতল আয়নায় আলো পড়লে সমান কোণে প্রতিফলিত হয়, উত্তল (convex) ও অবতল (concave) আয়না থেকে প্রতিফলিত হয় আর এক নিয়মে, জল বা কাচের মধ্যে আলোক রশ্মি প্রবেশ করলে আলোর পথ বেঁকে যায় (প্রতিসরণ বা refraction হয়)। টলেমী আলো চলাচলের কতকগুলি জ্যামিতিক নিয়ম মোটামুটিভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আলোর গতিবিধি নিয়ে ইউরোপে আরো সূক্ষ্ম মাপজোখ ও গবেষণা চলে। এই সময়ের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে স্নেল, গ্যালিলিও, নিউটন, কেপ্‌লার, ডেকার্টে এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এ পর্যন্ত আলোর গতিবিধি ছাড়া আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে কেউ কিছু সিদ্ধান্ত করতে পারন নি। নিউটনই সর্বপ্রথম এই প্রশ্নের সমাধান করতে অগ্রণী হলেন।

নিউটন প্রথমে মনে করেছিলেন আলোর একপ্রকার সূক্ষ্ম কণা আছে : আলোক কণা জ্বলন্ত বা উজ্জ্বল বস্তু থেকে চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু নিউটনের আলোক-কণা মতবাদ মেনে নিলে আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই কারণে তিনি কল্পনা করেছিলেন আলোক কণা বস্তুর মধ্য দিয়ে যায় না, যায় বস্তুর অণুর ফাঁকে ফাঁকে "ইথারের" মধ্য দিয়ে। নিউটনের কল্পনা অনুসারে ইথার একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম উপাদান, হয়তো বাতাসের মতো কিন্তু বাতাস নয়, আরো সূক্ষ্ম

আরো হাল্কা আরো সর্বদেশব্যাপী, মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। নিউটন বললেন ইথারই হ'লো আলোক কণার বাহন, আলোক কণা ইথারে সামান্য বাধা পায়। যে স্বচ্ছ বস্তু যত ঘন, মধ্যের ইথারের স্থান ততই অল্প। এই যুক্তিতে তিনি বললেন, আলোক কণা ঘন বস্তুর মধ্যে অধিক বেগে ছোটে, কারণ সেখানে ইথারের ভাগ অল্প, ইথারের বাধাও অল্প। এই ভাবে তিনি আলোর প্রতিসরণ (refraction) ব্যাখ্যা করলেন। মজার কথা এই যে, আলোকের কণাবাদ (corpuscular theory of light) প্রবর্তন করেও নিউটন ইথারের পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ইথারকে বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সর্বদেশ ব্যাপি ও স্থিতিস্থাপক বলে কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু স্পষ্টই বলেছিলেন "আলোক ইথার নয়, ইথারের কম্পনও নয়" ("light is neither aether nor its vibrating motion")।

নিউটনের সমসাময়িক হাইগেন্স্ (Huygens) আলোকের তরঙ্গবাদ (wave theory of light) প্রকাশ করলেন, এবং তা দিয়ে আলোকের প্রতিফলন, প্রতিসরণ ইত্যাদি খুব সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু সেসময় নিউটনের বিরাট ব্যক্তিত্ব প্রতিভার বলে তাঁর আলোক কণাবাদই সকলে গ্রহণ করল, হাইগেন্স্-এর তরঙ্গবাদ প্রাধান্য পেল না।

প্রায় দেড়শ বছর পরে হাইগেন্স্-এর আলোক-তরঙ্গবাদের জয় হ'লো টমাস ইয়ং (Thomas Young)-এর গবেষণালব্ধ প্রমাণ থেকে। টমাস ইয়ং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে হাইগেন্স্-এর তরঙ্গ মতবাদ সমর্থন ক'রে তাঁর গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞানী মহলে জানালেন। তরঙ্গবাদের সাহায্যে ইয়ং শুধু আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণই যথাযথ ব্যাখ্যা করলেন তা নয়, বললেন আলোক তরঙ্গধর্মী, ফলে দুটি আলোক-রশ্মির মিলনে অন্ধকার সৃষ্টি হ'তে পারে। কীভাবে দুইটি রশ্মির মিলনে স্থানে স্থানে উভয়ের বিনাশ বা ব্যতিকরণ (interference) হয়ে অন্ধকার সৃষ্টি হয় তাও তিনি দেখালেন, এবং এই পরীক্ষা থেকে বিভিন্ন রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিরূপ করলেন।

ব্যতিকরণই তরঙ্গ ধর্মের প্রকৃষ্ট পরিচয়। কাছাকাছি দুই কেন্দ্র হতে

তরঙ্গ উত্থিত করলে স্থানে স্থানে তারা এমন ভাবে মিলিত হয় যেখানে তরঙ্গের উত্থান পতন দেখা যায় না ঃ একের তরঙ্গচূড়া ও অন্যের তরঙ্গগর্ভ যেখানে যেখানে মিলিত হয় সেখানে সেখানে তরঙ্গ পরস্পর বিনষ্ট বা ব্যতিকৃত হয়।

আলোক রশ্মির ব্যতিকরণ কী ক'রে পরীক্ষা করা যায় তা একটু বলব। লয়েড পরিকল্পিত পদ্ধতির কথা প্রথমে ধরা যাক।
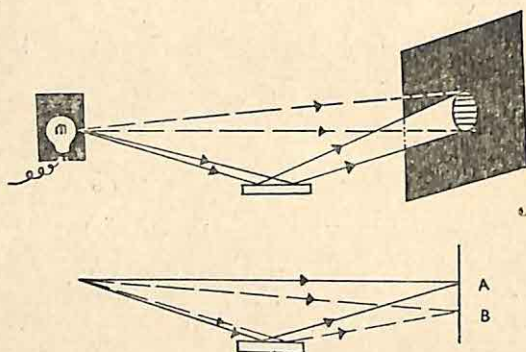
চিত্র—১৭ ঃ লয়েডের পদ্ধতিতে আলোর ব্যতিকরণ করা।

ছিদ্র দিয়ে আলো আসছে (১৭ নং চিত্র), আর আছে একটি ছোট সমতল আয়না, এবং একটি সাদা পট বা পর্দা। ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আলো পড়ছে সরাসরি পটের উপর, আবার কিছুটা প্রতিফলিত হ'য়ে আসছে আয়না থেকে। আলোর এই দুই পথ সমান নয়, ফলে পর্দার উপর যখন তারা মিলিত হচ্ছে, তাদের তরঙ্গগুলি একটু এগিয়ে পিছিয়ে পড়ছে। ছিদ্র দিয়ে দুই পথ ধরে যে আলো পটের উপর পড়ছে তারা খুব ছোট বিন্দু নয়, ছোট চাকতির মতো, একটির উপর অন্যটি পড়েছে। আলোর চাকতির বিভিন্ন স্থানে দুই পথের আলোক তরঙ্গ কম বেশী অগ্রপশ্চাৎ হ'য়ে মিশছে। যেখানে একের তরঙ্গচূড়া অন্যটির তরঙ্গ গর্ভের সঙ্গে মিশছে, সেখানে দুই পথের আলোর ব্যতিকরণ হয়ে অন্ধকার হবে (A)। আবার একটু পাশেই দুই পথের আলো তরঙ্গ চূড়ায় মিশছে, সেখানে আলোর জোর বেড়ে যাবে (B)। এইভাবে দুই আলোর ব্যবধান অনুসারে পটের উপর একের পর এক অন্ধকার, আলো, অন্ধকার, আলো···এইভাবে দাগ দেখা যাবে। পর্দা

সরিয়ে সেখানে আতস দিয়ে দেখলে আলো-অন্ধকারের আঁজি আঁজি সুন্দর ভাবে দেখা যাবে। এদের বলে ব্যতিকরণ রেখা (interference lines)।

ছিদ্র আয়না ও পট একই ভাবে রেখে যদি ছিদ্র পথে একবার বেগুনী, একবার নীল, একবার সবুজ, একবার লাল আলো দেওয়া যায় তাহ'লে ব্যতিকরণ রেখার মধ্যে ব্যবধান ছোট থেকে বড় হতে দেখা যাবে। বেগুনী আলো ব্যবহার করলে ব্যতিকরণ রেখাগুলির ব্যবধান হবে সবচেয়ে ছোট, অর্থাৎ দাগগুলি খুব কাছাকাছি হবে। নীল আলো ব্যবহার করলে হবে একটু দূরে দূরে, সবুজ আলোতে আরও একটু দূরে দূরে, লাল আলোতে আরও ফাঁক ফাঁক হয়ে ব্যতিকরণ রেখা দেখা যাবে। কারণ বেগুনী আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট, নীলের একটু বড়, সবুজের আরও একটু বড়, লাল আলোর আরো বড় তরঙ্গ। এখন ব্যতিকরণ রেখাদের ব্যবধান, এবং ক, খ, গ'র দূরত্বের মাপ নিলে তা থেকে যে কোন রঙের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব করে বলে দেওয়া যায়।

কোন একটি বিশেষ রঙের আলো ব্যবহার না করে যদি সাদা আলো ছিদ্রপথে ব্যবহার করা যায় তাহ'লে পটের উপর ব্যতিকরণ রেখার প্রত্যেকটিই রামধনুর মতো রঙ্গীন দেখাবে, কারণ সাদা আলোর মধ্যে নানান রঙ মিশে আছে এবং পটের উপর তাদের ব্যতিকরণ রেখার স্থান ভিন্ন ভিন্ন। এইভাবে ব্যতিকরণ বর্ণালী তৈরী হয়।

আরো নানা উপায়ে আলোর ব্যতিকরণ রেখা উৎপন্ন করা যায়। কাচখণ্ডের উপর খুব ঘন ক'রে সরু সরু দাগ কাটলে সেটা হ'য়ে দাঁড়ায় রেখাজাল (line grating)। রেখাজালের মধ্য দিয়ে আলো গেলে অন্য দিকে আলোর ব্যতিকরণ রেখা বা ব্যতিকরণ বর্ণালী সৃষ্টি হয়। এই রেখাগুলি কত ঘন সন্নিবেশিত তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। প্রতি ইঞ্চিতে ৫০০ বা ১০০০ বা আরো বেশি দাগ থাকে। কাচের উপর হীরক সূচী (diamond point) দিয়ে এই দাগ কাটা হয়। দাগগুলি হতে হবে সমান্তরাল এবং সমান ব্যবধানে। হাতে ধরে এরকম দাগ কাটা অসম্ভব। এরজন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্র আছে।

আলোক কিরণ যখন রেখাজালের উপর পড়ে তখন প্রত্যেকটি রেখায়

বাধা পেয়ে আলোর তরঙ্গ নতুন করে সৃষ্টি হয়। এই হাজার হাজার তরঙ্গ বিপরীত দিকে বেরিয়ে ব্যতিকরণ ছত্র তৈরী করে। যেখানে যেখানে ঐ তরঙ্গগুলি সমকলায় (equal phase) মেশে, সেখানে হয় উজ্জ্বল, আর
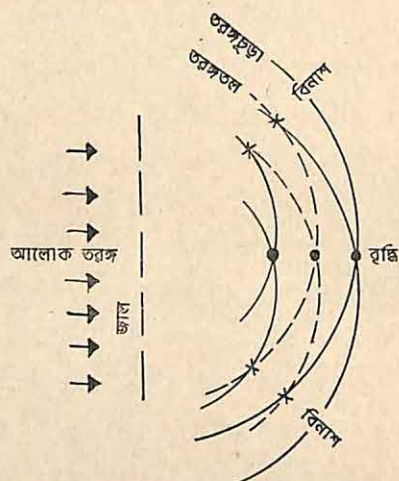
চিত্র—১৮ : সূক্ষ্ম রেখাজাল দিয়ে আলোর ব্যতিকরণ করা।

যেখানে যেখানে বিপরীত কলায় (opposite phase) মেশে সেখানে তারা বিনষ্ট বা ব্যতিকৃত হয়ে অন্ধকার সৃষ্টি করে। ব্যতিকরণ রেখাদের পরস্পর ব্যবধান, রেখাজালের ঘনত্ব প্রভৃতি পরিমাপ ক'রে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপা যায়।

ব্যতিকরণ পরীক্ষা থেকে আলোকের তরঙ্গ ধর্ম প্রমাণিত হওয়ার পর আর একটি প্রশ্ন ওঠে। আলোক কিসের তরঙ্গ? জলে ঢিল ফেললে জলে তরঙ্গ ওঠে। ঘণ্টায় ঘা দিলে ঘণ্টার কাঁপুনি থেকে বাতাসে তরঙ্গ ওঠে, সেই বাতাসের তরঙ্গ কানে ঢুকলে শব্দ শুনি। কিন্তু আলোক তরঙ্গ চলাচল করতে জলের দরকার হয় না, বাতাসের দরকার হয় না। সূর্য, নক্ষত্র থেকে আলো আসে, মাঝে জল নেই, বাতাস নেই, কোন জড়বস্তু নেই। আলোক তরঙ্গ তাহ'লে জড়বস্তুর তরঙ্গ নয়।

এই কারণে বৈজ্ঞানিকরা প্রথমে ইথার নামে সূক্ষ্ম বস্তুর কল্পনা করেছিলেন। বলতেন, আলো ইথারের তরঙ্গ। কিন্তু এই রকম সূক্ষ্ম,

ভারহীন, রূপ-রস-গন্ধ বিহীন স্থিতিস্থাপক (elastic) ইথারের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকদের নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যাক্সওয়েল ও হার্ৎজ (Hertz) প্রমাণ করলেন আলোক রশ্মিতে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের বল নিহিত এবং এই বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক বল তরঙ্গের মতো হ্রাসবৃদ্ধিশীল। এটা ম্যাক্সওয়েল প্রবর্তিত আলোকের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ মতবাদ (electromagnetic wave theory of light) নামে খ্যাত। বেতার তরঙ্গ, তাপ-কিরণ, আলোক রশ্মি, এক্সরে প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। ম্যাক্সওয়েল ও হার্ৎজ-এর গবেষণা থেকে আলোক বিজ্ঞানের এক নূতন যুগ আরম্ভ হ'লো। বেতারের সূচনাও এই থেকে।

অধ্যায়—১৬

চুম্বক ও বিদ্যুৎ

এক জাতীয় পাথর আছে যে গুলি স্বভাবতই চুম্বক ধর্মী, লোহা টানতে পারে। এরকম চুম্বক পাথর লোহার খনিতে অনেক পাওয়া যায়। লোহার খনিতে লোহার তাল থাকে না, লোহা একপ্রকার খনিজ পাথরের মধ্যে লৌহ-অক্সাইড ভাবে মিশে থাকে। এই খনিজ পাথর গলিয়ে লোহা বার করা হয়। যাই হোক, চুম্বক-পাথরের আকর্ষণ শক্তি খুবই অল্প। আজকাল নানা জাতীয় ইস্পাত দিয়ে জোরালো চুম্বক তৈরী করা হয়। ভাল ইস্পাতের ছুরিতে বা ছুঁচে চুম্বক ঘষলে সেগুলিও বেশ কিছু দিনের মতো চুম্বক হয়ে দাঁড়ায়। বাজারে সস্তায় নানা রকম চুম্বক কিনতে পাওয়া যায়, কোনটি বাঁকানো ঘোড়ার নালের মতো (horse-shoe magnet), কোনটি সোজা (bar magnet)।

চুম্বক খণ্ডের দুই মুখে দু-রকম আকর্ষণ শক্তি। এটা প্রমাণ করা যায় সহজেই। দুটি সোজা ইস্পাতের চুম্বক নিয়ে একটার মুখে অন্যটার মুখ ঠেকালাম, দেখলাম পরস্পরকে টানছে। এবার একটাকে ঘুরিয়ে অন্য মুখ ঠেকালাম, এবার টানছে না : শুধু টানছে না তা-ই নয়, পরস্পরকে ঠেলছে। টানাকে বলে আকর্ষণ (attraction), ঠেলাকে বলে বিকর্ষণ (repulsion)। চুম্বকের বিকর্ষণ সহজে বোঝা যায় না। ইস্পাতের চুম্বক-খণ্ডগুলি ভারী, তাই টেবিলের ওপর একটা রেখে অন্যটাকে হাতে ধারে কাছে আনলে বিকর্ষণে সরে যেতে পারে না। বিকর্ষণ দেখতে হলে একটু ব্যবস্থা করতে হবে। একটু চুম্বকখণ্ডকে মাঝামাঝি সুতায় বেঁধে অনুভূমিক (horizontal) ভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া যাক (চিত্র—১৯)। এ অবস্থায় খুব সহজেই নড়তে চড়তে পারবে। এবার অন্য চুম্বক কাছে আনলে একদিকে আকৃষ্ট হয়ে ঘুরে এগিয়ে আসবে। অন্যদিক হলে বিকৃষ্ট হয়ে দূরে দূরে সরে যাবে, এই দুটি মুখ কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।

আর একটু ব্যাপার দেখা যাবে। ঝোলানো চুম্বকখণ্ডটি সর্বদাই উত্তর-দক্ষিণ মুখে ঘুরে থাকবে। অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেও আবার নিজেই ঘুরে
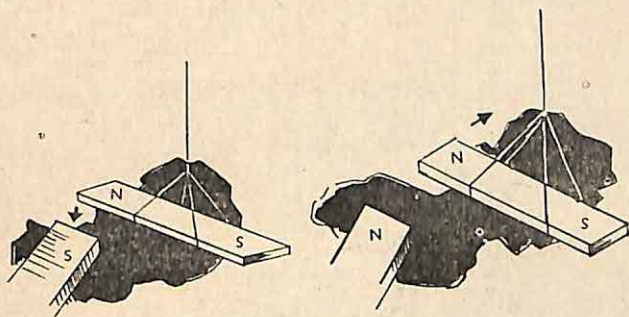
চিত্র—১৯ : দুই চুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ।

উত্তর-দক্ষিণ হয়ে থাকবে। এই নিয়মে চুম্বকের দিক্-নির্ণয় যন্ত্র (magnetic compass) তৈরী হয়।

আর একটি সহজ উপায় বলি। একটি সূচ নিয়ে চুম্বকের সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘষলে সূচটি চুম্বকে পরিণত হবে। শিশির কর্কের ছিপির একটা ছোট টুকরো কেটে চুম্বক সূচটি বিঁধিয়ে দিলাম, কর্কটা সূচের মাঝামাঝি আনলাম। কর্ক-বেঁধান সূচটি এখন বাটির জলে ভাসবে, সহজেই এদিক ওদিক ঘুরতে পারবে। এবারও দেখা যাবে চুম্বক সূচটি উত্তর-দক্ষিণ মুখে ঘুরে এসে দাঁড়াচ্ছে। এই-ভাবে সহজেই দিক নির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাস তৈরী করা গেল। এবার একটি চুম্বক সূচের এক মাথার কাছে আনলে চুম্বকের দিকে এগিয়ে আসবে (আকর্ষণ), অন্য মাথার কাছে আনলে দূরে সরে যাবে (বিকর্ষণ)।

চুম্বকের যে মাথা উত্তর দিকে থাকতে চায় তাকে বলে চুম্বকের উত্তর-মেরু, অন্য মাথাকে বলে চুম্বকের দক্ষিণ মেরু। এই ভাবে পরীক্ষা করে চুম্বকের মাথায় 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' চিহ্ন দিয়ে নেওয়া যায়। সাধারণতঃ যে সব চুম্বক কিনতে পাওয়া যায় তাদের মাথায় N (North) ও S (South) অক্ষর খোদাই করা থাকে। এখন দেখা যাবে, দুটি

চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু কাছাকাছি আনলে পরস্পরকে আকর্ষণ করছে, কিন্তু উত্তর-উত্তর বা দক্ষিণ-দক্ষিণ কাছে আনলে বিকর্ষণ করছে। অর্থাৎ বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ ও সম-মেরুতে বিকর্ষণ হয়।
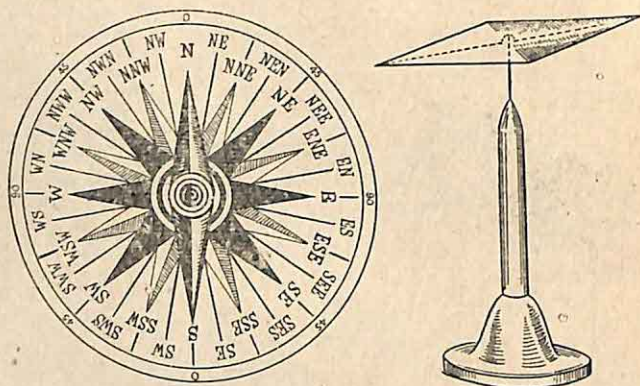
চিত্র—২০ : চুম্বকের দিক্ নির্দেশক কম্পাস।

চুম্বকখণ্ড আলগা ভাবে ঝুলিয়ে রাখলে (বা ভাসিয়ে রাখলে) কেন উত্তর-দক্ষিণ মুখে ঘুরে থাকতে চায়? কারণ, গোটা পৃথিবীটাই চুম্বক ধর্মী। পৃথিবীটা একটি বিরাট চুম্বক, যদিও এই চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি সামান্য।

সেলুলয়েডের চিরুনি কাপড় দিয়ে ঘষলে ছোট ছোট কাগজের টুকরা টানতে পারে। মাথার চুল শুক্‌নো থাকলে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানোর সময় চড়চড় শব্দ হয়। শীতকালে বাতাসও শুক্‌নো থাকে, সে সময়ই এটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায়। কয়েকবার চুলের মধ্য দিয়ে চিরুনি চালিয়ে মাথার কাছে চিরুনি ধরলে চুল খাড়া হ'য়ে চিরুনির সঙ্গে লেগে থাকতে চায়। অনেকটা চুম্বকের মতো, কিন্তু চিরুনি ঘষলে চুম্বক হয় না। ঘষা চিরুনির সেলুলয়েডে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না, সেপুলয়েডের গায়েই ছড়িয়ে থাকে। এর নাম স্থিতি বিদ্যুৎ (static electricity)। কাচ-খণ্ডকে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষলেও স্থিতি বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় এবং হাল্কা জিনিসের টুকরো টানতে পারে। সেলুলয়েড, অন্যান্য প্লাস্টিক, কাচ ইত্যাদিকে কাপড়, সিল্ক বা পশম দিয়ে ঘষলে যে স্থিতি বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় সেটা ধীরে ধীরে

বাতাসে বেরিয়ে যায়, কারণ বাতাসে জলীয় বাষ্প কিছু না কিছু পরিমাণে থাকে। জলীয় বাষ্প বিদ্যুতের পরিচালক (conductor of electricity)। আবার হাত দিলেও হাতের মধ্য দিয়ে এই বিদ্যুৎ নিক্রান্ত (discharged) হয়ে মাটিতে চ'লে যায়।

ম্যাক্সওয়েল ও ফ্যারাডে অনুমান করেন চুম্বক ও বিদ্যুতের উপস্থিতিতে চতুর্দিকে এক প্রকার বলক্ষেত্র (field of force) সৃষ্টি হয়, বলক্ষেত্র যেন অসংখ্য বলরেখার (lines of force) সমষ্টি। যেন অদৃশ্য অক্টোপাশের অসংখ্য হাত-পা। এই বলক্ষেত্রের মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু এলেই অদৃশ্য বলরেখাগুলি টানা রবারের সুতোর মতো সঙ্কুচিত হয়ে কাছে টেনে নিতে চায়। চুম্বকের সর্বদাই দুটি মেরু, যাকে চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বলা হয়। সোজা কাঠির মতো চুম্বক খণ্ডের (bar magnet) দুই সীমায় দুই মেরু ; ঘোড়ার নালের মতো বাঁকানো চুম্বকের (horse-shoe magnet)
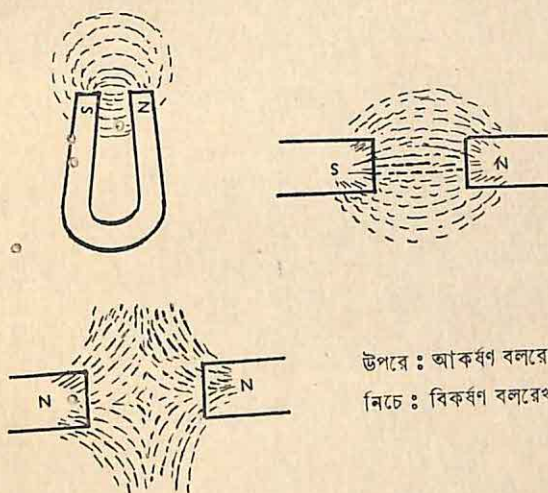
চিত্র—২১ : চুম্বকের বলরেখা।

দুই মেরু তাই পাশাপাশি এসে পড়ে। চুম্বকের বলক্ষেত্র ও বলরেখার এক চাক্ষুস চিত্র সহজেই পাওয়া যায়। একখণ্ড চুম্বকের উপর কাগজ বিছিয়ে ওপর থেকে লোহাচুর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিলে দেখা যাবে লোহাচুরের

কণাগুলি লাইন লাইন বেঁধে চুম্বকের উত্তর-দক্ষিণ মেরু যুক্ত করছে, অর্থাৎ অদৃশ্য চুম্বকবলরেখা ধরে তারা সাজিয়ে পড়ছে। চিত্র—২১ দ্রষ্টব্য।

স্থির বিদ্যুতের চারিধারেও এমনি বিদ্যুৎ বলরেখা সৃষ্টি হয়। চুম্বকের সমমেরুর (উত্তর-উত্তর বা দক্ষিণ-দক্ষিণ) মধ্যে যেমন বিকর্ষণ এবং বিপরীত মেরুর মধ্যে যেমন আকর্ষণ হয়, সহধর্মী বিদ্যুতের (পজিটিভ-পজিটিভ বা নেগেটিভ-নেগেটিভ) মধ্যেও তেমনি বিকর্ষণ এবং অসহধর্ম্মী বিদ্যুতের মধ্যে আকর্ষণ হয়।

প্রায় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শুধু স্থির-বিদ্যুতের কথাই জানা ছিল। তারের মধ্যে দিয়ে চল-বিদ্যুৎ বা প্রবাহ-বিদ্যুৎ (current electricity) পরিচালনা করে আলো জ্বালানো, পাখা চালানো…এসব কেউ জানতো না, ভাবতেও পারে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গ্যালভানি (Galvani) লক্ষ্য করলেন মরা ব্যাঙের গায়ে জোরালো স্থির-বিদ্যুৎ ছোঁয়ালে মরা ব্যাঙের হাত পা চম্‌কে ওঠে। বিদ্যুৎ ছোঁয়ালে মাংসপেশী মধ্যে টান ও সংকোচন এলে এই আক্ষেপ (spasm) সৃষ্টি করে। এই ব্যাপারকে সে-যুগে নাম দেওয়া হয়েছিল জান্তব-বিদ্যুৎ (animal electricity)। এই বিষয় নিয়ে তখন খুব গবেষণা চলতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যেই ভল্টা (Volta) দেখলেন দুইটি বিভিন্ন ধাতুর (লোহা, তামা) তার ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা যায় এবং এই বিদ্যুৎ দিয়েও মাংসপেশীতে সংকোচন বা আক্ষেপ আনা যায়। ভল্টা ভাবতে লাগলেন কী ক'রে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহারে জোরালো বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা যায়। অবশেষে তিনি উপায় বার করলেন। তামা ও দস্তার (zinc) চাদর থেকে অনেকগুলি চাক্তি কেটে তৈরী করলেন। এই মাপে ব্লটিং কাগজের চাক্তি কেটে লবণ জলে ভিজিয়ে নিলেন। এবার তামার এক চাক্তির ওপর একটা লবণ-জলে ভেজা ব্লটিং কাগজ রেখে তার ওপর দস্তার চাক্তি রাখলেন। তার ওপর আবার আর একটি ভেজা ব্লটিং কাগজ, তার ওপর তামার চাক্তি… এইভাবে উপর্যুপরি সাজিয়ে গেলেন। এই হ'লো বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন করবার প্রথম ব্যাটারি। এর নাম দেওয়া হ'লো ভল্টার স্তম্ভ (voltaic pile)। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে প্রবাহ বিদ্যুতের সূচনা হয়।

ভল্টার নাম অনুসারে প্রবাহ-বিদ্যুৎকে (current electricity) অনেক সময় ভল্টীয়-বিদ্যুৎ (voltaic electricity) বলা হয়ে থাকে। ভল্টীয় স্তম্ভের উপর নিচের দস্তা ও তামার চাক্তির সঙ্গে তার যোগ করে. দিলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে।

ভল্টার কাছ থেকে প্রবাহ-বিদ্যুতের উৎস পেয়ে বিজ্ঞানিরা তা দিয়ে নানাপ্রকার পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ওরস্টেড লক্ষ্য করলেন বিদ্যুৎবাহী তারের কাছে দিক্‌দর্শনের স্থচী (কম্পাস) আনলে স্থচীটি তারের সমকোণে বা আড়াআড়ি ঘুরে থাকতে চায়। ফরাসী বৈজ্ঞানিক আম্পিয়ার (Ampere) এই দেখে খুব আকৃষ্ট হলেন এবং চুম্বক স্থচীর উপর বিদ্যুৎ-প্রবাহের প্রভাব সম্পর্কে নিয়মাদি নির্ণয় করলেন। একটা ব্যাপার বোঝা গেল, তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হ'লে তারের চতুর্দিকে চুম্বক বল স্থষ্টি হয়, তারই প্রভাবে কম্পাসের চুম্বক স্থচী ঘোরে। কিন্তু চিরুনিতে ঘষা স্থির বিদ্যুতের কাছে কম্পাস আনলে কিছুই হয় না।

মাইকেল ফ্যারাডের মনে একটা প্রশ্ন জাগল : বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে যদি চুম্বক-বল উৎপন্ন হয়, তাহ'লে চুম্বকের উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হবে না কি ? ফ্যারাডে মনে করতেন প্রকৃতির মধ্যে সর্বদাই কার্য-কারণের পরিপূরক ব্যবস্থা আছে : কারণ (cause) হ'লে যেমন তার ফল (effect) আসবে, তেমনি ফল দেখতে পেলে তার কারণও খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই তিনি ভাবতে লাগলেন, চুম্বক দিয়েও বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন করা যাবে।

ফ্যারাডে এই পরীক্ষা নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। তারচক্রের (circuit) পাশে চুম্বক রেখে নানা ভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন ফ্যারাডে। চুম্বক খণ্ডকে কখনো তারচক্রের মাঝে, কখনো এপাশে, কখনো ওপাশে,—নানা যায়গায় রাখেন, কিন্তু কিছুতেই তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয় না। এই ভাবে পাঁচ বছর কেটে গেল। কিন্তু ফ্যারাডে আশা ছাড়লেন না। পরীক্ষা গবেষণা চলতে লাগল তার কুণ্ডলী আর চুম্বক খণ্ড নিয়ে। অবশেষে ফ্যারাডে সফল হলেন।

ফ্যারাডে দেখলেন, তারচক্রের কাছে চুম্বক এনে বসিয়ে রাখলে তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয় না, চুম্বকটি যতই শক্তিশালী হোক না কেন। তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রণোদিত (induce) করতে হলে চুম্বক বলের অস্থিরতা চাই, চুম্বককে নাড়াতে হবে, অথবা চুম্বককে স্থির রেখে তার চক্রকে নাড়াতে হবে।
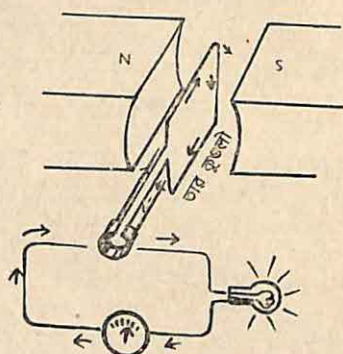
চিত্র—২২ : বিদ্যুৎ উৎপাদক ডায়নামো।

বাস্তবিক এই হলো ডায়নামো বা বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্রের মূল নীতি। একাধিক চুম্বক-মেরুর মধ্যে তারকুণ্ডলী (armature) সবেগে ঘোরালে তার-কুণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, এই প্রবাহ অন্য তারের মধ্য দিয়ে বাইরে নিয়ে আসা যায়। এইরকম ডায়নামোর সাহায্যে এত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় যে গোটা শহরে আলো, পাখা, কলকারখানার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়।

স্বল্প পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহ পাওয়া যেতে পারে বৈদ্যুতিক কোষ (electric cell) থেকে। সালফিউরিক এসিডের মধ্যে তামা ও দস্তার পাত ডোবালে একরকম বৈদ্যুতিক কোষ তৈরী হয়। ঐদুটি পাতের মাথা থেকে তার যুড়ে দিলে তামার পাত থেকে দস্তার পাতের দিকে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলবে। এই

ধরণের সেল মোটর গাড়ীর ব্যাটারীতে ব্যবহার হয়। অনেকগুলি কোষ বা সেল যুড়ে বড় করলে তাকে বলে বৈদ্যুতিক ব্যাটারী। মোটর গাড়ীর ব্যাটারীর এক একটি সেলে প্রায় ২ ভোল্ট চাপের বিদ্যুৎ হয়। তিনটি সেল পাশাপাশি যুড়ে ৬ ভোল্টের ব্যাটারী হয়, ৬টি যুড়লে ১২ ভোল্টের ব্যাটারী হয়। মোটর গাড়ীর ব্যাটারীতে মধ্যে মধ্যে যে এসিড ঢালতে হয় সেটা
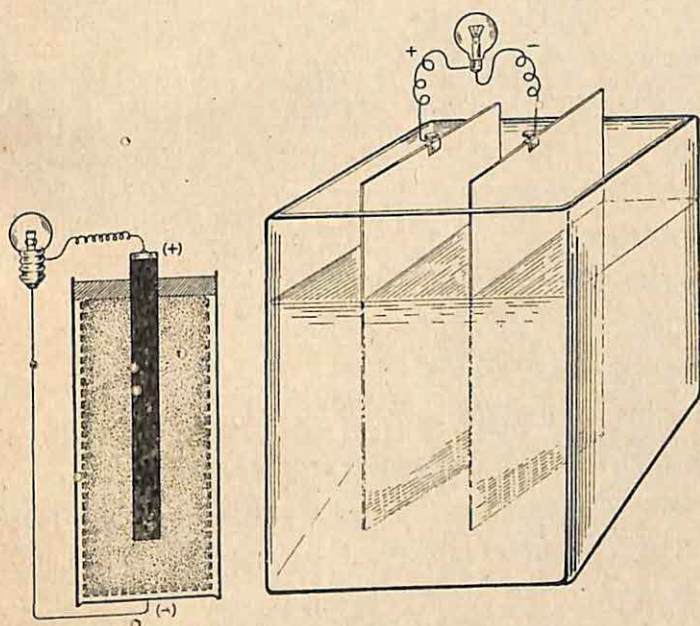
চিত্র—২৩ : বৈদ্যুতিক কোষ বা সেল।

সালফিউরিক এসিড। কিন্তু টর্চলাইটের সেল ঠিক ও ধরনের নয়। তরল সালফিউরিক এসিডের বদলে গুঁড়ো রাসায়নিক মশলা ব্যবহার করা হয়।

তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহকে নলের মধ্যে জলপ্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জলপ্রবাহ সৃষ্টি করতে যেমন জলের চাপের প্রয়োজন হয়,

বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করতেও তেমনি বৈদ্যুতিক চাপের প্রয়োজন। চাপ ভিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় না। বৈদ্যুতিক চাপের পরিমাণ ভোল্ট (volt) অনুসারে মাপা হয়। ভল্টার নামে ভোল্ট কথাটি নেওয়া হয়েছে। এক একটি রাসায়নিক বিদ্যুৎ কোষ ১ থেকে ২ ভোল্ট অবধি বৈদ্যুতিক চাপ পাওয়া যায়, কোষ যুড়ে যুড়ে ব্যাটারীতে ভোল্ট বাড়িয়ে নেওয়া যায়। বাড়ীর পাখা ও আলোর জন্য ২২০ বা ১১০ ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়, এই বিদ্যুৎ আসে পাওয়ার হাউসের ডায়নামো থেকে। কলকাতার ট্রাম গাড়ী চলে ৪৪০ ভোল্টের বিদ্যুতে। মানুষের পক্ষে ৪৪০ ভোল্ট অতীব মারাত্মক, ২২০ ভোল্টের বিদ্যুতে শক্ লেগেও মৃত্যু ঘটতে পারে এবং ঘটেছেও। এই কারণে কোন কোন দেশে (আমেরিকা, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি) বাড়ীর আলো, পাখা ও রান্নার বিদ্যুৎ-ষ্টোভের জন্য ১১০ ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়। ১১০ ভোল্টেও মারাত্মক শক্ লাগতে পারে, তবে এমন দুর্ঘটনা খুব কমই হয়। অধিক ভোল্ট চাপে বেশী পরিমাণ বিদ্যুৎ শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'লে সমস্ত দেহের মাংসপেশী ও হৃদপিণ্ড ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হয়। এই কারণে রক্ত চলাচল ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে।

বিদ্যুৎ চাপ যেমন ভোল্ট অনুসারে মাপা হয়, বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ তেমনি মাপা হয় 'আম্পিয়ার' দিয়ে। যেখানে ২২০ ভোল্টের বিদ্যুৎ, সেখানে ১০০০ ওয়াটের স্টোভের (হিটারের) তারের মধ্য দিয়ে প্রায় সাড়ে চার আম্পিয়ার বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে। 'ভোল্ট' হ'লো বিদ্যুৎ চাপের মান, 'আম্পিয়ার' বিদ্যুৎ প্রবাহের মান, 'ওয়াট' হ'লো বিদ্যুৎ ক্ষমতার (electric power) মান। ভোল্ট, আম্পিয়ার ও ওয়াট তিনটি শব্দই তিনজন নামকরা বিদ্যুৎ বিজ্ঞানীদের নাম থেকে নেওয়া হয়েছে।

জলপ্রবাহের মধ্যে যেমন জলের অণুর গতি, বিদ্যুৎপ্রবাহের মূলেও কি কোন রকম 'বিদ্যুৎ অণুর' গতি আছে? না হলে বিদ্যুৎপ্রবাহ কিসের প্রবাহ? বাস্তবিক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যুৎ কণার সন্ধান পাওয়া গেল, এদের বলে ইলেকট্রন (electron)। ইলেকট্রন সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। বৈদ্যুতিক চাপ বা ভোল্টের প্রভাবে তারের ধাতুর মধ্যের ইলেকট্রন-গুলি ছুটে চলতে থাকে: এই হলো বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রকৃত রূপ।

কত ভোল্ট চাপে কত আম্পিয়ার বিদ্যুৎপ্রবাহ (কারেন্ট) তারের মধ্য দিয়ে যাবে সেটা নির্ভর করছে তারের বাধা দেবার ক্ষমতার ওপর। ভোল্ট সমান থাকলে যে তারে বৈদ্যুতিক বাধা (electrical resistance) যত কম সেই তারের মধ্য দিয়ে তত বেশী আম্পিয়ার কারেন্ট যাবে। তারের বৈদ্যুতিক বাধা সরু মোটা বা ছোট বড়র ওপর নির্ভর করে। মোটা তারে বাধা কম, সরু তারে বেশী, যেমন মোটা নলের মধ্য দিয়ে সহজে বেশী জল যেতে পারে, সরু নলে জল বেশী বাধা পায়। তার যত লম্বা হবে, বাধাও সেই অনুপাতে বেশী হবে। এটাও জলের নলের সঙ্গে তুলনা করা যায়ঃ নল বেশী লম্বা হলে জল চলতে কষ্ট হয়। বিদ্যুতের বাধা যথেষ্ট নির্ভর করে তারের ধাতুর ওপর। সমান মাপের তার হলে তামার তারের তুলনায় লোহার তারে প্রায় ৬ গুণ বৈদ্যুতিক বাধা, ইস্পাতের তারে ৮ থেকে ৯ গুণ, সীসের (lead) তারে ১২ গুণ। ইলেকট্রিক হিটারে যে প্যাঁচানো তার আগুনের মতো লাল হয়ে গনগন করে সেই তারের বৈদ্যুতিক বাধা (resistance) তামার তারের তুলনায় প্রায় ৬০ গুণ। এই তারের নাম 'নিক্রোম' তার। নিক্রোম (nichrome) ধাতু একপ্রকার মিশ্র-ধাতু (alloy), নিকেল ও ক্রোমিয়াম ধাতু মিশিয়ে তৈরী করা হয়, তাই নাম দেওয়া হয়েছে নিক্রোম।

তামার বাধা খুব সামান্য, এই কারণে বিদ্যুৎবাহী তার সচরাচর তামার হয়। তামার দামও খুব বেশী না। কিন্তু তামার চেয়ে এ্যালুমিনিয়াম সস্তা, বৈদ্যুতিক বাধাও খুব বেশী না, তামার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। বাড়ীর মধ্যে বিদ্যুতের জন্য তামার তার ব্যবহার হয়, কিন্তু বাইরে যেখানে মাইলের পর মাইল মোটা তারের মধ্য দিয়ে বিজলী সরবরাহ করা হয় সেখানে তামার তারে অনেক খরচ পড়ে। এই কাজের জন্য আজকাল তামা-এ্যালুমিনিয়ামের মিশ্রধাতুর তার ব্যবহার হচ্ছে।

তামার বৈদ্যুতিক বাধা অল্প, একথা বলেছি। অন্য ভাবে বলা যায়, তামা বিদ্যুতের সুপরিচালক (good conductor of electricity)। ধাতুর মধ্যে তামাই যে সবচেয়ে সুপরিচালক তা নয়। রুপো ও সোনা আরো ভাল পরিচালক।

বিভিন্ন ধাতুর বৈদ্যুতিক বাধা নিচের তালিকায় দেওয়া হ'ল।

ধাতু	বৈদ্যুতিক বাধা
সোনা	১·৪
রুপো	১·৬
তামা	১·৭
এ্যালুমিনিয়াম	২·৮
নিকেল	৭·২
পিতল	৮·০
লোহা	৯·৮
প্ল্যাটিনাম	১০·৫
ইস্পাত	১৫·০
সীসা (lead)	২০·৬
পারা (পারদ)	৯৫·৮
নিক্রোম	১০০·০

ধাতু মাত্রেই বিদ্যুতের পরিচালক, তবে কোন ধাতু একটু কম কোন ধাতু একটু বেশী পরিচালক। কিন্তু রেশম, পশম তুলা, কাচ, কাঠ (শুষ্ক অবস্থায়), রবার, গাটাপার্চা, সেলুলয়েড, বায়ু (শুষ্ক) প্রভৃতি বিদ্যুতের অপরিচালক (non conductor)। এই জন্য যাঁরা বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করেন তাঁরা কাঠের টুল, রবারের বা প্লাষ্টিকের আবরণ দেওয়া যন্ত্রপাতি (প্লায়ার্স, স্ক্রু ড্রাইভার ইত্যাদি) ব্যবহার করেন। বিদ্যুৎবাহী তার রবারের বা সুতার আবরণে ঢাকা থাকে যাতে তারের বিদ্যুৎ হাতে না লাগে।

বিদ্যুৎকে কী কী কাজে লাগানো হয় এবার তা দেখা যাক :

(১) তাপ ও আলোক উৎপাদন। বাধাযুক্ত তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হ'লে তাপ উৎপন্ন হয়। ইলেকট্রিক স্টোভ বা হিটারে নিক্রোম তারের কুণ্ডলী থাকে, এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চললে তেতে লাল হয়ে ওঠে। বিজলী বাতির মূল কথাও এই তাপ। কাচের ফানুষটির (bulb) মধ্যে একটা সরু তার আছে, বিদ্যুৎ গেলে সেটা এত গরম হয় যে লাল না হয়ে চোখ ধাঁধানো সাদা হয়ে ওঠে, তা থেকেই আলো আসে।

(২) চুম্বকশক্তি উৎপাদন। বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে অতি শক্তিশালী চুম্বক তৈরী করা যায়। লোহা বা ইস্পাত খণ্ডের ওপর বিদ্যুৎবাহী তার জড়ানো হয় অনেক প্যাঁচ দিয়ে,এই তার খোলা তার নয়,সুতার আবরণ দেওয়া তার। এবার তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালালে মধ্যের লোহা বা ইস্পাত খণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হবে। বিদ্যুৎ বন্ধ করলে চুম্বকত্ব চলে যাবে। একে বলে বৈদ্যুতিক চুম্বক (electro magnet)। এরকম চুম্বক খুব শক্তিশালী করা যায়। বড় বৈদ্যুতিক চুম্বক দু-দশ মণ ভারী লোহার জিনিস টেনে ওঠাতে পারে। বড় বড় লোহার কারখানায় জিনিসপত্র ওঠাতে এরকম বৈদ্যুতিক চুম্বকের ক্রেন (crane) ব্যবহার হয়। ক্রেনগাড়ী কারখানার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। লোহা সরাতে হলে তার ওপর ক্রেনের বৈদ্যুতিক চুম্বক নামিয়ে দেওয়া হয়। এবার সুইচ্ টিপলেই চুম্বক খণ্ডটি লোহার জিনিসটাকে টেনে ধরে। এইভাবে তাকে উঠিয়ে নিয়ে ক্রেন চলে যায় যেখানে রাখবার। সেখানে নামিয়ে সুইচ্ বন্ধ করে দিলেই লোহার জিনিসটা চুম্বক থেকে ছাড়া পেয়ে যায়। এতে কতো সুবিধা। ক্রেনের আংটার সঙ্গে শিকল দড়ি দিয়ে জিনিস বাঁধাছাদার হাঙ্গামা নেই।

(৩) যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন। পাখা, ট্রামগাড়ী, বৈদ্যুতিক ট্রেন, জলের পাম্প ইত্যাদি চালাতে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার হয়। টেলিফোন, টেলিগ্রাফও বিদ্যুতের কারসাজি। মানুষের সুখ সুবিধা বাড়াতে বিদ্যুতের সমতুল আর কী আছে ?

(৪) রাসায়নিক শক্তি। বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে রাসায়নিক সংযোগ ও বিশ্লেষণ সাধন করা যায়। জলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলে জলের উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পৃথক হয়ে পড়ে। আর হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস দুটি মিশিয়ে বিদ্যুৎ স্ফুরণ (electric spark) করলে জলে পরিণত হয়। খনিজ পাথর থেকে ধাতুনিষ্কাশন করতে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। এলুমিনিয়ামের খনিজ পাথরের নাম বক্সাইট (bauxite)। বক্সাইট থেকে এ্যালুমিনিয়াম ধাতু বার করতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ লাগে। একসের এ্যালুমিনিয়াম ধাতু পেতে ২৬০০০ ওয়াট্ বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়। ছাব্বিশ হাজার ওয়াট্ মানে ২৬ ইউনিট্, কারণ একহাজার ওয়াট্কে বলে

এক কিলো-ওয়াট, এটাই হলো এক ইউনিট। বাড়ীতে বিদ্যুতের মিটার বসানো থাকে তাতে 'ইউনিট' ওঠে, সেই অনুসারে পয়সা দিতে হয়। বাড়ীতে আলো পাখার জন্য কলকাতায় প্রায় ২ আনা করে ইউনিট পড়ে। এই হিসাবে বক্সাইট থেকে একসের এ্যালুমিনিয়াম বার করতে সওয়া তিনটাকা বিজলী খরচই পড়বে। তবে কারখানায় ২ আনা করে বিদ্যুৎ ইউনিটের দাম নয়, অনেক কম। যে কারখানায় বছরে ১০০০ টন এ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয় সেখানে বছরে অন্ততঃ তিনকোটি ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি খরচ হয়।

(৫) বেতার বা রেডিও। বিদ্যুতের সাহায্যে কী করে বেতার তরঙ্গ বা রেডিও ওয়েভ সৃষ্টি করা যায় তা পরের অধ্যায় বলেছি।

এসব ছাড়া বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও বিদ্যুতের বহুল প্রয়োগ হচ্ছে। এক কথায় বিদ্যুৎ মানুষের সুখ সুবিধা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।

অধ্যায়—১৭

কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার

আজকের বিজ্ঞানজগতে যেসব চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছে বা যেসব যন্ত্রপাতি কলকবজার অভিনব উন্নতি ও প্রয়োগ হচ্ছে তার অধিকাংশের মূলেই রয়েছে বিজ্ঞানের কয়েকটি মৌলিক আবিষ্কার, যা ষাট-সত্তর বছর আগে হয়েছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে দশবছরের মধ্যে কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়:—

(১) বেতার বা রেডিও তরঙ্গ (১৮৮৭-৮৮); আবিষ্কর্তা হার্ৎজ (Hertz)।

(২) অতি বেগুনী (ultra violet) আলোকপাতে ধাতুগাত্র হ'তে ঋণ-বিদ্যুৎকণা বা ফোটো-ইলেক্ট্রন উৎক্ষেপ, অর্থাৎ ফোটোইলেক্ট্রন আবিষ্কার (১৮৮৭), আবিষ্কর্তা হার্ৎজ।

(৩) এক্স্-রে বা রঞ্জনরশ্মি (১৮৯৫); আবিষ্কর্তা রোয়েন্টগেন (Roentgen)।

(৪) ইউরেনীয়াম ধাতুর তেজস্ক্রিয়তা (radio-activity), (১৮৯৬) আবিষ্কর্তা হেনরী বেকেরেল (Becquerel)।

(৫) রেডিয়াম (১৮৯৭), আবিষ্কারিকা মাদাম কুরী (Mme Curie)।

(৬) কাচনলের মধ্যে ইলেকট্রন উৎপাদন ও ইলেক্ট্রনের বিদ্যুৎ পরিমাণ, ভার ইত্যাদি নিরূপণ (১৮৯৭), জে. জে. টমসন।

প্রথমে বেতার-তরঙ্গ ও ফোটো-ইলেক্ট্রনের কথা বলব। বেতার-তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হার্ৎজ ফোটো-ইলেক্ট্রনের সন্ধান পান, এজন্য এই দুটি আবিষ্কারের কথা একত্রে আলোচনা করলে বুঝতে সুবিধা হবে।

ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করলেন আলোক একপ্রকার বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ (electromagnetic waves)। মোমবাতি বা দেশলাইয়ের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে কোনরকম বিদ্যুৎ বা চুম্বক দেখা যায় না, কিন্তু সব আলোক রশ্মিতেই

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের শক্তি নিহিত। এই বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তি দ্রুত হারে বাড়ে-কমে বা স্পন্দিত হয়, এই উপর্যুপরি হ্রাস বৃদ্ধিই আলোক তরঙ্গের প্রকৃত রূপ।

বেতার তরঙ্গ ঃ ম্যাক্সওয়েলের এই মতবাদ অবলম্বন করে হার্ৎজ নানা রকম পরীক্ষা সুরু করে দিলেন। হার্ৎজ ভাবলেন তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলে চারিপাশে চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় (অধ্যায় – ১৬), তাহ'লে তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ স্পন্দিত করলে চুম্বক ক্ষেত্রও স্পন্দিত হবে। প্রথমে তিনি অঙ্ককষে তারের মধ্যে কী করে বিদ্যুৎ স্পন্দন সৃষ্টি করা যায় সেটা ঠিক করে নিলেন।
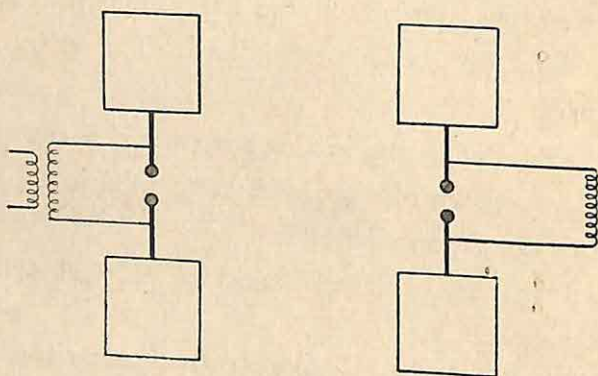
চিত্র—২৪ : হার্ৎজ-এর সরল রেডিও চক্র।

হার্ৎজ দুটি বিদ্যুৎচক্র (electric circuits) তৈরী করে কাছাকাছি রাখলেন। চক্রদুটির প্রধান গঠন হ'লো তার কুণ্ডলী ও ধাতব পাত। হার্ৎজ প্রত্যেকটি চক্রের কুণ্ডলীর তারের দুই সীমা কাছাকাছি এনে একটু ফাঁক রাখলেন, তারের সীমা দুটি মোটা ক'রে দিলেন ছোট ছোট তামার গোলক দিয়ে। এই ফাঁক বা ব্যবধানকে বলে স্ফুলিঙ্গচ্ছেদ (spark gap)। এবার তিনি একটি চক্রে বিদ্যুৎ চালনা করলেন। স্ফুলিঙ্গচ্ছেদে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ (বা স্পার্ক) চম্‌কে উঠল। দেখলে মনে হয় বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গটি একবার দপ করে জ্বলেই নিভে গেল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি স্পন্দমান, প্রতি সেকেণ্ডে কোটিবার হারে এই স্ফুলিঙ্গ স্পন্দিত হয়। স্ফুলিঙ্গের স্পন্দন বাইরের

ব্যাপার, আসলে চক্রের মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহই ঐভাবে স্পন্দিত হচ্ছে। এই ব্যাপারটি হার্ৎজ আগেই অঙ্ক কষে বুঝে নিয়েছিলেন। এবার তিনি দ্বিতীয় চক্রটি কাছে রাখলেন। দেখলেন প্রথম চক্রে বিদ্যুৎ দিয়ে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করলে দ্বিতীয়টিতে আপনা থেকেই স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হচ্ছে। ব্যাপারটা এই, প্রথম চক্রের বৈদ্যুতিক স্পন্দন থেকে বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ (electro-magnetic wave) সৃষ্টি হয়ে দ্বিতীয় চক্রে গিয়ে পড়ছে। দ্বিতীয় চক্রটি প্রথমটির অনুরূপ সুরে বাঁধা অর্থাৎ (বিদ্যুৎ চালনা করলে) স্পন্দনের হার সমান। এই কারণে প্রথম চক্রের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (এটাই রেডিও তরঙ্গ) এসে পড়লে দ্বিতীয় চক্রে সহজেই বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রণোদিত হয়, স্ফুলিঙ্গও সৃষ্টি হয়। প্রথম চক্রকে বলা যায় রেডিও তরঙ্গ প্রেরক (trans-mitter), দ্বিতীয়টি রেডিও তরঙ্গ গ্রাহক (receiver)। এই হলো রেডিওর গোড়া পত্তন।

দ্বিতীয় চক্রটি প্রথম (প্রেরক) চক্রের বৈদ্যুতিক সুরে বাঁধা না হ'লে রেডিও-তরঙ্গ গ্রহণ করতে পারে না। দ্বিতীয় চক্রের স্পন্দনের হার বা সুর সহজেই বদলানো যায় স্ফুলিঙ্গচ্ছেদ ছোট-বড় করে।

সুরে বাঁধা চক্রে কী করে সহজেই ঝঙ্কার বা স্পন্দন প্রণোদিত হয় তা তারের বাজনায় সহজেই দেখা যায়। সেতার বা এস্রাজের দুটি তার সমান সুরে বাঁধা থাকলে, একটা বাজলে অন্যটিও কেঁপে বেজে ওঠে। এ ব্যাপারটা একই যন্ত্রের দুটি তারে হয় তা নয়, দুটি পৃথক যন্ত্রের সুর সমান ভাবে বাঁধা থাকলে একটি বাজালে অন্যটিও বাজে। রেডিওর বিদ্যুৎচক্রের বেলাও ঐরকম হয়। তফাত এই যে, বাজনায় শব্দ তরঙ্গের স্পন্দন পড়ে অন্য তারকে কাঁপিয়ে তোলে, রেডিওতে বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ (রেড়িও তরঙ্গ) অন্য চক্রে বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রণোদিত করে। অবশ্য গ্রাহক যন্ত্রের নিজস্ব সুর বা স্পন্দনমাত্রা আগন্তুক তরঙ্গের সমান হওয়া চাই। এই জন্য রেডিও সেটে 'টিউন' (tune) করে নানা ওয়েভ লেংথের স্টেশন ধরতে হয়। টিউন করা মানে সুর মেলানো।

হার্ৎজ-এর রেডিও যন্ত্রের বিদ্যুৎ চক্রের সঙ্গে এখনকার যন্ত্রের পার্থক্য ! হার্ৎজ-এর সময় এই যন্ত্রকে 'রেডিও' বলা হ'তো না, রেডিও কথাটির

প্রচলন অনেক পরে হয়েছে। কিন্তু আজকের রেডিও সম্ভব হয়েছে হার্ৎজ-এর ঐ আবিষ্কার থেকে। আধুনিক ধরনের বেতারের যান্ত্রিক উন্নতির জন্য আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনি (Marconi)-র কাছে ঋণী। রেডিওর উন্নতি হ'তে হ'তে এলো টেলিভিশন। টেলিভিশনের মূল কথাও রেডিও তরঙ্গ বা ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ প্রেরণ ও গ্রহণ; তবে একটু অন্য ধরনের বিশেষত্ব আছে এর পদ্ধতিতে।

ফোটো ইলেক্‌ট্রন ঃ বিদ্যুৎচক্রের সাহায্যে রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেই হার্ৎজ থামলেন না। আরো নানা রকম পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। রেডিও তরঙ্গ হ'লো বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, আলোকও তাই। ম্যাক্সওয়েলের থিওরীতে এরা সবাই সমগোত্রের। রেডিও-তরঙ্গ, আলোক-তরঙ্গ, তাপ-তরঙ্গ, সবই ছোটে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে। সবগুলিই 'আলো'র মতো। হার্ৎজ ভাবলেন তাহ'লে রেডিও তরঙ্গকে কিছু দিয়ে আটকানো যাবে, আড়াল করা যাবে; দেখা যাক আড়াল করা যায় কিনা। এই ভেবে প্রেরক ও গ্রাহক চক্রের মাঝামাঝি একখণ্ড কাগজ ধরলেন হার্ৎজ। দেখলেন গ্রাহক যন্ত্রের বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের জোর কমে যাচ্ছে, তখন স্ফুলিঙ্গচ্ছেদের ব্যবধান কমিয়ে না দিলে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় না। এবার তিনি কাগজের বদলে কাঠের টুকরো আড়াল করে ধরলেন, একই ফল হলো। কাচখণ্ড ধরলেও তাই। কিন্তু কোয়ার্টজ (quartz) পাথর ধরলে আড়াল হয় না, গ্রাহক যন্ত্রেও অনায়াসে স্পার্ক হ'তে থাকে।

এই দেখে হার্ৎজ-এর মনে একটা খটকা লাগল। রেডিও তরঙ্গ ছোট কাগজের টুকরো বা অন্য কিছুর টুকরোতে বিশেষ আড়াল হবার কথা নয়, অথচ দেখা গেল বেশ আড়াল হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ সমান মাপের কোয়ার্টজ ধরলে গ্রাহক যন্ত্রে স্ফুলিঙ্গ হচ্ছে অনায়াসে। তা'হলে ব্যাপারটা কী? আবার, এটাও জানা আছে, কোয়ার্টজ-এ অতিবেগুনী আলো (ultra violet light) আটকায় না, অতিবেগুনী আলো আটকায় কাগজ, কাঠ ও কাচে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎচক্র আড়াল করতে গিয়ে রেডিও তরঙ্গ আড়াল হ'লো না, অতি বেগুনী আড়াল হলো। তাই যদি হয় তাহ'লে অতিবেগুনী

আলোর সঙ্গে গ্রাহকচক্রের স্পার্ক ওঠা না ওঠার কী সম্পর্ক ? একটা ব্যাপার আন্দাজ করা গেল, প্রেরকচক্রে স্পার্ক হ'লে সেই চোখ-ঝলসান আলোর মধ্যে অতি বেগুনী আলোও যথেষ্ট আছে। বেশ, তাহ'লে ছুই চক্রের মধ্যে কাগজের আড়াল রেখে অন্য দিক থেকে অতিবেগুনী আলো ব্যবহার করলে কী হয় দেখা যাক। প্রেরকচক্র চালু রেখে হার্ৎজ গ্রাহকচক্রকে আড়াল করে রাখলেন যাতে স্পার্ক না হয়। এবার অন্য দিক থেকে গ্রাহক চক্রের স্ফুলিঙ্গচ্ছেদের তামার গোলকের উপর অতিবেগুনী আলো ফেললেন, অমনি স্পার্ক চমকে উঠল। হার্ৎজ বুঝলেন ধাতুর উপর অতিবেগুনী আলো পড়লে কোন প্রকারে বিদ্যুৎ উৎক্ষিপ্ত হয়। আরো নানান পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল ঋণ-বিদ্যুৎ কণা উৎক্ষিপ্ত হয়। এদের নাম দেওয়া হলো ফোটো-ইলেক্ট্রন (photo electron)। ফোটো মানে আলো, ইলেক্ট্রন হলো বিদ্যুৎ-কণা। অতএব আলোর ধাক্কায় যে ইলেক্ট্রন ছিটকে বেরোয় তাকে বলা হয় ফোটো-ইলেক্ট্রন।

ধাতুর উপর অতিবেগুনী আলোর বৈদ্যুতিক প্রভাব নিয়ে তখন খুব গবেষণা চলতে লাগল। পরের বছরে (১৮৮৮) হলওয়াক (Holwack) দেখলেন দস্তার পাত (বা যে কোন ধাতুর পাত) ঋণ-বিদ্যুৎ যুক্ত করে তার উপর অতিবেগুনী আলো ফেললে সেটা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎশূন্য হয়ে পড়ে। ধাতু পাতে ধনবিদ্যুৎ থাকলে এভাবে বিদ্যুৎ তাড়ানো যায় না। এ থেকে কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল অতিবেগুনী আলো ঋণ-বিদ্যুৎ কণা (negatively charged particle) উৎক্ষিপ্ত করে।

ইলেকট্রন ঃ কিন্তু ঋণ-বিদ্যুৎ কণা কী রকম এবং কোথা থেকে কী-ভাবে আসে, থাকেই বা কোথায়, ঐ সব কথা তখন কেউ বলতে পারলেন না। ১৮৯৭ সালে জে. জে. টমসনের আবিষ্কার থেকে এর ব্যাখ্যা মিল্ল। ফ্যারাডে, টমসন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে কাচ নলের মধ্যে বাতাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনার চেষ্টা করেছিলেন। কাচ নলের ছুমুখ বন্ধ, শুধু একটা সরু নল থাকে বেরিয়ে। এই সরু নল দিয়ে বাতাস বার ক'রে নেওয়া যায় পাম্প দিয়ে। বড় নলের বন্ধ ছুই মুখে তার ঢোকানো। তারখণ্ড ছুটির মাথায় (নলের ভিতরে) ছুটি ধাতব

চাকতি। চাকতি দুটিকে বলে ইলেক্‌ট্রোড (electrodes)। দুই চাকতির মধ্যে বেশ কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান। নলের ভিতরে পুরোপুরি বাতাস থাকলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। কিন্তু পাম্প দিয়ে বাতাস টেনে নিলে চাকতি দুটির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল সুরু হয়। পাম্প করার ফলে নলটি একেবারে বায়ুশূন্য হয়ে পড়ে না, বাতাস হয়ে পড়ে খুব ক্ষীণ বা লঘু। এই লঘু বাতাস হয়ে পড়ে বিদ্যুতের পরিচালক। লঘু বাতাস বিদ্যুৎ চলাচলের ফলে রঙীন
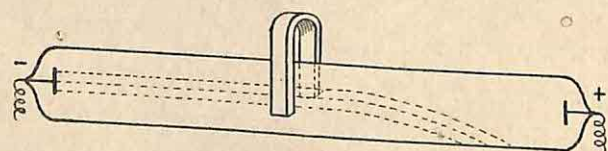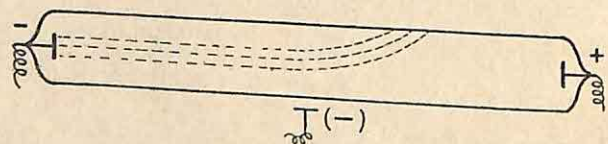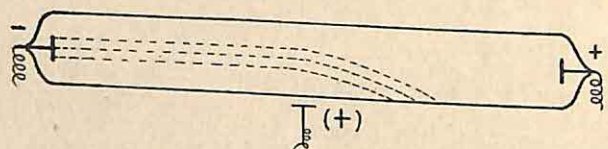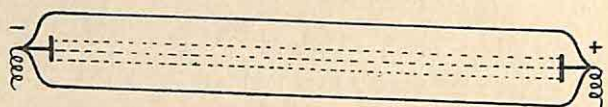
চিত্র—২৫ : ক্যাথোড রে বা ইলেক্‌ট্রন রশ্মি বিদ্যুৎ ও চুম্বক দিয়ে বাঁকানো যায়।

আভায় জলতে থাকে অনেকটা নিয়ন লাইটের মতো। টমসন আরো লক্ষ্য করলেন ঋণ-ইলেক্‌ট্রোড থেকে এক প্রকার আলো যেন ছুটে যাচ্ছে ধন-

ইলেকট্রোডের দিকে। ঋণ-ইলেকট্রোড হ'লো যে চাক্তিটি বিদ্যুৎ তারের নেগেটিভের সঙ্গে লাগানো, ঋণ-ইলেকট্রোডকে ক্যাথোড (cathode)-ও বলে। এই জন্য এই আলোর নাম দিলেন ক্যাথোড-রে (cathode ray) বা ঋণ-রশ্মি।

টমসন ঋণ-রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন কাচ নলের কাছে বিদ্যুৎযুক্ত ধাতব পাত আনলে ঋণ-রশ্মি বেঁকে যায় : ধন-বিদ্যুৎ যুক্ত পাত কাছে আনলে ঋণ-রশ্মি এগিয়ে আসে, ঋণ-বিদ্যুৎ যুক্ত পাত আনলে অন্য দিকে সরে যেতে চায়। এ থেকে বোঝা গেল ঋণ-রশ্মি ঋণ-বিদ্যুৎ কণার সমষ্টি, বিদ্যুৎ কণাগুলি ভীষণ বেগে ক্যাথোড থেকে বেরিয়ে অন্য চাকতির (এনোড, anode) দিকে ছুটে যাচ্ছে। ক্যাথোড-রে সাধারণ আলোর মত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ নয়, কারণ সাধারণ আলো বিদ্যুৎ দিয়ে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করা যায় না। ঋণ-রশ্মিকে শুধু বিদ্যুৎ দিয়েই আকর্ষণ-বিকর্ষণ করা যায় তা নয়, চুম্বকের প্রভাবে বাঁকানো যায়।

তাহ'লে ফোটো ইলেকট্রন ও ঋণ-রশ্মির বিদ্যুৎ কণা দুই-ই এক জিনিস, অর্থাৎ ইলেকট্রন। টমসনের আবিষ্কার থেকে জানা গেল সকল বস্তুতেই ইলেকট্রন আছে, এবং ইলেকট্রন সকল বস্তুর পরমাণুর উপাদান, এবং এই তড়িৎ জাতিতে ঋণ-ধর্মী বা নেগেটিভ। আবার যেহেতু সকল পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুৎ ক্রিয়াহীন (electrically neutral), তাহ'লে বুঝতে হবে প্রত্যেক পরমাণুতে সমান পরিমাণে ধনবিদ্যুৎ কণাও আছে। ধনবিদ্যুৎ কণার নাম প্রোটন (proton)।

বিভিন্ন বস্তুর পরমাণু বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন প্রোটনের সমষ্টি। হাইড্রোজেন পরমাণুই জড়বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে লঘু। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন আছে।

ইলেকট্রন (−) ও প্রোটনে (+) বিদ্যুৎ পরিমাণ সমান, আয়তনও প্রায় সমান ($১০^{-১৩}$ সেন্টিমিটার বা $\frac{১}{১০০০০০০০০০০০০০}$ সেন্টিমিটার), কিন্তু গুরুত্বে প্রচুর পার্থক্য। ইলেকট্রনের চেয়ে প্রোটন ১৮৫০ গুণ ভারী। অর্থাৎ পরমাণুর ভারের মধ্যে ইলেকট্রনের ভার নগণ্য। মোটামুটি ধরতে গেলে—

প্রোটনের ভার = হাইড্রোজেন পরমাণুর ভার = $১\cdot৬৬ \times ১০^{-২৪}$ গ্র্যাম

ইলেক্‌ট্রনের ভার = $\frac{১}{১৮৫০}$ হাইড্রোজেন পরমাণুর ভার,

$= ৯ \times ১০^{-২৭}$ গ্র্যাম

এক্স-রে বা রঞ্জন-রশ্মি : স্যার জে. জে. টমসনের পরীক্ষা থেকে জানা গেল, বাতাস বিদ্যুতের অপরিচালক, কিন্তু খুব লঘু বা বিরল (rarified) বাতাস হ'লে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে পারে। কাচনলের মধ্য থেকে পাম্প করে বাতাস বার করে নিতে থাকলে ভিতরের বাতাস ক্রমশঃ বিরল হ'তে থাকে, বা বাতাসের চাপ (প্রেসার) কমতে থাকে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই নলের ভিতরকার বাতাসের চাপ স্বাভাবিক চাপের দশহাজার ভাগের একভাগে নামিয়ে নেওয়া যায়। সাধারণ কথায় এদের ভ্যাকুয়াম টিউব (vacuum tube) বলে। ভ্যাকুয়াম মানে শূন্য, কিছু না থাকা। তবে পাম্প ক'রে একেবারে বায়ুশূন্য করা যায় না, সামান্য বাতাস থেকে যায়। বিদ্যুৎ পরিচালনার উপযোগী ভ্যাকুয়াম নল বল্‌লে বুঝতে হবে বিরল বায়ুপূর্ণ নল। বাতাসের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় দশহাজার ভাগের একভাগ হয়ে গেলে 'বায়ুশূন্য' বা 'ভ্যাকুয়াম' বললে বিশেষ ভুল হয় না।

ভ্যাকুয়াম টিউবে বিরল বায়ুর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করবার পদ্ধতি আবিষ্কার হলে বহু বৈজ্ঞানিক এই নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এ যেন এক মজার বৈজ্ঞানিক খেলা। ভ্যাকুয়াম নলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করলে নানা রঙের আলো বেরোয়, কম ভ্যাকুয়াম বা বেশী ভ্যাকুয়াম করলে নলের মধ্যে নানা রকমের আলোর স্তর নাচতে থাকে।

এই সময় জার্মানীতে অধ্যাপক রোয়েন্টগেন (Roentgen) ভ্যাকুয়াম নলের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিচালনা করে নানা রকমের পরীক্ষা করছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন অন্ধকার পরীক্ষাগারে একপ্রকার রাসায়নিক মাখানো কাগজ খণ্ড জ্বল জ্বল করছে। রাসায়নিকটির নাম বেরিরাম প্ল্যাটিনো-সায়ানাইড। ভ্যাকুয়াম নলের মধ্যে যতক্ষণ বিদ্যুৎ চালনা করছেন ততক্ষণ কাগজে মাখানো বেরিয়াম প্ল্যাটিনো সায়ানাইড জোনাকী পোকার সবুজ আলোর মতো জ্বল জ্বল করছে। নলের বিদ্যুৎ চালনা বন্ধ করলেই রাসায়নিক কাগজের ঐ তরল জ্যোতি (fluorescent light) বন্ধ হচ্ছে।

রোয়েণ্টগেন ভাবলেন, তাহ'লে ভ্যাকুয়াম টিউবের আলোর একটা বিশেষত্ব আছে। দেখা যাক্ আর কী হয়। এই বলে তিনি ভ্যাকুয়াম টিউবের আলো চালিয়ে রেখে কাগজ দিয়ে আড়াল করে রাখলেন। কিন্তু তাতেও বেরিয়াম প্ল্যাটিনো সায়ানাইড জ্বল জ্বল করতে লাগল। বাঃ, ভ্যাকুয়াম টিউবের আলো তাহ'লে কাগজে বাধা পায় না! এবার তিনি একটা ১০০০ পৃষ্ঠার বই আড়াল ক'রে ধরলেন। আশ্চর্য! মোটা বইয়ের আড়ালেও বেরিয়াম প্ল্যাটিনো সায়ানাইড কাগজ জ্বল জ্বল করছে, অর্থাৎ ভ্যাকুয়াম টিউবের অদৃশ্য আলো মোটা বই ভেদ করে এসে পড়েছে।
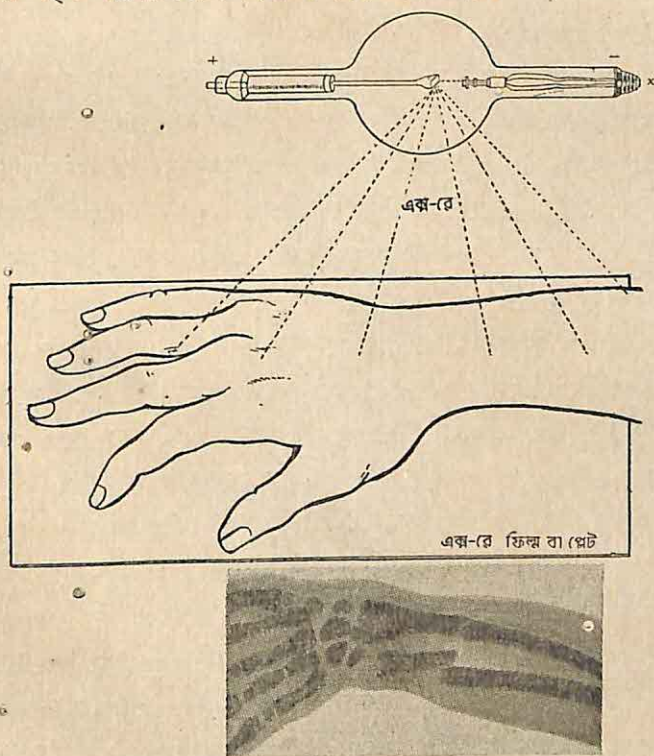
চিত্র—[illegible]৬ : এক্স্-রে।

এবার মোটা বই সরিয়ে রোয়েণ্টগেন নিজের হাতখানি ধরলেন। অবাক কাণ্ড! বেরিয়াম প্ল্যাটিনো সায়ানাইড মাখানো কাগজের ওপর সারা হাতের

অস্পষ্ট ছায়া পড়ল, মধ্যে হাড়ের ছায়া পড়ল গভীর ভাবে। তিনি বুঝলেন ভ্যাকুয়াম কাচ নলের মধ্য থেকে একপ্রকার বিদারক রশ্মি আছে, সে আলো চামড়া ও মাংসের মধ্য দিয়ে সহজে ভেদ করে যেতে পারে, কিন্তু হাড়ে যথেষ্ট বাধা পায়, এই জন্য হাড়ের ছায়া পড়ছে গভীর ভাবে।

কী ধরনের এই অদৃশ্য আলো, কাচনলের ঠিক কোথা থেকে কী ভাবে এই আলো উৎপন্ন হচ্ছে, এসব তিনি তখুনি কিছু বুঝতে পারলেন না। এই অজানা রশ্মির নাম দিলেন X-Ray (এক্স-রে)। আবিষ্কর্তার নামে অন্যেরা বলেন রোয়েন্টগেন রশ্মি, যার বাংলা অপভ্রংশ 'রঞ্জন রশ্মি'।

বিদ্যুৎবাহী ভ্যাকুয়াম টিউব নিয়ে তাঁর পরীক্ষা চলতে লাগল। একদিন দেখলেন গবেষণাগারে যতগুলি ব্যবহার না করা ফোটো প্লেট আছে সবগুলি যেন আলো লেগে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। একটি নতুন প্যাকেট খুললেন, দেখা গেল সবগুলি খারাপ। আমরা হ'লে হয়তো ভাবতাম দোকানদার পুরানো খারাপ প্লেট দিয়ে ঠকিয়েছে। রোয়েন্টগেনের সন্দেহ হ'লো, এটা ঐ বিদারক রশ্মির কাজ নয় তো? নিঃসন্দেহ হবার জন্য বাজার থেকে নতুন ফোটো প্লেট কিনে আনলেন। বেশ করে কালো কাগজ আর কার্ড-বোর্ডে মুড়ে বিদ্যুৎ চালিত ভ্যাকুয়াম টিউবের কাছে কিছুক্ষণ রেখে ডেভালাপ করতে নিয়ে গেলেন। যা ভেবেছিলেন তাই, প্লেটে আলো লাগার চিহ্ন, প্লেট কালো হয়ে গিয়েছে। খুব ভাল কথা। তাহ'লে ফোটোগ্রাফীর সাহায্যে এই অদৃশ্য আলোর কার্যকলাপ দেখা যাবে। সুবিধাও হবে খুব।

রঞ্জন রশ্মির মতো অন্য কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের এত ব্যাপক প্রয়োগ সচরাচর দেখা যায় না। চিকিৎসা শাস্ত্র, পরমাণু বিজ্ঞান, আলোক বিজ্ঞান, স্ফটিক বিচার, শিল্পজাত দ্রব্যাদি পরীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক্স-রে নানাভাবে ব্যবহার হয়। আবিষ্কারের তিন মাসের মধ্যেই ভিয়েনাতে অস্ত্রচিকিৎসায় এক্স-রে ব্যবহার আরম্ভ হয়। কোথায় হাড় ভেঙ্গেছে, কোথায় গোলাগুলির টুক্‌রো বিঁধে আছে, কী ধরনের আঘাত, ফুসফুসে যক্ষারোগের ক্ষত, এপেণ্ডিসাইটিসের কী অবস্থা···এসবই এক্স-রে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর এই রশ্মি কোন কোন রোগের পক্ষে (ক্যানসার, টিউমার) মহৌষধের কাজ করে। আবার অতিমাত্রায় এই রশ্মি শরীরের অনেক ক্ষতি করে। প্রথম
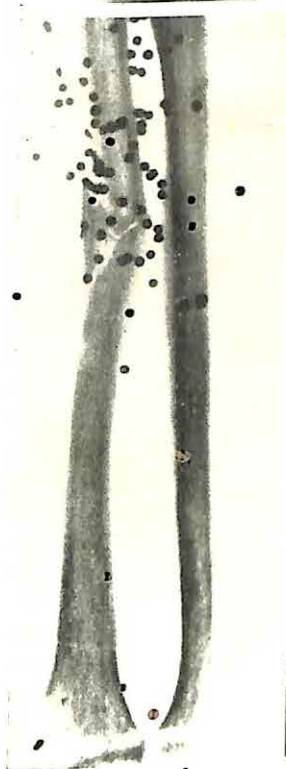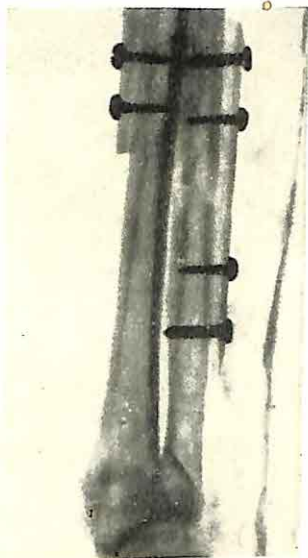
একস্ রে ছবিতে ভাঙ্গা হাড় ধরা পড়েছে

নীচে বাঁদিকের ছবি : ছিটেগুলি লাগা হাত
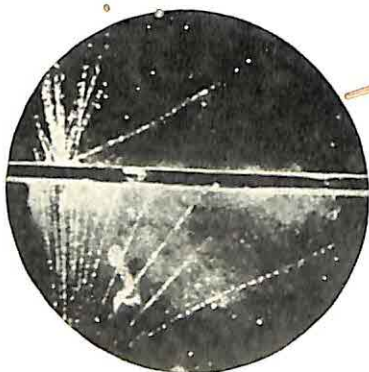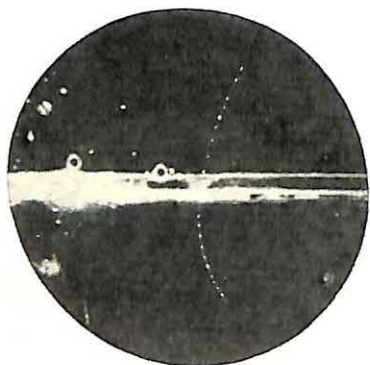
উইলসন মেঘপ্রকোষ্ঠে তড়িদন্বিত কণিকারা ধরা দিয়েছে ; চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য তাদের বাঁকা পথ লক্ষ্যণীয়

(১৭৮-১৭৯ পৃঃ দ্রঃ)
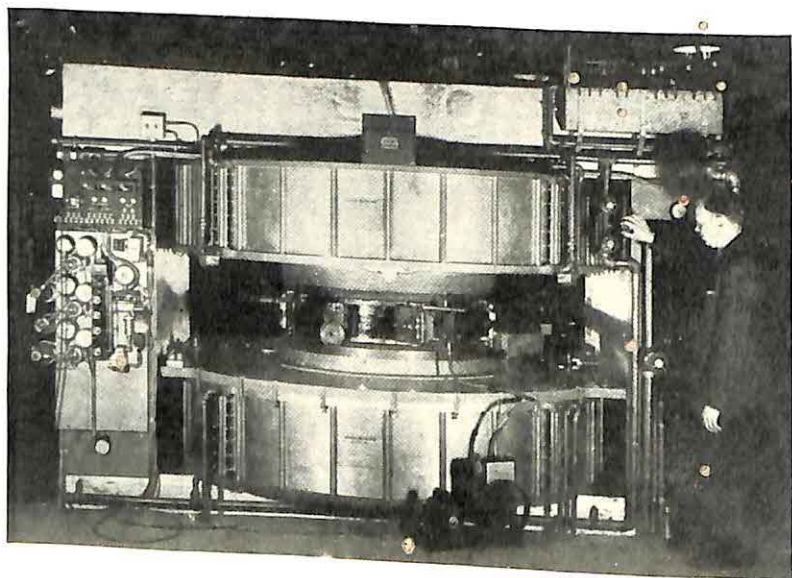
সাইক্লোট্রন

(১৮৬ পৃঃ দ্রঃ)

দিকে যতদিন এক্স-রের দোষগুণ ভাল করে জানা ছিল না, বৈজ্ঞানিকরা কোন সাবধানতা অবলম্বন করতেন না। এতে অনেকেই নানান জটিল রোগে ভুগেছেন। শরীরে এক্স-রে অতিমাত্রায় লাগলে রক্তের লাল কণিকার (red corpuseles) ভাগ কমে যায়, এতে হয় লিউকেমিয়া রোগ। আরো বেশি এক্স-রে লাগলে ক্যানসার হয়। এই কারণে আজকাল যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। এক্স-রে যন্ত্রে যেখান থেকে ঐ বিদারক রশ্মি আসে, তার চারিপাশে সীসের চাদর (led sheet) দিয়ে আড়াল করা থাকে। সীসের মতো ভারী ধাতুতে এক্স-রে আটকায়।

ভ্যাকুয়াম টিউবে বিদ্যুৎ চালনা করলে ঋণ-রশ্মি বা ক্যাথোড-রে উৎপন্ন হয়, সে কথা আগে বলেছি। ক্যাথোড-রে বা ইলেকট্রন রশ্মি ভ্যাকুয়াম টিউবের একদিক থেকে অন্যদিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যায়, অন্যদিকের ধাতব চাকতির ওপর যখন ইলেকট্রনগুলি এসে আঘাত করে তখন এক্স-রে উৎপন্ন হয়। ভ্যাকুয়াম টিউবে যত বেশী ভোল্টের বিদ্যুৎ দেওয়া যায়, ক্যাথোড-রে ইলেকট্রনের গতিবেগও সেই অনুপাতে বেশী হয়। সাধারণতঃ চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার ভোল্ট-এ এক্স-রে চালানো হয়। আজ-কাল শক্তিশালী এক্স-রে উৎপন্ন করতে দশ বা বিশ লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়।

এক্স-রে সাধারণ আলোর জাতের, অর্থাৎ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। তফাৎ এই যে, এক্স-রের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave length) খুব ছোট ; সাধারণ আলোর তরঙ্গের পাঁচ সাত হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এই কারণে রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপা কঠিন। সাধারণ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে সব উপায়ে মাপা যায় সে সব উপায়ে রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গ মাপা যায় না। প্রধান অসুবিধা, রঞ্জন-রশ্মি সব জিনিস ভেদ করে সোজাসুজি বেরিয়ে যায়, প্রিজ্‌ম দিয়ে বেঁকিয়ে বর্ণালী সৃষ্টি করে যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপা যাবে তার উপায় নেই। আয়নাতেও এক্স-রে প্রতিফলিত হয় না যে লয়েডের পদ্ধতি (১১৬ পৃঃ) দিয়ে মাপা যাবে। বাস্তবিক রঞ্জন-রশ্মি আবিষ্কারের সতেরো বছর পর্যন্ত কেউ এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপতে পারলেন না।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে জার্মান বৈজ্ঞানিক লাউয়ে (Max Von Laue) এক

অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন। তা' দিয়ে রঞ্জন রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপা গেল। লাউয়ে বললেন, সাধারণ আলো রেখা-জালের মধ্য দিয়ে গিয়ে অন্য দিকে ব্যতিকৃত হয় (১১৭ পৃঃ), এই উপায়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপা যায়। সাধারণ আলোর জন্য এই রেখা জাল (line grating) তৈরী করা হয় কাচের ওপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ কেটে, প্রতি ইঞ্চিতে হাজার, দু-হাজার দাগ কাটতে হয়। কিন্তু রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোর তুলনায় হাজার ভাগেরও ছোট, তাহ'লে রেখা-জালের দাগ আরো হাজার গুণ ঘন করে টানতে হবে। সে প্রায় অসম্ভব। লাউয়ে বললেন, কিছু ভাবতে হবে না, প্রকৃতি দেবী নিজেই এক্স-রের উপযুক্ত ব্যতিকরণ জাল তৈরী করে রেখেছেন। সে জাল এত সূক্ষ্ম আর এত নিখুঁত যে তেমন জিনিস হাতে বা কলে তৈরী করবার ক্ষমতা মানুষের নেই। ব্যাপার কী?

লাউয়ে বললেন প্রত্যেকটি স্ফটিক (crystal) এক একটি জাল বিশেষ। লবণ, চিনি, ফটকিরি, হীরা, এরা স্ফটিক বা ক্রিস্ট্যাল। এদের দানায় এক এক বিশেষ আকৃতি। এই বিশেষ দানাদার আকৃতির মূল কারণ কী? মূল
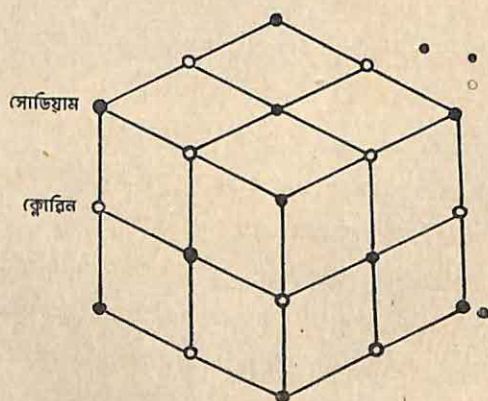
চিত্র—২৭ : লবণ স্ফটিক।

কারণ হচ্ছে এই সব পদার্থের অনুপরমাণুর বিশেষ সজ্জা, অণুপরমাণুগুলি সুনিয়মিত-ভাবে সারি বেঁধে সাজানো। মধ্যের অণুপরমাণুর নির্দিষ্ট সজ্জার জন্যই এদের দানায় দেখা যায় এক এক জাতীয় নির্দিষ্ট আকৃতি, যেন কেউ

প্রত্যেকটি দানা ঘষে পালিশ করে তৈরী করেছে। প্রত্যেকটি স্ফটিক দানার মধ্যে অণুপরমাণুগুলি চতুর্দিকে নির্দিষ্ট ব্যবধানে সাজানো, প্রকৃতির নিয়মে। তাহ'লে বলা যায় প্রত্যেকটি ক্রষ্ট্যাল হচ্ছে অণুপরমাণুর ঘন জাল (space lattice)। একটা বড় দানাকে ভাঙলেও সেই মৌলিক সজ্জার নড়চড় হয় না। আমরা যে চিনি বা লবণের স্ফটিক দানা চোখে দেখি সেটা তৈরী হয়েছে অসংখ্য মূল স্ফটিকাণু (unit crystal) দিয়ে।

সোডিয়াম ও ক্লোরিন দিয়ে লবণ তৈরী। লবণের দানা মূলতঃ সম-ঘন (cubic crystal)। লুডোর ডাইসের মতো। সবদিক (৬ দিক) সমান সমান চৌকো, প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ। লাউয়ে হিসাব করে বললেন লবণের মূল স্ফটিকাণুর মধ্যে সোডিয়াম ও ক্লোরিন পরমাণু সমান দূরে দূরে সাজানো, তাদের পরস্পর ব্যবধান ২.৮১৪ আংষ্ট্রম অর্থাৎ $\frac{১}{৩৫৫০০০০০}$ সেন্টিমিটার। লবণ দানার মধ্য দিয়ে এক্স-রে চালিয়ে যে ব্যতিকরণ ছবি ফোটো প্লেটে পাওয়া গেল তা থেকে লাউয়ে হিসাব করে বলে দিলেন রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। এই পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে লাউয়ে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

ভ্যাকুয়াম টিউব বা এক্স-রে টিউবের মধ্যে ইলেকট্রন রশ্মি যখন বিপরীত দিকের ধাতু চাকতির ওপর গিয়ে ধাক্কা দেয় তখন সেই ধাতু থেকে এক্স-রে বেরোয়। বিভিন্ন ধাতু থেকে বিভিন্ন তরঙ্গের এক্স-রে সৃষ্টি হয়। কোন্ ধাতু থেকে কী মাপের এক্স-রে পাওয়া যায় তা নিচের তালিকায় দেওয়া হলো। ধাতু যত ভারী, রঞ্জন তরঙ্গ তত ছোট হয়।

ধাতু	এক্স-রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আংষ্ট্রম মান
লোহ	১.৯৩২, ১.৭৫৪ ইত্যাদি
তাম্র	২.৫৩৭, ১.৩৮৯ ”
রৌপ্য	০.৫৫৭, ০.৪৯৫ ”
প্ল্যাটিনাম	০.২০৯, ০.১৮৫ ”

আজকাল যেসব শক্তিশালী এক্স-রে হয়েছে তাদের বিদারণ ক্ষমতা (penetrating power) প্রচণ্ড। এই সব এক্স-রে ১০-১৫ ইঞ্চি ইটের

দেয়াল, দু-তিন ফুট মোটা কাঠ, দু-চার ইঞ্চি মোটা এলুমিনিয়ামের চাদর, দু-এক ইঞ্চি পুরু ইস্পাত অনায়াসে ভেদ করে যেতে পারে। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে অনেক সময় লোহা বা ইস্পাতের চাদর ওয়েল্ড করে (গলিয়ে) জুড়তে হয়, যেমন, ব্রিজ তৈরী করতে, রেলগাড়ী বা জাহাজের বয়লারের খোল তৈরী করতে, ইত্যাদি। ওয়েল্ডিং-এর জোড় ঠিক না হ'লে ভীষণ বিপদ হ'তে পারে: ব্রিজ ভেঙ্গে পড়তে পারে, বয়লার ফেটে যেতে পারে। তাই আজকাল ওয়েল্ডিং-এর জোড় দেখে নেওয়া হয় এক্স-রে দিয়ে। জোড়া ইস্পাতের চাদরের একদিকে এক্স-রে ধরা হয়, ইস্পাত ভেদ করে এক্স-রে বেরিয়ে আসে অন্য দিকে ফোটো প্লেটের ওপর। জোড়ে যদি কোন গলদ থাকে তাহ'লে এক্স-রে ছবিতে ধরা পড়ে।

বিকীরক বা তেজস্ক্রিয় ধাতু: রোয়েণ্টগেন লক্ষ্য করেছিলেন, ভ্যাকুয়াম নলের যে অংশে ইলেকট্রন রশ্মি এসে আঘাত করে সেখান থেকে এক্স-রে উৎপন্ন হয়, আর সেই সঙ্গে কাচ নলটি একপ্রকার নীলাভ বা সবুজাভ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে: এর নাম তরল জ্যোতি (fluorescent light)। বৈজ্ঞানিকরা ভাবতে লাগলেন রঞ্জন-রশ্মি ও তরল জ্যোতির মধ্যে কোনও যোগাযোগ আছে কিনা, এবং যে-কোন উপায়ে তরলজ্যোতি উৎপন্ন করতে পারলে রঞ্জন-রশ্মি জাতীয় বিদারণক্ষম আলোক এসে উপস্থিত হয় কিনা। এমন হ'লে বিদারক রশ্মি সহজেই সৃষ্টি করা যাবে হয়তো, কারণ নানা উপায়ে তরলজ্যোতি সহজেই সৃষ্টি করা যায়। কুইনিন সালফেট, পত্রহরিৎ বা ক্লোরোফিল, ইউরেনিয়াম-পটাসীয়াম সালফেট ইত্যাদি সূর্যের আলোতে রাখলে তা থেকে তরলজ্যোতি নির্গত হ'তে দেখা যায়।

রঞ্জন-রশ্মি আবিষ্কারের কয়েকমাস পরেই হেনরি বেকেরেল (Henri Becquerel) তরলজ্যোতি পরীক্ষা করছিলেন ইউরেনিয়াম-পটাসীয়াম সালফেট নিয়ে। কিছুকাল পরীক্ষা করে তার মনে হ'লো সূর্যলোকের প্রভাবে এথেকে তরল জ্যোতিও বেরুচ্ছে, আবার এক্স-রের মতো বিদারণক্ষম রশ্মিও সৃষ্টি হচ্ছে। ইউরেনিয়াম-পটাসীয়াম সালফেট রোদে রেখে তার কাছে কালো কাগজে মোড়া ফোটো প্লেট এনে দেখলেন কালো কাগজের

মোড়ক ভেদ করে আলোর ছাপ পড়ছে ফোটো প্লেটের ওপর। তাহ'লে কি তরলজ্যোতির সঙ্গে বিদারক রশ্মির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বেকেরেল প্রমাণ করতে পারলেন? বেকেরেল তখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। ভাবলেন আরো কিছুদিন পরীক্ষা করে দেখা যাক। এমন সময় বর্ষার সূচনায় আকাশ গেল মেঘে ঢেকে, মেঘলা চলল কদিন ধরে। পরীক্ষায় বাধা পড়াতে বেকেরেল বিরক্ত হলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল রোদের অভাবে তরলজ্যোতি না হ'লেও ইউরেনিয়াম-পটাসীয়াম সালফেটের কাছে কাগজে ঢাকা ফোটো প্লেট আনলে তাতে আলোর ছাপ পড়ছে। তাহ'লে এই অদৃশ্য আলোর সঙ্গে তরলজ্যোতির কোন সম্বন্ধ নেই! বেকেরেল সন্দেহ করলেন এই বিদারক রশ্মির জন্য দায়ী ইউরেনিয়াম ধাতু। আরো পরীক্ষা ক'রে বুঝলেন ইউরেনিয়াম ধাতু স্বতঃই এবং সর্বদাই এই প্রকার অদৃশ্য বিদারক আলো বিকিরণ করে। অর্থাৎ—ইউরেনিয়াম স্বতঃ-বিকিরক বা তেজস্ক্রিয় (radioactive)।

ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা খুব তীব্র না হলেও বেকেরেলের এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের এক নতুন পথ খুলে দিল। এর পরে ফরাসী দেশে মাদাম কুরি (Mme Curie) সহস্রগুণ তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম আবিষ্কার করলেন (১৮৯৭ খৃঃ)। বেকেরেল ও মাদাম কুরি নোবেল পুরস্কার পান।

রেডিয়মাদি তেজস্ক্রিয় ধাতুর রশ্মিতে রঞ্জনরশ্মির মতো কয়েকটি গুণ দেখা যায়। যেমন, (১) এই আলো চোখে দেখা যায় না, (২) ফোটো প্লেটে আলোর ছাপ দেয়, (৩) কাঠ, কাগজ, ধাতুপাতের মধ্য দিয়ে ভেদ করে যেতে পারে, (৪) সাধারণ বায়ু বিদ্যুতের অপরিচালক কিন্তু এই রশ্মির প্রভাবে বায়ু বিদ্যুতের পরিচালকত্ব লাভ করে, ইত্যাদি।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের 'আলো' সাধারণতঃ তিনজাতের রশ্মির সংমিশ্রণ:

(ক) আলফা রশ্মি (Alpha rays): এগুলি ধাবমান ধনবিদ্যুৎকণা। প্রকৃতপক্ষে আল্‌ফা কণাগুলি হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণু, ধনবিদ্যুৎ যুক্ত।

(খ) বিটারশ্মি (Beta rays): এগুলি ঋণবিদ্যুৎ কণা, নিছক ইলেক্‌ট্রন ছাড়া আর কিছুই নয়।

(গ) গামা রশ্মি (Gamma rays): রঞ্জন-রশ্মির মতোই আলোক

তরঙ্গ বিশেষ (ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ), তবে আরো ক্ষুদ্র তরঙ্গের।

আলফা, বিটা ও গামা গ্রীক বর্ণমালার প্রথম তিন অক্ষর। আলফা ও বিটা রশ্মি বেগবান বিদ্যুৎ কণা, একমাত্র গামা রশ্মিই প্রকৃত আলোক ধর্মী। যাই হোক তিনটিকেই "রশ্মি" বলা হয়। তিনটি তিন জাতের বলে এদের সহজেই পৃথক করা যায়। একটি সীসের (lead) কৌটোয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ রাখলে কৌটোর ছিদ্র মুখ দিয়ে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি বেরুতে থাকবে মিশে। এখন বিদ্যুৎ বা চুম্বক কাছে আনলে আলফা ও বিটা রশ্মি বিপরীত দিকে দিকে বেঁকে যাবে। কারণ একটি হ'লো পজিটিভ (আলফা কণা) অন্যটি নেগেটিভ (বিটা কণা বা ইলেকট্রন)। গামা রশ্মি বিদ্যুৎ কণা নয়, অতএব সে সোজা পথেই বেরুতে থাকবে, বিদ্যুৎ বা চুম্বকের প্রভাবে পথ বদলাবে না।
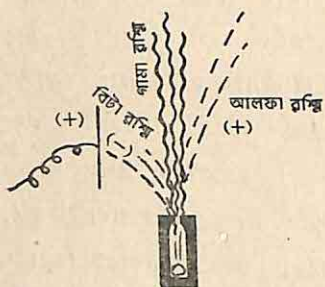
চিত্র—২৮ : বৈদ্যুতিক প্লেট কাছে এনে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মিকে পৃথক করা।

বিকিরণের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে অন্য ধাতুতে পরিণত হয়। ইউরেনিয়াম বা রেডিয়াম ধীরে ধীরে অবশেষে সীসকে (lead) পরিণত হয়। এই রূপান্তরের হার অত্যন্ত মন্থর, বহু সময় লাগে। যে কোন পরিমাণ রেডিয়াম অর্ধেকে পরিণত হ'তে ১৫৮০ বছর সময় লাগে, এই অর্ধেক পরিমাণ রেডিয়াম তারও অর্ধেক ক্ষয় হ'তে আরো ১৫৮০ বছর লাগবে, ইত্যাদি। তেজস্ক্রিয় বস্তু অর্ধেকে পরিণত হ'তে যে সময় লাগে তাকে বলে অর্ধ হ্রাস কাল বা অর্ধ কাল (half-value period বা half period)। ইউরেনিয়মের অর্ধকাল হলো ৪৫০ কোটি বছর, থোরিয়ামের ১৬৫ কোটি বছর, একটিনিয়ামের ২০ বছর, একটিনিয়াম-এক্স (Actinium—X)-এর ১১ দিন ৫ ঘণ্টা, রেডিয়াম-সি (Radium—C)-র ২০ মিনিট ইত্যাদি।

অধ্যায়—১৮

শক্তিখণ্ডবাদ

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Planck) আলোক ও তাপ তরঙ্গ সম্বন্ধে এক অভিনব মত প্রচার করলেন। যদিও আলোক ও তাপ কিরণ বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গ, তবু তাদের মধ্যে অণুপরমাণুর মতো খণ্ডত্ব বা কণারূপ আছে। প্লাঙ্ক বললেন আলোক ও তাপ তরঙ্গের শক্তি এক একটি নির্দিষ্ট খণ্ডে গঠিত। এক একটি শক্তি খণ্ড বা খণ্ডরশ্মি (quantum of energy বা quantum of radiation) অবিভাজ্য। যখনই তাপ বা আলোক বিকীর্ণ হয় তখনই এক একটি পূর্ণ খণ্ডে নির্গত হয়, কখনও অর্ধ বা ভগ্নাংশে নির্গত হয় না। তেমনি তাপরশ্মি বা আলোকরশ্মি যখন বস্তু মধ্যে শোষিত হয় তখনও পূর্ণ খণ্ডে একে একে শোষিত হয়, অর্ধখণ্ডে বা ভগ্নাংশে শোষিত হতে পারে না।

সাধারণ তরঙ্গে একরকম খণ্ডরূপ ধারণা করা যায় না। পুকুরের জলে নাড়া দিলে ঢেউ ওঠে, জলের ঢেউ চক্রাকারে অখণ্ডভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এর যে কোন অংশ আটকা পড়ে ঘাটের সিঁড়িতে বা পাথরের আড়ালে। আলোর বেলা এমন হয় না। এক একটি রশ্মি যেন এক একটি তরঙ্গের গুলি, ছুটে যায় প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে, সঙ্গে নিয়ে চলে 'শক্তি', সেই শক্তি নির্ভর করে তরঙ্গের কম্পন হারের (frequency of vibration) ওপর।

সাধারণ তরঙ্গের সঙ্গে আলোক তরঙ্গের এখানেই তফাত। জলের তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করছি, আবার বন্দুকের গুলির সঙ্গেও তুলনা করছি। আলোর মধ্যে বিদ্যুৎ চুম্বক বলের স্পন্দন আছে বলে তরঙ্গের ভাব আছে, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাপা হচ্ছে, স্পন্দন হার (প্রতি সেকেণ্ডে কতবার) মাপা হচ্ছে। অথচ এই তরঙ্গ এক এক দিকে এক এক খণ্ডে বিভক্ত, এক একটি খণ্ডরশ্মি এক একটি শক্তিখণ্ডের আধার। আলোর এক একটি শক্তি খণ্ড

(ফোটন, photon) যেন এক একটি শক্তি-কণা। তরঙ্গ অথচ কণা। অদ্ভুত শোনায়। কিন্তু উপায় কী ?

প্লাঙ্ক প্রবর্তিত শক্তি খণ্ডবাদ কোয়াণ্টাম থিওরি (quantum theory) নামে সুপরিচিত। একে শক্তির কণিকাবাদও বলা যেতে পারে। কোয়াণ্টাম শক্তি নির্ভর করে আলোর স্পন্দন হারের অনুপাতের উপর। কম্পনহার যত বেশী (বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত ছোট), রশ্মিখণ্ড বা ফোটনের শক্তি সেই অনুপাতে তত বেশী হয়। যেমন, ৩০০০ আংষ্ট্রম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেগুনী আলোর যে কোয়াণ্টাম শক্তি, ৬০০০ আংষ্ট্রম দৈর্ঘ্যের কমলা রঙের-আলোর শক্তি তার অর্ধেক। বেগুনী বা নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে লাল বা কমলা আলোর চেয়ে ছোট, অর্থাৎ বেগুনী বা নীল আলোর স্পন্দন হার লাল বা কমলা আলোর স্পন্দন হারের চেয়ে বেশী। ফলে নীল বা বেগুনী আলোর শক্তি বেশী। এই কারণে নীল ও বেগুনী আলো ফোটোগ্রাফীতে বেশী কার্যকর, লাল বা কমলা রঙের আলোতে ফোটো নেওয়া দুষ্কর।

আলোর মধ্যে 'কণা' ভাবও আছে তার প্রমাণ দেওয়া শক্ত নয়। আলোক শুধুই তরঙ্গ ধর্মী নয়। তরঙ্গের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তরঙ্গ কোন বস্তুকে আন্দোলিত করতে পারে, সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এ কথাটা সচরাচর আমাদের মনে থাকে না, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বা ক'রে দেখলেই বোঝা যাবে। দিঘির জলে শুকনো পাতা পড়ে আছে। জল নাড়িয়ে ঢেউ তুললাম, ঢেউ চলল পাতার দিকে এগিয়ে। পাতা নাচতে লাগল ঢেউয়ের তালে তালে। ঢেউ চলে গেল ওপার পর্যন্ত, পাতাটি রয়ে গেল আপন স্থানে, ঢেউ তাকে নিয়ে যেতে পারল না। এটাই তরঙ্গের ধর্ম। ঢেউ বা তরঙ্গ 'আঘাত' ক'রে কোন বস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করতে পারে না। আলো যদি শুধুই তরঙ্গ হয় তাহ'লে আলো কোন বস্তুকে আঘাত করে দূরে নিক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু এ কথা কেন ? আলো কি কোন বস্তুকে আঘাত ক'রে বা ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিতে পারে ? পারে বৈ কি। সে কথা আগে বলেছি : ফোটো ইলেকট্রন। অতিবেগুনী আলোক পাতে ধাতুগাত্র থেকে ইলেকট্রন নিক্ষিপ্ত হয়। তাহ'লে দেখা গেল আলোর আঘাতে ইলেকট্রন স্থানচ্যুত ও নিক্ষিপ্ত হয়।

কম্পটন প্রক্রিয়া ঃ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কম্পটন (A. H. Compton) আরো স্পষ্ট ভাবে কোয়াণ্টাম থিয়োরি প্রয়োগ করিলেন। রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুনী বা অতি বেগুনীর চেয়ে আরো ছোট, হাজার ভাগ ছোট। তাহ'লে রঞ্জন-রশ্মিতে কোয়াণ্টাম শক্তি হাজার গুণ বেশী, ইলেক্ট্রনকে আঘাত করবার ক্ষমতাও বেশী। কম্পটন অঙ্গার বা কার্বনের উপর এক্স-রে ফেললেন। দেখলেন অঙ্গারখণ্ডের উপর এক্স-রে পড়ে তা নানাদিকে বিক্ষিপ্ত (scattered) হয়, অঙ্গার থেকে ইলেক্ট্রনও তখন সবেগে নিক্ষিপ্ত
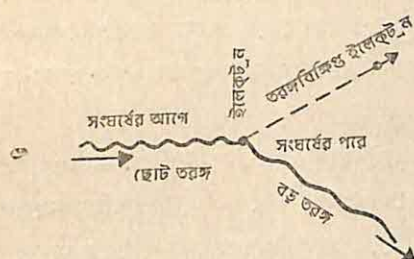
চিত্র—২৯ ঃ রঞ্জনরশ্মি ও ইলেক্ট্রনের সংঘাত ঃ কম্পটন প্রক্রিয়া।

হয়। রঞ্জন রশ্মির সঙ্গে ইলেক্ট্রনের সংঘর্ষের ফলে এই রকম ব্যাপার হয়। নিক্ষিপ্ত ইলেক্ট্রনের গতিশক্তি (kinetic energy) প্রচণ্ড, এই শক্তি সে কোথা থেকে পেল? কম্পটন বললেন ইলেক্ট্রনের গতিশক্তি রঞ্জন-রশ্মি থেকে অর্জিত, তাহ'লে রঞ্জন-রশ্মির কোয়াণ্টাম শক্তিতে ঘাটতি পড়বে, অর্থাৎ সংঘর্ষের পরে বিক্ষিপ্ত রঙ্গন-রশ্মির কম্পনহার কমে যাবে বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে। তিনি হিসাব করে বলে দিলেন কোন্ দিকে রঞ্জন-রশ্মি নিক্ষিপ্ত হ'লে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত বাড়বে। পরীক্ষা করে দেখলেন তাঁর গণনা হুবহু ঠিক। এটা কম্পটন প্রক্রিয়া (Compton effect) নামে খ্যাত। এজন্য কম্পটন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

অধ্যায়—১৯

আলোকরশ্মি ও জড়কণার পার্থক্য ও সাদৃশ্য

আলোর আঘাতে ফোটো ইলেক্‌ট্রন উৎক্ষেপ এবং কম্পটনের রঞ্জন-রশ্মি ও ইলেক্‌ট্রনের ঠোকাঠুকি পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল আলোক রশ্মির মধ্যেও জড়কণার ভাব আছে। এর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল প্লাঙ্ক-এর কোয়াণ্টাম থিওরি থেকে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইন্‌ষ্টাইন (Albert Einstein) তাঁর বিখ্যাত রিলেটিভিটি থিওরি দিয়ে প্রমাণ করলেন জড় ও শক্তির মধ্যে এক গূঢ় সম্বন্ধ আছে। জড় বস্তু শক্তিতে, এমন কি আলোক শক্তিতে রূপান্তর করা যেতে পারে ; তেমনি আলোর শক্তিতেও জড়ের ধর্ম থাকতে পারে।

ফোটো ইলেক্‌ট্রন উৎক্ষেপ ও কম্পটন প্রক্রিয়া থেকে আলোর জড়ত্ব প্রমাণ হওয়ায় পরে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দ্য ব্রগ্‌লী (de Broglie) প্রমাণ করলেন ধাবমান ইলেক্‌ট্রন এক হিসাবে আলোক তরঙ্গের মতো মনে করা যেতে পারে। ধাবমান ইলেক্‌ট্রন হ'লো ইলেক্‌ট্রন রশ্মি বা ঋণ রশ্মি, একথা আগে বলেছি। আলোক রশ্মির গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল, অবশ্য ঋণ রশ্মির ইলেক্‌ট্রনের গতিবেগ এর চেয়ে অনেক কম। কিন্তু ঋণরশ্মির মধ্যে আলোর মতো তরঙ্গ রূপ দেখা যাবে।

দ্য ব্রগ্‌লী বললেন ব্যাপারটা এই ভাবে দেখতে হবে : ইলেক্‌ট্রন যদিও জড়কণা, তবু সে যখন তীব্র গতিশীল হয় তখন তার গতিশক্তিটুকু আলোকের তরঙ্গ শক্তির অনুরূপ বলে মনে হবে। এমন কি এই কারণে ঋণ রশ্মির ব্যতিকরণও সম্ভব হবে। দ্য ব্রগ্‌লী হিসাব করে দেখালেন ইলেক্‌ট্রনের কত গতিবেগ হলে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে। ভ্যাকুয়াম নলে ইলেক্‌ট্রন রশ্মি বা ঋণ রশ্মি উৎপন্ন করা যায়। বেশী ভোল্টের বিদ্যুৎ ভ্যাকুয়াম নলে দেওয়া হলে ঋণ রশ্মির গতিবেগও বাড়ে। দ্য ব্রগ্‌লী হিসাব করে বললেন ১৫০

ভোল্ট দিলে যে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে তা হবে ১ আংষ্ট্রম দৈর্ঘ্যের আলোক তরঙ্গের মতো। তেমনি ১০,০০০ ভোল্ট ভ্যাকুয়াম নলে দিলে ঋণ রশ্মির তরঙ্গ হবে ০·১২২ আংষ্ট্রম দৈর্ঘ্যের। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রন রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক্স-রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমতুল্য। একথা সত্য হলে ঋণ রশ্মির পথে স্ফটিক (crystal) রাখলে রঞ্জন-রশ্মির মতো ব্যতিকরণ চিত্র পাওয়া যাবে। দ্য ব্রগলীর এই গণনা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ডেভিসন, জার্মার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ সত্য বলে প্রমাণ করলেন, ইলেকট্রন ব্যতিকরণ চিত্র স্ফটিক দিয়ে পাওয়া গেল। এই ভাবে জড়কণার মধ্যেও তরঙ্গরূপ দেখা গেল। ধাবমান ইলেকট্রনকে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোক রশ্মিরূপে ভাবলে এর আর একটি ব্যবহার সম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। এ দিয়ে অতি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী হ'তে পারে। এর নাম ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ, ২০ হাজার গুণ বিবর্ধন শক্তি এর।

বিভিন্ন যুগে আলোক ও জড়কণার প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মত কী-ভাবে পরিবর্তন হয়েছে তা দেখলে অবাক হতে হয়। এক একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এক একটা বদ্ধমূল ধারণা চুরমার হ'য়ে যায়, নতুন ধারণা আসে, আবার সেটাও উল্টে যায়। আলোর কথাই ধরা যাক। নিউটনের আলোক কণিকবাদ, হাইগেন্স-ইয়ং-ম্যাক্সওলে-এর তরঙ্গবাদ, প্লাঙ্ক-এর শক্তি খণ্ডবাদ আলোককে একবার 'কণা' একবার 'তরঙ্গ' আবার 'কণা' বলে প্রতিষ্ঠা করেছে। জড়বস্তুর বেলাও এরকম মত পরিবর্তন চলেছে। বৈদিক যুগের কণাবাদ, ডাল্টনের পরমাণুবাদ, টমসনের ইলেকট্রনবাদ ইত্যাদি জড়কণা বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর। সম্প্রতি ধাবমান ইলেকট্রনের মধ্যে তরঙ্গরূপ দেখা গিয়েছে, ইলেকট্রনকে স্ফটিকের জাল দিয়ে ব্যতিকরণ করাও সম্ভব হয়েছে, ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপও তৈরী হ'য়েছে।

এখন বোঝা যাচ্ছে, জড়ের ধর্ম ও শক্তির (তরঙ্গের) ধর্মের মধ্যে স্পষ্ট ছেদ রেখা টানা যায় না। পূর্বে জড়কণা ও আলোক তরঙ্গের মধ্যে মুখ্য পার্থক্য ব'লে এইগুলি জানা ছিল ঃ

জড় (কণা)	আলোক (তরঙ্গ)
(১) বস্তুমান (mass) আছে	বস্তুমান নেই
(২) ভার আছে, মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হয়	ভারহীন, মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হয় না
(৩) বেগজনিত আঘাত করবার শক্তি আছে	ঘাত শক্তিহীন
(৪) ব্যতিকরণ অসম্ভব	ব্যতিকরণ সম্ভব

কিন্তু বর্তমানে উভয়ের মধ্যে দ্বিবিধ ধর্মই দেখতে পাওয়া গিয়াছে। আলোর মধ্যেও জড়কণার ভাব, জড়কণার (ইলেক্‌ট্রনের) মধ্যেও তরঙ্গতা রয়েছে। ঐতিহাসিক ধারা ৭ সংখ্যক তালিকায় দেওয়া হলো (১৫৫ পৃঃ)।

আলোকের জড়ত্ব প্রমাণ করেন আইন্‌ষ্টাইন আর এক অভিনব উপায়ে। আইন্‌ষ্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব অনুসারে শক্তি ও জড়ের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, পরস্পর রূপান্তর হ'তে পারে। প্রতি আলোকরশ্মি মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাকেও জড় বস্তুর বা জড় কণার সামিল বলে ধরা যেতে পারে। তাহ'লে আলোক রশ্মিও মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হবে।

ছুড়ে দেওয়া ঢিল বাঁকা পথে মাটিতে পড়ে পৃথিবীর টানে। আলোক রশ্মিও কি তেমনি পৃথিবীর টানে বাঁকা পথে যায়? নিয়ম অনুসারে কথাটা ঠিক, কিন্তুর আলোর গতিবেগ এত বেশী যে পৃথিবীর সামান্য টানে আলোক রশ্মির বক্রতা বোঝা অসম্ভব। আইন্‌ষ্টাইন বললেন, সূর্য অনেক বড়, তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও অনেক বেশী। সূর্যের পাশ দিয়ে আলো আসলে সেই আলো সূর্যের টানে বেঁকে আসবে, তা মাপা সম্ভব। সূর্যের পিছনে তারা আছে। সেই সব তারার আলো সূর্যের গা ঘেঁষে যখন আমাদের কাছে আসবে তখন সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে একটু বেঁকে আসবে, তাতে মনে হবে নক্ষত্রটা একটু যেন সরে গিয়েছে। কিন্তু মুশকিল, সূর্যের তেজের কাছে তারার আলো এত ক্ষীণ যে দেখাই যাবে না! আইন্‌ষ্টাইন বললেন, এটা পরীক্ষা করতে হলে সূর্য থাকবে অথচ সূর্যের তেজ থাকবে না, এমন হওয়া চাই। এমন হতে পারে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণের সময়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে মাসে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণের সময় বৈজ্ঞানিকরা দূরবীন ক্যামেরা

খৃষ্টাব্দ	জড়ের রূপ	আলোর রূপ	প্রধান আবিষ্কারের ফল — জড় সম্বন্ধীয়	প্রধান আবিষ্কারের ফল — আলোক সম্বন্ধীয়
১৯০০ পর্যন্ত	কণা	তরঙ্গ	ডাল্টনের পরমাণুবাদ (১৮১০) ও তদ্দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সন্তোষজনক ব্যাখ্যা	হাইগেন্স, ইয়ং-এর তরঙ্গবাদের সাহায্যে প্রতিফলন, প্রতিসরণের ব্যাখ্যা ; ব্যতিকরণ পরীক্ষা ; ম্যাক্সওয়েল ও হার্ৎজ-এর বিদ্যুৎ চুম্বক তরঙ্গবাদ
১৯১০	ঐ	তরঙ্গ ও কণিকা ? তরঙ্গ বা কণিকা ?	ঐ	ফোটোইলেক্ট্রন ; প্লাঙ্ক-এর শক্তিখণ্ড বাদ
১৯২০	ঐ	ঐ	ঐ (উন্নত)	ঐ (উন্নত) ; সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে নক্ষত্র রশ্মির বক্রণ (আইন্‌ষ্টাইন)
১৯২৫	কণা ও তরঙ্গ ? কণা বা তরঙ্গ ?	ঐ	দ্য ব্রগলীর ইলেক্ট্রন তরঙ্গ মতবাদ ইলেক্ট্রন ব্যতিকরণ	দ্য ব্রগলী, স্রোডিংগার, হাইসেনবার্গ-এর তরঙ্গবিজ্ঞান, কম্পটন প্রক্রিয়া (রঞ্জনরশ্মি—ইলেক্ট্রন সংঘর্ষ)
১৯৩০ বর্তমান	কণা ও তরঙ্গ উভধর্মী	তরঙ্গ ও কণিকা উভধর্মী	ঐ (উন্নত)	ঐ (উন্নত)

তালিকা ৭ : জড় ও আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতামত

নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন আইন্‌ষ্টাইনের গণনা ঠিক। পূর্ণ গ্রহণের সময় দিনের বেলা রাতের অন্ধকার নেমে এল, আকাশে তারা ফুটে উঠল। সূর্যের পিছনে যে সব নক্ষত্র তাদের দেখা গেল সূর্যের গা ঘেঁষে। আবার যে আলো সোজা পথে আসছিল তা গেল সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের টান খেয়ে বেঁকে; মনে হলো নক্ষত্রটি স্থানচ্যুত হয়ে সরে দাঁড়িয়েছে একটু। নক্ষত্রের এই স্থানচ্যুতি (star shift) আইন্‌ষ্টাইন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অঙ্ক কষে বলে দিয়েছিলেন, হাতে কলমে তা প্রমাণ হলো ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে।
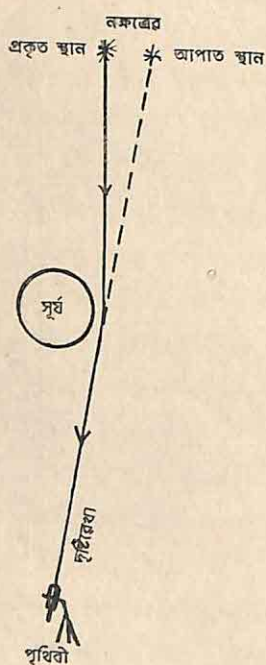
চিত্র—৩০ : মাধ্যাকর্ষণের টান খেয়ে আলো বাঁকা পথে চলে।

নানা ভাবে আলোর জড়ত্ব প্রমাণ হয়েছে। এথেকে আর একটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। সূর্য কত আলো ও তাপ শক্তি দিনের পর দিন ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই শক্তির জড়ত্ব বা ভর (mass) আছে, তাহ'লে বিকিরণের ফলে সূর্যের ওজন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। একথা পঞ্চম অধ্যায়ে সূর্য প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে: সূর্যের ওজন দিনে দশ লক্ষ কোটি মণ ক'রে ক্ষয় হচ্ছে।

সূক্ষ্ম এটম বা পরমাণুর মধ্যেও জড় ও শক্তির রূপ পরিবর্তন চলে। প্রোটন বা নিউট্রনের ভার মোটামুটি ১ ধরলেও সূক্ষ্ম মাপ অনুসারে প্রোটনের ১'০০৮২ এবং নিউট্রনের ১'০০৮৯। হিলিয়াম পরমাণুতে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন আছে। তাহ'লে হিলিয়াম পরমাণুর ভার হওয়া উচিত ৪'০৩৪২ পারমাণবিক ভার মাত্রা হিসাবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় হিলিয়াম পরমাণুর ভার ৪'০০২। এরকম গরমিলের হিসাব কী? হাইড্রোজেনের উপাদান কণাগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে হিলিয়াম পরমাণু তৈরী হ'লে ০'০৩২২

মাত্রায় জড়ত্ব হানি (mass defect) হয়, এই পরিমাণ বস্তু রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। মূল কণার সংযোগের ফলে জড়ত্ব হানি ঘটলে যে শক্তি নিঃসৃত হয় সেটাই হ'লো হাইড্রোজেন বোমার শক্তির কারণ। সূর্য ও নক্ষত্রের মধ্যে হাইড্রোজেনের প্রাধান্য এবং হাইড্রোজেন সংযুক্ত (fusion) হয়ে হিলিয়াম হচ্ছে, তাই এত তেজের উৎপত্তি।

সংযুক্ত না হয়ে বিযুক্ত হলেও জড়ত্ব-হানি ঘটতে পারে। ইউরেনিয়াম ধাতুর পারমাণবিক ভার প্রধানতঃ দু-প্রকার (২৩৮ ও ২৩৫) তাদের মধ্যে ২৩৫ ভারের ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রনের ধাক্কায় ভেঙ্গে দু-ভাগ করা যায়। দ্বিভাজনের (fission) ফলে ইউরেনিয়াম পরমাণু সৃষ্টি করে একটি ল্যান্থানাম পরমাণু ও একটি ব্রোমিন পরমাণু (এবং তিনটি অলগা নিউট্রন)। প্রত্যেকটি খণ্ডের ওজন ধরে যোগ করলে মূল ২৩৫ পারমাণবিক ভারের ইউরেনিয়ামের ওজনের চেয়ে ০'২০৭ মাত্রা কম পড়ে। ইউরেনিয়াম দ্বিভাজনে জড়ত্ব হানির সমপরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আসে এটম বোমার শক্তি হয়ে।

এই শক্তি কত প্রচণ্ড, অর্থাৎ কত সামান্য বস্তু রূপান্তরিত হয়ে কী ভীষণ পরিমাণ শক্তি দিতে পারে তা হিসাব করে দেখা যাক। এক পাউণ্ড বস্তু পরিমাণ যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তর হয় তাহ'লে ১২০০০ কোটি বিদ্যুৎ ইউনিটের সমান শক্তি দেবে। এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ামের পরমাণুগুলির দ্বিভাজন (fission) হ'লে ০'০০০৮৮ পাউণ্ড পরিমাণ জড়ত্ব হানি ঘটবে, অর্থাৎ ঐ ওজনের শক্তি উৎপন্ন হবে। একপাউণ্ড জড়ত্ব হানিতে কত শক্তি উৎপন্ন হয় বলেছি। সেই অনুপাতে একপাউণ্ড ইউরেনিয়াম 'ফিশনে' অর্থাৎ ০'০০০৮৮ পাউণ্ড জড়ত্ব হানিতে পাওয়া যাবে সাড়ে দশকোটি বিদ্যুৎ ইউনিটের সমান। মোটামুটি বলা যায় তিন পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ফিশনের শক্তি দিয়ে সারা কলকাতা শহরে সারা মাস বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। আবার, এই শক্তি যদি এক মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ে তাহলে কী কাণ্ড হবে? এটাই হলো আণবিক বোমার ব্যাপার।

অধ্যায়—২০

পরমাণু গঠন তত্ত্ব

স্যার জে. জে. টমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার (১৭শ অধ্যায়) করলে বোঝা গেল সব পরমাণুর মধ্যেই ইলেকট্রন আছে, অর্থাৎ যে কোন বস্তুর মূল উপাদান ইলেকট্রন বা ঋণ-বিদ্যুৎ কণা। আবার, যে হেতু সকল বস্তু তড়িৎ-ক্রিয়াহীন (electrically neutral), সে কারণে বুঝতে হবে সকল বস্তুতে সমপরিমাণে ধন-বিদ্যুৎও বর্তমান। প্রোটন হলো ধন-বিদ্যুৎ কণা।

ইলেকট্রন ও প্রোটনের বিদ্যুৎ পরিমাণ সমান, তবে ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ নেগেটিভ, প্রোটনের বিদ্যুৎ পজিটিভ। ওজনে অনেক পার্থক্য। প্রোটন অনেক বেশী ভারী, ইলেকট্রনের ভারের তুলনায় ১৮৫০ গুণ। এজন্য পরমাণুর ভারের জন্য দায়ী প্রোটনই, ইলেকট্রনের ভার নগণ্য।

লঘুতম পরমাণু হাইড্রোজেন গ্যাসের। হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন সবচেয়ে সরল: একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন দিয়ে গড়া। অন্যান্য বস্তুর পরমাণুভার মাপা হয় হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায়। হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুর ভার 'চার' অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুভারের চারগুণ। অঙ্গার পরমাণুর ভার ১২, নাইট্রোজেনের ১৪, অক্সিজেনের ১৬, ইত্যাদি।

পরমাণু গঠন সম্পর্কে প্রধান প্রশ্ন দুটি: (১) কোন্ পদার্থের পরমাণুতে কটি ইলেকট্রন এবং কটি প্রোটন আছে? (২) পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটন কী ভাবে সজ্জিত?

স্যার জে. জে. টমসন বললেন পরমাণুর ভার যত সংখ্যায়, ইলেকট্রনের সংখ্যাও তত। হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১, ইলেকট্রনের সংখ্যাও ১। এটা মিলল। কিন্তু অন্য পরমাণুর বেলা একথা খাটে না। বার্কলা (Barkla) পরীক্ষা করে বললেন পরমাণুর ভার যে সংখ্যার, ইলেকট্রনের সংখ্যা তার অর্ধেক। যেমন: অঙ্গারের পারমাণবিক ভার ১২, ইলেকট্রনের সংখ্যা ৬; নাইট্রোজেনের পারমাণবিক ভার ১৪, ইলেকট্রন আছে ৭টি। হাইড্রোজেন ছাড়া অন্যান্য পরমাণুতে বার্কলার নিয়ম খাটে।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটি দেখা যাক। ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন কী ভাবে সাজিয়ে থাকে পরমাণুর মধ্যে? টমসন বললেন ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন একের মধ্যে এক খোলসের মত সাজানো, অনেকটা পেঁয়াজের খোলার মতো। এক পর্দায় ইলেক্‌ট্রন, পরেরটিতে প্রোটন, আবার ইলেক্‌ট্রনের খোলস, আবার প্রোটনের, এই রকম। এই হ'লো টমসনের দেওয়া পরমাণুর চিত্র। এতে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ কণা-(ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন) পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, দূরে দূরে। প্রথমে সবাই এটা মেনে নিলেও খটকা থেকে গেল। রাদারফোর্ড পরীক্ষা ক'রে দেখলেন এরকম হ'তে পারে না। তিনি নানা প্রকার ধাতুপাতের মধ্য দিয়ে আলফা রশ্মি (সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) চালাতে চেষ্টা করলেন। ধাতুপাতের ধাক্কা খেয়ে আলফা রশ্মি চতুর্দিকে ছিটিয়ে পড়ল (scattering of alpha rays)। আলফা রশ্মি হিলিয়াম পরমাণু ভারের (প্রোটনের চার গুণ), বিদ্যুতের ধরন পজিটিভ, বিদ্যুতের পরিমাণ ২। রাদারফোর্ড ভাবলেন এই ভারী আলফা রশ্মি এভাবে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে কেন? টমসনের মত অনুসারে ধাতুপাতের মধ্যে যে সব বিদ্যুৎকণা (ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন) আছে তারা আছে ছাড়া ছাড়া ভাবে। এ অবস্থা হ'লে আলফা রশ্মি তাদের অনায়াসে ধাক্কা দিয়ে প্রায় সোজা-সুজি বেরিয়ে যাবে। অথচ দেখা যাচ্ছে আলফা রশ্মিই ধাক্কা খেয়ে চতুর্দিকে ছিটিয়ে পড়ছে। ইলেক্‌ট্রন হাল্কা, প্রোটন ১৮৫০ গুণ ভারী। আলফা রশ্মিকে ধাক্কা দিতে পারে প্রোটন-ই। কিন্তু টমসনের মত অনুসারে খোলায় খোলায় ছাড়া ছাড়া ভাবে থাকলে প্রোটনেরও আলফা রশ্মিকে ধাক্কা দেবার ক্ষমতা কতটুকু? রাদারফোর্ড বললেন পরমাণুর মধ্যে প্রোটনগুলি একত্রে দলা বেঁধে আছে, একে বলে পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস (nucleus)। পরমাণু যত ভারী নিউক্লিয়াসও তত ভারী, আলফা রশ্মিকে ধাক্কা দেবার ক্ষমতাও তত বেশী।

আলফা রশ্মি বিক্ষেপণ পরীক্ষা থেকে রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করলেন যে, পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনগুলি ছড়িয়ে থাকলেও প্রোটনগুলি একত্র সম্বদ্ধ। প্রোটন পিণ্ডটি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, ইলেক্‌ট্রনগুলি এই কেন্দ্রীন বা নিউ-ক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে। এই চিত্রটি অনেকটা গ্রহ পরিবেষ্টিত সূর্যের মতো

নয় কি ? নিউক্লিয়াসটি যেন সূর্য, ইলেকট্রনগুলি যেন তার গ্রহ। এক একটি পরমাণু যেন বিদ্যুৎ কণার সৌর জগৎ।
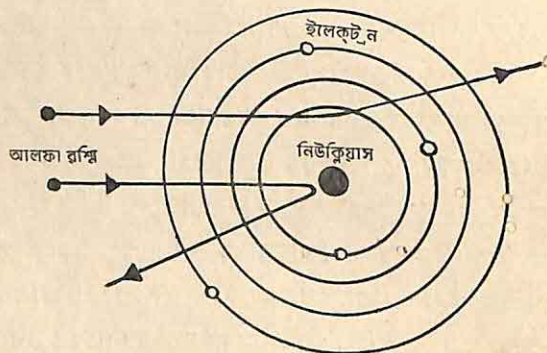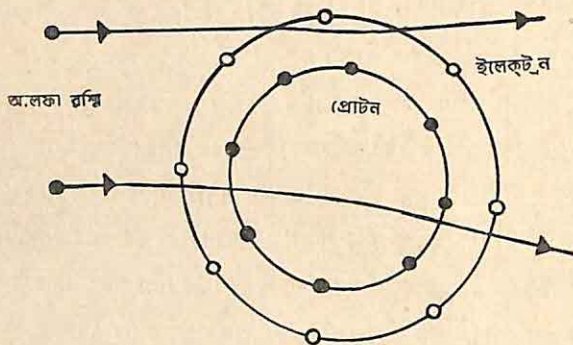
চিত্র—৩১ : পরমাণুর গঠন। ওপরে : টমসনের ধারণা] ;
নিচে : রাদারফোর্ড ও বোর-এর ধারণা (এটাই ঠিক)।

পরমাণু গঠনের এই চিত্র অবলম্বন করে অধ্যাপক বোর (Niels Bohr) হাইড্রোজেন আলোর বর্ণালীর বিশেষত্ব মীমাংসা করে দিলেন। তখনই হ'লো রাদারফোর্ড-বোরের কেন্দ্রীন-পরমাণু মতবাদের (theory of nuclear atom) অবিসংবাদী জয়। কোন জিনিস প্রজ্বলিত হ'লে পরমাণু থেকে আলোক উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন বস্তুর পরমাণু হ'তে বিভিন্ন রঙের তারতম্য বর্ণালীমান যন্ত্রে বিচার করা যায়। পরমাণুর মধ্য থেকে কী ভাবে আলো উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে বোরের মতবাদ এই রকম : পরমাণুতে

গ্রহরূপী ঘূর্ণ্যমান ইলেক্‌ট্রনগুলি আপন আপন নির্দিষ্ট কক্ষে ঘোরে। তাপ বা বিদ্যুৎ চালনার ফলে ইলেক্‌ট্রনগুলি নিজ কক্ষ ছেড়ে দূরের অন্য কক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সকল কক্ষ তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক, এবং এই সকল নূতন কক্ষে ঘুরবার সময় তাদের শক্তিও থাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী। একে বলা যায় ইলেক্‌ট্রনদের উত্তেজিত অবস্থা (excited state)। সুযোগ পেলেই তারা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় স্বাভাবিক কক্ষে ফিরে যায়, তখন অতিরিক্ত শক্তিটুকু আলোক শক্তিরূপে বেরিয়ে আসে। যেহেতু প্রত্যেকটি ঘূর্ণনকক্ষ নির্দিষ্ট শক্তির আধার, সেইহেতু নির্গত আলোক রশ্মিও নির্দিষ্ট শক্তি সম্পন্ন, অর্থাৎ নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হ'য়ে থাকে।

হাইড্রোজেন গ্যাসের আলোর উদাহরণ নেওয়া যাক। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে একটি প্রোটন, তাকে প্রদক্ষিণ করছে একটি ইলেক্‌ট্রন। এই ইলেক্‌ট্রনের স্বাভাবিক কক্ষের ব্যাস ১·০৬ আংষ্ট্রম। এই কক্ষের নাম ক দেওয়া যাক। অধ্যাপক বোর বলেন ইলেক্‌ট্রনটির স্বাভাবিক কক্ষ ক হ'লেও ইলেক্‌ট্রনটি আরো কয়েকটি নির্দিষ্ট ও বৃহত্তর কক্ষে ঘুরতে পারে, খ, গ, ঘ......ইত্যাদি কক্ষে। হিসাব করে বলে দিলেন খ, গ, ঘ......কক্ষগুলির ব্যাস যথাক্রমে ৪·২৫, ৯·৫৬, ১৭·০০ আংষ্ট্রম ইত্যাদি।
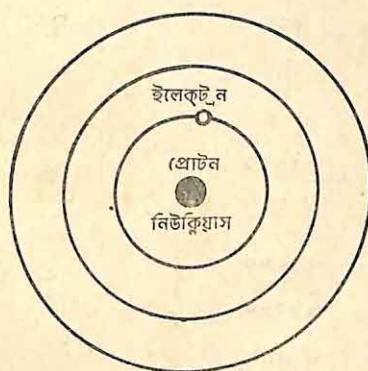
চিত্র—৩২

হাইড্রোজেন গ্যাস প্রজ্বলিত হ'লে পরমাণুর ইলেক্‌ট্রন স্বাভাবিক (ক) কক্ষ ছেড়ে অন্য কক্ষে (খ, গ...) চলে যায়, ইলেক্‌ট্রনের শক্তিও বেড়ে যায়।

কিন্তু যে কক্ষেই সে যাক, আবার স্বাভাবিক কক্ষে (ক) ফিরে আসবে, হয় এক বারেই অথবা মধ্যবর্তী ধাপে ধাপে। এই ভাবে উচ্চ শক্তি স্তর (high energy level) থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে পতন হেতু ইলেকট্রনের অতিরিক্ত শক্তিটুকু আলোক রশ্মিরূপে মুক্তি পায়। শক্তি স্তরের মধ্যে যে পার্থক্য সেই অনুসারে নির্গত আলোর শক্তি বা রং দেখা যায়। অধ্যাপক বোরের গণনা অনুসারে হাইড্রোজেন আলোর যে বিভিন্ন রং বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হিসাব পাওয়া যায় তা বর্ণালীমান যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করলে হুবহু মিলে যায়। পরবর্তী তালিকা থেকে দেখা যাবে।

ইলেকট্রনের কক্ষ-পতন	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (আংষ্ট্রম)	বর্ণ	আবিষ্কর্তা
খ হ'তে ক	১২১৬	অতিবেগুনী	লাইম্যান (Lyman)
গ " "	১০২৬		
ঘ " "	৯৭৩		
	ইত্যাদি		
গ হ'তে খ	৬৫৬৩	লাল	বামার (Balmer)
ঘ " "	৪৮৬১	নীল	
ঙ " "	৪৩৪০	বেগুনী	
	ইত্যাদি		
ঘ হ'তে গ	১৮৭৫৬	তাপরশ্মি বা ইনফ্রা-রেড	পাষেন (Paschen)
ঙ " "	১২৮২১		
	ইত্যাদি		
ঙ হ'তে ঘ	৪০৫০০	ঐ	ব্র্যাকেট (Blackett)
চ " "	২৬৩০০		
	ইত্যাদি		

তালিকা ৮ঃ হাইড্রোজেন বর্ণালীর মূল ব্যাখ্যা।

এই ভাবে রাদারফোর্ড ও বোর পরমাণু গঠনের এক চূড়ান্ত মীমাংসা দিলেন।
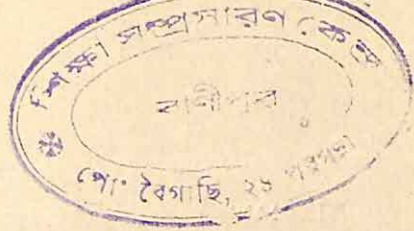
অধ্যায়—২১

পরমাণু-কেন্দ্রীনের গঠন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলেছি কেন্দ্রীন (নিউক্লিয়াস) ও গ্রহরূপী-ইলেকট্রন নিয়ে এক একটি পরমাণু গঠিত। এখন দেখা যাক বিভিন্ন মৌলিক, পদার্থের অণুপরমাণু কী কী বিষয়ে পৃথক এবং তাদের গুণাগুণ কিসের উপর নির্ভর করে।

হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, পারদ, তাম্র, লৌহ ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ। এক এক পদার্থের এক এক গুণ। প্রত্যেক পদার্থের পারমাণবিক ভারও পৃথক ও নির্দিষ্ট, যেমন, হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভার ১, হিলিয়ামের ৪, অঙ্গারের ১২, নাইট্রোজেনের ১৪, অক্সিজেনের ১৬, ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকরা প্রথমে মনে করেন পারমাণবিক ভারের সঙ্গে মৌলিক পদার্থের গুণাগুণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কি হয়তো পারমাণবিক ভার দিয়েই দ্রব্যগুণের বিচার হ'তে পারে। কিন্তু এ্যাস্টন (Aston) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণু ভার নিরূপণের সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করলে দেখা গেল একই মৌলিক পদার্থে বিভিন্ন ভারের পরমাণু আছে। অক্সিজেন বায়ুর পারমাণবিক ভার প্রধানতঃ ১৬ হলেও, ১৭ ও ১৮ ভারের অক্সিজেন পরমাণু স্বল্প মাত্রায় আছে। শতকরা ৯৯.৮৯ ভাগ অক্সিজেন পরমাণু ১৬ ভারের, শতকরা ০.০১ ভাগ ১৭ ভারের এবং শতকরা ০.১ ভাগ ১৮ ভারের। তেমনি অঙ্গারের পারমাণবিক ভার মোটামুটি ১২ হলেও সেটা ৯৯.৭৫ ভাগ ; বাকী শতকরা ০.২৫ ভাগ হলো ১৩ ভারের অঙ্গার পরমাণু। এই রকম বিভিন্ন ভারের একই দ্রব্যকে বলে আইসোটোপ (isotope)। প্রায় সকল মৌলিক পদার্থেরই অল্পবিস্তর আইসোটোপ আছে। টিন ধাতুর ১০টি আইসোটোপ, অর্থাৎ দশটি বিভিন্ন পরমাণু ভারের টিন আছে। তাদের মধ্যে ১২০ ভারেরটি প্রধান শতকরা ২৭ ভাগ, ১১৮ ভারেরটি শতকরা ২১½ ভাগ, ১১৬ ভারেরটি ১৪ ভাগ ইত্যাদি (এই অধ্যায়ের শেষে তালিকা দ্রষ্টব্য), ফলে টিনের গড়পড়তা পরমাণবিক

ভার ১১৮·৭। আবার হাইড্রোজেন পরমাণু সবই ১ ভারের নয়; শতকরা ৯৯·৯৮ ভাগ ১ ভারের এবং বাকী ০·০২ ভাগ হ'লো ২ ভারের।

এখন বোঝা যাচ্ছে 'পারমাণবিক ভার' দ্রব্য বিশেষের গুণাগুণের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী নয়। পারমাণবিক ভার থেকে বস্তুর জাতি নির্দেশ করা যায় না। পারদ ও সীসক দুটি ভিন্ন জাতি। দুটিরই নানা ভারের পরমাণু বা আইসোটোপ আছে। পারদের একটি আইসোটোপের পরমাণবিক ভার ২০৪, সীসকেরও একটি আইসোটোপের পরমাণু ভার ২০৪; পারমাণু ভার সমান অথচ পারা ও সীসা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির ধাতু। তেমনি সীসকের আর একটি আইসোটোপের পরমাণুভার ২১৪, ওদিকে পোলোনিয়ামের একটি আইসোটোপেরও ঐ একই ভার।

বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন পরমাণুভারের তারতম্য হলেও এক এক জাতির মৌলিক পদার্থে একটি জিনিসের নড়চড় হয় না, সেটি কেন্দ্রীনের ধন বিদ্যুৎ পরিমাণ। ১৬, ১৭ বা ১৮ পরমাণুভারের যে কোন অক্সিজেন পরমাণু কেন্দ্রে ৮টি প্রোটনীয় ধন বিদ্যুৎ আছে। অর্থাৎ—ভার যা-ই হোক না কেন, যে কেন্দ্রীনে ৮টি প্রোটনীয় বিদ্যুৎ সে পরমাণু অক্সিজেন পরমাণু ছাড়া আর কিছু নয়। হাইড্রোজেন পরমাণুর ভার ১ বা ২ হ'তে পারে কিন্তু দুটি হাইড্রোজেন আইসোটোপের কেন্দ্রেই একটি করে প্রোটনীয় ধন বিদ্যুৎ। টিনের দশটি আইসোটোপ, অর্থাৎ দশটি বিভিন্ন পরমাণু ভারের টিন হতে পারে, কিন্তু সকল টিন পরমাণুর কেন্দ্রে ৫০টি ক'রে প্রোটনীয় বিদ্যুৎ বা ধন বিদ্যুৎ বর্তমান। অতএব দেখা গেল কেন্দ্রীনের প্রোটনীয় ধন বিদ্যুৎ সংখ্যার ওপরই দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ভর করে। এই সংখ্যাকে বলে পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number)।

আগে বলেছি ইলেকট্রনের ভার নগণ্য, প্রোটনের ভার তার ১৮৫০ গুণ বেশী। তাহ'লে পারমাণবিক ভার নির্ভর করছে কেন্দ্রের প্রোটনের সংখ্যার উপর। আবার পারমাণবিক সংখ্যাও নির্ভর করছে কেন্দ্রের প্রোটনীয় ধনবিদ্যুতের উপর। তাহ'লে পারমাণবিক ভার এবং পারমাণবিক সংখ্যা সমান হবে কি? দেখা যায় হিলিয়ামের পারমাণবিক ভার ৪, পারমাণবিক সংখ্যা ২, অক্সিজেনের পরমাণবিক ভার ১৬, পারমাণবিক সংখ্যা

৮, ইত্যাদি। মোটামুটি সব পরমাণুর ভার যা', পারমাণবিক সংখ্যা তার প্রায় অর্ধেক। শুধু হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভার ১, পারমাণবিক সংখ্যাও ১। কিন্তু তাই বা জোর ক'রে কী করে বলি? হাইড্রোজেনেরও তো ২ ভারের আইসোটোপ আছে, এর নাম ডিউটেরন বা ডিউটেরিয়াম।

পারমাণবিক ভারের তুলনায় পারমাণবিক সংখ্যা মোটামুটি অর্ধেক দেখে বৈজ্ঞাণিকরা এইভাবে প্রথমে মীমাংসা করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, পরমাণু কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন তার অর্ধেক সংখ্যায় ইলেকট্রন জোট বেঁধে আছে। যেমন হিলিয়াম কেন্দ্রে ৪টি প্রোটনের সঙ্গে ২টি ইলেকট্রন রয়েছে। ফলে ভার হ'লো ৪, আর পারমাণবিক সংখ্যা হ'লো ২, কেননা ৪টি প্রোটনের ধনবিদ্যুতের সঙ্গে ২টি ইলেকট্রনের ঋণবিদ্যুতের যোগাযোগে ২ প্রোটনীয় বিদ্যুৎ উদ্বৃত রইল। তেমনি অক্সিজেন পরমাণু কেন্দ্রে ধরলেন ১৬টি প্রোটন ও ৮টি ইলেকট্রন, ফলে ভার হ'লো ১৬ আর পরমাণবিক সংখ্যা হ'লো আট। যে অক্সিজেন আইসোটোপের পরমাণু-ভার ১৭ তার বেলা ধরলেন কেন্দ্রীনে ১৭টি প্রোটন ও ৯টি ইলেকট্রন, ফলে ভার হ'লো ১৭, পারমাণবিক সংখ্যা হলো ১৭ − ৯ = ৮; পারমাণবিক সংখ্যা ৮ বলে এটা রইল অক্সিজেন। তেমনি ১৮ ভারের অক্সিজেন আইসোটোপ হ'বে নিউক্লিয়াসে ১৮টি প্রোটন ও ১০টি ইলেকট্রন থাকলে।

এইভাবে পারমাণবিক ভার, পারমাণবিক সংখ্যা ও আইসোটোপের মীমাংসা করা গেল। কিন্তু বর্তমানে জানা গিয়াছে কেন্দ্রীনের মধ্যে কোনও মুক্ত-ইলেকট্রন নেই। তার যায়গায় অন্যান্য মৌলিক জড়কণা আবিষ্কার হয়েছে। এখনকার মতে পরমাণু কেন্দ্রে আছে প্রোটন ও নিউট্রন। নিউট্রনের ভার প্রোটনের ভারের সমান, কিন্তু নিউট্রনে কোনও বিদ্যুৎ নেই, ধনবিদ্যুৎও না, ঋণ-বিদ্যুৎও না। তাহ'লে অক্সিজেনের পরমাণুতে ৮টি প্রোটন ও ৮টি নিউট্রন থাকলে হবে ১৬ ভারের অক্সিজেন আইসোটোপ; ৮টি প্রোটন ৯টি নিউট্রন হ'লে ১৭ ভারের এবং ৮টি প্রোটন ও ১০টি নিউট্রন থাকলে ১৮ ভারের আইসোটোপ হবে। সব ক্ষেত্রেই ৮টি প্রোটন থাকাতে পারমাণবিক সংখ্যা হবে ৮, যার ফলে এটা 'অক্সিজেন'। তেমনি হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ১, ভার ১; সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে

কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন, তাছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু হাইড্রোজেনের যে আইসোটোপের ভার ২, তার কেন্দ্রে আছে ১টি প্রোটন ও ১টি নিউট্রন। ফলে ভার হ'লো ২, আর পারমাণবিক সংখ্যা রইল ১ হ'য়ে যার ফলে এটা হাইড্রোজেন ছাড়া আর কিছু নয়।

কেন্দ্রীনের প্রোটনীয় বিদ্যুতের ওপর মৌলিক দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ভর করছে। তাহ'লে সেটা বাড়াতে কমাতে পারলে এক দ্রব্যকে অন্য দ্রব্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে। দেখা যাচ্ছে পারদের পারমাণবিক সংখ্যা ৮০, এর পরমাণু কেন্দ্রীন থেকে একটা প্রোটন কমাতে পারলে হবে ৭৯। কেন্দ্রীনের পারমাণবিক সংখ্যা ৭৯ স্বর্ণের! পরমাণু কেন্দ্রের প্রোটনীয় বিদ্যুৎ কমানো বাড়ানো সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারলে 'পারা'কে 'সোনা'য় রূপান্তর ক'রে কুবেরের কোষাগার সৃষ্টি করা যেতো। দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সাধারণ ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করবার ধারণা পোষণ করতেন। এই সব বৈজ্ঞানিকদের বলা হ'তো alchemist। তাছাড়া পরশ পাথরের সন্ধানে এঁরা বহু ব্যর্থ পরিশ্রমও করেছেন। পরমাণু-রূপান্তর বিষয়ে মধ্যযুগের ধারণা ও আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়, মিল আছে শুধু নামে।

কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু রূপান্তরের বা বস্তু-রূপান্তরের (transmutation of elements) উপায় উদ্ভাবন করেন রাদারফোর্ড ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। এ সম্বন্ধে পরে বলছি। এখন বলব প্রকৃতির কারখানায় কী ভাবে মৌলিক দ্রব্যের রূপান্তর হয়। তেজস্ক্রিয় বা বিকীরক ধাতুর কথা বলছি। তেজস্ক্রিয় দ্রব্যের কেন্দ্রীন স্বভাবতঃ ভঙ্গুর (unstable)। এদের পরমাণু কেন্দ্রীন হতে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ কণা নির্গত হওয়ার ফলে মূল ধাতুটির পারমাণবিক সংখ্যা পরিবর্তিত হতে থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন মৌলিক ধাতুতে রূপান্তরিত হয়। যতক্ষণ না স্থায়িত্ব আসে ততক্ষণ এই রকম পরিবর্তন চলে, অবশেষে স্থায়ী অ-বিকীরক ধাতুতে পরিণত হয়ে তেজস্ক্রিয়তার অবসান হয়।

ইউরেনিয়াম ধাতুর কথাই ধরা যাক। এই তেজস্ক্রিয় ধাতুর পারমাণবিক

সংখ্যা ৯২, পারমাণবিক ভার ২৩৮। ইউরেনিয়ামের কোন একটি পরমাণু যেমনি একটি আল্‌ফা কণা (ধনবিদ্যুৎ = ২, ভার = ৪) বিচ্ছুরিত করে অমনি তার পারমাণবিক সংখ্যা কমে যায় ২, ভার কমে যায় ৪; অর্থাৎ সেই ইউরেনিয়াম পরমাণুটি আর ইউরেনীয়াম রইল না, হয়ে গেল এমন একটি ধাতু যার পারমাণবিক সংখ্যা ৯০ (আর পরমাণবিক ভার ২৩৪)। এই নূতন ধাতুটি 'থোরিয়াম', কারণ পারমাণবিক সংখ্যা ৯০ (তালিকা দ্রষ্টব্য)। থোরিয়ামও তেজস্ক্রিয়। থোরিয়াম থেকে আবার আলফা কণা বিচ্ছুরিত হ'লে পারমাণবিক সংখ্যা আরও ২ কমে যাবে, হয়ে পড়বে ৮৮, তালিকায় দেখা যাচ্ছে এটি রেডিয়াম। আবার বীটা কণিকা বিচ্ছুরিত হলে পারমাণবিক সংখ্যার উন্নতি হবে। বীটা কণাগুলি ইলেক্‌ট্রন অর্থাৎ ঋণ-বিদ্যুৎ কণা। এই কারণে কেন্দ্রীন থেকে বীটা নির্গত হলে কেন্দ্রীনে ধনবিদ্যুতের প্রাধান্য বাড়বে অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা বাড়বে। রেডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ৮৮, এ থেকে একটি বীটা কণা বিচ্ছুরিত হ'লে ধনবিদ্যুতের প্রাধান্য ১ সংখ্যায় বাড়বে, কেন্দ্রীনের প্রোটনীয় সংখ্যা হয়ে দাঁড়াবে ৮৯, এটি হ'লো একটিনিয়াম। এই ভাবে উচ্চ-নীচ জাত্যান্তর চলতে থাকে তেজস্ক্রিয় ধাতুর মধ্যে। আবার যদি কোনও কেন্দ্রীন থেকে একটি আলফা কণা (+ +) ও দুটি বীটা কণা (− −) একত্রে বেরোয় তাহ'লে বিদ্যুতের পরিমাণ বদলায় না শুধু ভার কমে যায় ৪ মাত্রায় (কারণ আলফা কণার ভার ৪)। যেমন, ইউরেনিয়ান থেকে ১টি আলফা কণা ও ২টি বীটা কণা বিচ্ছুরিত হলে পরমাণুভার ২৩৮ থেকে ২৩৪ হবে, অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের লঘুতর আইসোটোপে পরিণত হবে।

তেজস্ক্রিয় দ্রব্যের বিকীরণের ফলে উচ্চ-নীচ জাত্যান্তর চললেও মোটামুটি ক্রমশঃ নিচের দিকেই যায়। এইভাবে পারমাণবিক সংখ্যা কমতে কমতে এমন একটি ধাপে নামবে যখন আর তেজস্ক্রিয়তা রইবে না। ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয়, পারমাণবিক সংখ্যা ৯২। তেজস্ক্রিয়তার ফলে অবশেষে পারমাণবিক সংখ্যা নেমে আসে ৮২তে, এটা হ'লো সীসক (lead) ধাতু। সীসক স্থায়ী ধাতু, তেজস্ক্রিয় নয়। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতুর শেষ পরিণতি সীসে বলে এদের সঙ্গে সীসেকে সর্বদাই সহচর

ভাবে পাওয়া যায়। ইউরেনিয়াম খনিজের মধ্যে ইউরেনিয়াম ও সীসের অনুপাত থেকে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা যায় সে কথা আগে (পৃঃ ৪৪ দ্রষ্টব্য) বলেছি।

পরের তালিকায় মৌলিক দ্রব্যের পরিচয় দেওয়া হ'লো। এই তালিকায় প্রথম স্তম্ভে আছে মৌলিক পদার্থের নাম। তারপরে পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number) অর্থাৎ পরমাণু কেন্দ্রে প্রোটনিয় ধনবিদ্যুতের সংখ্যা। তৃতীয় স্তম্ভে আইসোটোপের বিভিন্ন পারমাণবিক ভার (atomic weight) : এটা কেন্দ্রের প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার যোগফলের সমান। পরের স্তম্ভে আইসোটোপের শতকরা অনুপাত যথাক্রমে দেওয়া হয়েছে। শেষ স্তম্ভে নানান ভারের আইসোটোপের গড়পড়তা পারমাণবিক ভার লেখা।

তালিকা-৯ : মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা, ভার ইত্যাদির তালিকা

মৌলিক পদার্থ	পারমাণবিক সংখ্যা	বিভিন্ন পারমাণবিক ভার বা আইসোটোপের ভার	আইসোটোপের শতকরা অনুপাত	গড়পড়তা পরমাণুভার
হাইড্রোজেন	১	১, ২	৯৯·৯৮৫, ০·০১৫	১·০০৮
হিলিয়াম	২	৪, (৩)	(০·০০০১৩)	৪·০০২
লিথিয়াম	৩	৭, ৬	৯২·৬, ৭·৪	৬·৯৪০
বেরিলিয়াম	৪	৯	১০০	৯·০৩
বোরণ	৫	১১, ১০	৮১·৩, ১৮·৭	১০·৮২
অঙ্গার (কার্বণ্)	৬	১২, ১৩	৯৮·৯, ১·১	১২·০০৬
নাইট্রোজেন	৭	১৪, ১৫	৯৯·৬, ০·৪	১৪·০০৮
অক্সিজেন	৮	১৬, ১৮. ১৭	৯৯·৭৬, ০·২, ০·০৪	১৬·০০
ক্লোরিন	৯	১৯	১০০	১৯·০০
নিয়ন	১০	২০, ২২, ২১	৯০, ৯·৭, ০·৩	২০·১৮৩
সোডিয়াম	১১	২৩	১০০	২২·৯৯৭
ম্যাগ্নেসিয়াম	১২	২৪, ২৬, ২৫	৭৯, ১১, ১০	২৪·৩২

মৌলিক পদার্থ	পারমাণবিক সংখ্যা	বিভিন্ন পারমাণবিক ভার বা আইসোটোপের ভার	আইসোটোপের শতকরা অনুপাত	গড়পড়তা পরমাণুভার
এলুমিনিয়াম	১৩	২৭	১০০	২৬·৯৮
সিলিকন	১৪	২৮, ২৯, ৩০	৯২·১৮,৪·৭, ৩·১২	২৮·০৬
ফস্‌ফরাস	১৫	৩১	১০০	৩০·৯৮
গন্ধক (সালফার)	১৬	৩২,৩৪,৩৩,৩৬	৯৫,৪·২৪,০ ৭৪, ০·০২	৩২·০৬৬
ক্লোরিন	১৭	৩৫,৩৭	৭৫,২৫	৩৫ ৪৫৭
আর্গন	১৮	৪০,৩৬,৩৮	৯৯·৬,০·৩৪,০ ০৬	৩৯·৯৪৪
পটাশিয়াম	১৯	৩৯,৪১,৪০*	৯৩·০৮,৬·৯১,০·০১	৩৯·১
ক্যালসিয়াম	২০	৪০,৪৪,৪২ --	৯৬ ৯২,২·১৩,০·৬৪--	৪০·০৮
স্ক্যাণ্ডিয়াম	২১	৪৫	১০০	৪৪·৯৬
টাইটানিয়াম	২২	৪৮,৪৬,৪৭,৪৯, ৫০	৭৩·৪,৮·২,৭·৪,৫·৬, ৫·৪	৪৭·৯
ভ্যানাডিয়াম	২৩	৫১,৫০	৯৯·৭৫,০·২৫	৫০·৯৫
ক্রোমিয়াম	২৪	৫২,৫৩,৫০,৫৪	৮৩·৭,৯·৫,৪·৪,২·৪	৫২·০১
ম্যাংগানিজ	২৫	৫৫	১০০	৫৪·৯৩
লোহ (আয়রণ)	২৬	৫৬,৫৪,৫৭,৫৮	৯১·৬,৫·৯,২·২,০·৩	৫৫·৮৫
কোবাল্ট	২৭	৫৯	১০০	৫৮·৯৪
নিকেল	২৮	৫৮,৬০,৬২,৬১,৬৪	৬৭·৯,২৬·২,৩·৭,১	৫৮·৬৯
তাম্র (কপার)	২৯	৬৩,৬৫	৬৯,৩১	৬৩·৫৭
দস্তা (জিঙ্ক)	৩০	৬৪,৬৬,৬৮,৬৭,৭০	৪৮·৯,২৭·৮,১৮·৬, ৪·১,০·৬২	৬৫·৩৮
গ্যালিয়াম	৩১	৬৯,৭১	৬০,৪০	৬৯·৭২
জার্মেনিয়াম	৩২	৭৪,৭২,৭০,৭৩,৭৬	৩৬·৫,২৭·৪,২০·৬, ৭·৮,৭·৭	৭২·৬
আর্সেনিক	৩৩	৭৫	১০০	৭৪·৯৩

* তারকা চিহ্নিত আইসোটোপগুলি তেজস্ক্রিয় (radioactive)।

মৌলিক পদার্থ	পারমাণবিক সংখ্যা	বিভিন্ন পারমাণবিক ভার বা আইসোটোপের ভার	আইসোটোপের শতকরা অনুপাত	গড়পড়তা পরমাণুভার
সেলিনিয়াম	৩৪	৮০,৭৮,৭৬,৮২, ৭৭,৭৪	৪৯.৯,২৩.৬,৯.১,৯, ৭.৫,০.৯	৭৮.৯৬
ব্রোমিন	৩৫	৭৯,৮১	৫০.৬,৪৯.৪	৭৯.৯১৬
ক্রিপ্‌টন	৩৬	৮৪,৮৬,৮২,৮৩, ৮০,৭৮	৫৭.০২,১৭.৪৩,১১.৫' ১১.৪৮,২.২৩,০.৩৪	৮৩.৮
রুবিডিয়াম	৩৭	৮৫, ৮৭*	৭২.৮,২৭.২	৮৫.৪৪
স্ট্রনসিয়াম	৩৮	৮৮,৮৬,৮৭,৮৪	৮২.৫৬,৯.৮৬,৭.০২ ০.৫৬	৮৭.৬৩
ইট্রিয়াম	৩৯	৮৯	১০০	৮৮.৯২
জারকনিয়াম	৪০	৯০,৯৪,৯২,৯১,৯৬	৫১.৬,১৭ ৫,১৭.১, ১১,২.৮	৯১.২২
কলম্বিয়াম	৪১	৯৩	১০০	৯৩.৩
মলিবডেনাম	৪২	৯৮,৯৬,৯৫,৯২...	২৪,১৬.৫,১৫.৮, ১৫.১...	৯৫.৯৫
টেক্‌নেশিয়াম	৪৩	ষোলটি আইসোটোপ	সবই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা	৯৯.০০
রাথেনিয়াম	৪৪	১০২,১০৪,১০১, ১০০,৯৯,৯৬,৯৮	৩১.৫,১৮.৭,১৭,১২.৭ ১২.৭,৫.৫,১.৯	১০১.৭
রোডিয়াম	৪৫	১০৩	১০০	১০২.৯১
প্যালাডিয়াম	৪৬	১০৬,১০৮,১০৫, ১১০, ১০৪,১০২	২৭.১,২৬.৭,২২.৬...	১০৬.৭
রৌপ্য(সিলভার)	৪৭	১০৭,১০৯	৫১.৩৫,৪৮.৬৫	১০৭.৮৮
ক্যাডমিয়াম	৪৮	১১৪,১১২,১১১ ..	২৮.৮,২৪,১২.৮...	১১২.৪১
ইণ্ডিয়াম	৪৯	১১৫,১১৩	৯৫.৮,৪.২	১১৪.৭৬
টিন	৫০	১২০,১১৮,১১৬,১১৯ ১১৭,১২৪,১২২, ১১২,১১৪,১১৫	৩২.৯,২৩.৯,১৪.২, ৮.৬,৭.৬,৬,৪.৮ ১,০.৬৫,০.৩৫	১১৮.৭
এ্যান্টিমনি	৫১	১২১,১২৩	৫৭.২৫,৪৭.৭৫	১২১.৭৬
টেলুরিয়াম	৫২	১৩০,১২৮,...	৩৪.৩৫,৩১.৮...	১২৭.৬১

মৌলিক পদার্থ	পারমাণবিক সংখ্যা	বিভিন্ন পারমাণবিক ভার বা আইসোটোপের ভার	আইসোটোপের শতকরা অনুপাত	গড়পড়তা পরমাণুভার
আয়োডিন	৫৩	১২৭	১০০	১২৬ ৯১
জেনন(xenon)	৫৪	১৩২,১৩১,···	২৬·৯৩,২১·২৪···	১৩১·৩
সিজিয়াম	৫৫	১৩৩	১০০	১৩২·৯১
বেরিয়াম	৫৬	১৩৮,১৩৭,১৩৬...	৭১·৭,১১·৩,৭·৮	১৩৭ ৩৬
ল্যান্থানাম	৫৭	১৩৯,১৩৮	৯৯·৯১১,০·০৮৯	১৩৮·৯২
সিরিয়াম	৫৮	১৪০,১৪২···	৮৮·৪৫,১১·১	১৪০·১৩
প্রাসিওডিমিয়াম	৫৯	১৪১	১০০	১৪০·৯২
নিওডিমিয়াম	৬০	১৪২,১৪৪,১৪৬···	২৬·৯,২৩·৯,১৭·৩	১৪৪·২৭
			সবই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা	১৪৫·০০
প্রসেথিয়াম	৬১	ছয়টি আইসোপ সবই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা		
সামারিয়াম	৬২	১৫২,২৫৪,১৪৭···	২৭,২৩,১৫···	১৫০·৪৩
ইউরোপিয়াম	৬৩	১৫৩,১৫১	৫২·২,৪৭·৮	১৫২·০০
গ্যাডোলিনিয়াম	৬৪	১৫৮,১৬০,১৫৬...	২৪·৮,২১·৭,২০·৬···	১৫৬·৯
টার্বিয়াম	৬৫	৫৯	১০০	১৫৯·২
ডিস্‌প্রোসিয়াম	৬৬	১৬৪,১৬২,১৬৩···	২৮·২,২৫·৫,২৫,···	১৬২·৪৬
হোমিয়াম	৬৭	১৬৫	১০০	১৬৪·৯৪
আর্বিয়াম	৬৮	১৬৬, ১৬৮, ১৬৭···	৩২·৯, ২৬·৯, ২৪·৪	১৬৭·২
থুলিয়াম	৬৯	১৬৯	১০০	১৬৯·৪
ইটার্বিয়াম	৭০	১৭৪, ১৭২, ১৭৩,···	৩১·৮,২১·৯,১৬·২···	১৭৩·০৪
ক্যাসিওপিয়াম	৭১	১৭৫, ১৭৬	৯৭·৫, ২·৫	১৭৪·৯৯
হাফ্‌নিয়াম	৭২	১৮০, ১৭৮, ১৭৭, ··	৩৫·৪, ২৭·১, ১৮·৪	১৭৮·৬
ট্যাণ্ট্যালাম	৭৩	১৮১	১০০	১৮০·৮৮
টাংস্‌টেন	৭৪	১৮৪, ১৮৬, ১৮২,···	৩০·৭,২৮·৬,২৬·৩···	১৮৩·৯২

মৌলিক পদার্থ	পারমাণবিক সংখ্যা	বিভিন্ন পারমাণবিক ভার বা আইসোটোপের ভার	আইসোটোপের শতকরা অনুপাত	গড়পড়তা পরমাণুভার
রেনিয়াম	৭৫	১৮৭, ১৮৫	৬২·৯, ৩৭·১	১৮৬·৩১
অস্‌মিয়াম	৭৬	১৯২, ১৯০, ১৮৯,···	৪১,২৬·৪,১৬·১···	১৯০·২
ইরিডিয়াম	৭৭	১৯৩, ১৯১	৬১·৫, ৩৮·৫	১৯৩·১
প্ল্যাটিনাম	৭৮	১৯৫, ১৯৪, ১৯৬,···	৩৩·৭,৩২·৮,২৫·৪···	১৯৫·২৩
স্বর্ণ	৭৯	১৯৭	১০০	১৯৭·২
পারদ (মার্কারি)	৮০	২০২, ২০০, ১৯৯, ২০১, ১৯৮, ২০৪, ১৯৬	২৯·২৭, ২৩·৭৭, ১৬·৪৫, ১৩·৬৭, ৯·৮৯, ৬·৮৫, ০·১	২০০·৬১
থ্যালিয়াম	৮১	২০৫, ২০৩	৭০·৫, ২৯·[illegible]	২৯৪·৩৯
সীসক (লেড)	৮২	২০৮, ২০৬, ২০৭, ২০৪	৫১·৩, ২৩·৬, ২২·৬,১·৫	২০৭·৩৯ ২০৭·২২
বিস্‌মাথ্‌	৮৩	২০৯	১০০	২০৯
* পোলোনিয়াম	৮৪	২০৮*, ২০৯*··· ২১৬*, ২১৮*	কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়	২১০
এ্যাসটাটিন	৮৫	২১০*, ২১১*, ২১৫*, ২১৬*, ২১৮*, ২১৯*,	ঐ	২১০
* রেডন	৮৬	২১৮*···২২২*	ঐ	২২২
ফ্রান্সিয়াম	৮৭	২২১*, ২২৩*	ঐ	২২৩
রেডিয়াম	৮৮	২২৬*, ২২৩*, ২২৪*, ২২৮*,		২২৬
এ্যাক্‌টিনিয়াম	৮৯	২২৭*, ২২৮*		২২৭
থোরিয়াম	৯০	২৩২*	১০০	২৩২·১২
প্রোটো-এ্যাক্টিনিয়াম	৯১	২৩০*···২৩৪*	কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়	২৩১
ইউরেনিয়াম	৯২	২৩৮*, ২৩৫*, ২৩৪*	৯৯·২৮, ০·৭১৫, ০·০০৫	২৩৮
নেপ চুনিয়াম	৯৩	২৬৭*, ২৩৯*	কৃত্রিম	২৩৭

মৌলিক পদার্থ	পারমাণবিক সংখ্যা	বিভিন্ন পারমাণিক ভার বা আইসোটোপের ভার	আইসোটোপের শতকরা অনুপাত	গড়পড়তা পরমাণুভার
প্লুটোনিয়াম	৯৪	২৩৬*, ২৩৮*, ২৩৯*, ২৪০*, ২৪১*	কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়	২৩৯
আমেরিকিয়াম	৯৫	২৪১*,২৪২*,২৪৩*	ঐ	২৪৩
কুরিয়াম	৯৬	২৪২*,২৪৩*,২৪৪*	ঐ	২৪৫
বার্কলিয়াম	৯৭	২৪৩*, ২৪৫*	ঐ	২৪৫
ক্যালিফোর্নিয়াম	৯৮	২৪৪*, ২৪৬*, ২৪৮*, ২৫০*, ২৫২*	ঐ	২৪৬
আইন্‌ষ্টাইনিয়াম	৯৯	২৫৩*, ২৫৪*	ঐ	
ফের্মিয়াম	১০০	২৫৪*, ২৫৫	ঐ	

অধ্যায়—২২

কস্‌মিক রশ্মি বা ব্যোম জ্যোতি

বৈজ্ঞানিকরা কোন কিছুকে 'সামান্য' বলে অবহেলা করেন না। সামান্য গরমিল কোথাও দেখলেই বৈজ্ঞানিকরা উঠে পড়ে লাগেন তার মূল কারণ অনুসন্ধান করতে। এইভাবে 'তুচ্ছ' ব্যাপার থেকে বড় তথ্য বেরিয়ে আসে।

সাধারণ বায়ু বিদ্যুতের অপরিচালক। বাতাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে না। এটাই জানা আছে, এবং নড়চড় হবার কথা নয়। কিন্তু সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় বায়ু সর্বদাই বিদ্যুতের সামান্য পরিচালক। এত সামান্য যে প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এই নিয়ে ভাবতে লাগলেন।

তবে একথা জানা আছে যে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় ধাতু থেকে যে সব রশ্মি বেরোয় তার আঘাতে বাতাস হয়ে পড়ে বিদ্যুতের পরিচালক। বাতাসের মধ্য দিয়ে রঞ্জন রশ্মি গেলেও বাতাস বিদ্যুতের পরিচালক হ'য়ে পড়ে। ব্যাপারটা এই, বাতাসের অণুতে সমান সমান ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকাতে ওরা বিদ্যুৎ প্রভাব হীন। কিন্তু তেজস্ক্রিয় ধাতুর রশ্মি বা রঞ্জনরশ্মি এসে আঘাত করলে বাতাসের অণুর দু-একটি ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যায়, তখন বিদ্যুতের সাম্য (balance) নষ্ট হ'য়ে যায়। ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবার ফলে অণুগুলিতে ধনবিদ্যুতের প্রাধান্য হয়ঃ অণুর এ অবস্থাকে বলে আয়ন (ion)। যে সব রশ্মি অণু থেকে ইলেকট্রন তাড়িয়ে অণুকে আয়নে পরিণত করে তাদের বলে আয়নকারী রশ্মি (ionizing radiation)। বায়ু কণার আয়ন সৃষ্টি হলে সে তখন বিদ্যুতের পরিচালক হ'য়ে ওঠে।

বাতাসকে যদি সর্বদাই সামান্য পরিচালক দেখা যায় তাহ'লে বুঝতে হবে বাতাসের ওপর সর্বদাই আয়নকারী রশ্মি এসে পড়ছে। আয়নকারী

রশ্মি বন্ধ হওয়া মাত্র বাতাসের পরিচালকত্ব লোপ পাবে। কিন্তু বাতাস সর্বদাই সামান্য পরিচালক। তাহ'লে আয়নকারী রশ্মিও সর্বদা চলাচল করছে বুঝতে হবে। এই সব রশ্মি কি? কোথা থেকে আসে?

বৈজ্ঞানিকরা প্রথমে সন্দেহ করলেন, মাটির মধ্যে কোথাও না কোথাও তেজস্ক্রিয় ধাতু আছে, তা' থেকেই আয়নকারী রশ্মি সর্বদা আসছে। এই ভেবে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড ও ম্যাক্‌লেনান একটা বায়ু নল নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন, সেটাকে সীসের চাদর দিয়ে ঢেকে। সীসের চাদরে তেজস্ক্রিয় ধাতুর রশ্মি আটকায়। কিন্তু সীসের চাদরে মোড়া কাচ নলের বায়ুও দেখা গেল বিদ্যুতের পরিচালক। বিকীরক বা তেজস্ক্রিয় ধাতুর প্রভাব হ'লে সীসের চাদরেই তা আটকানো যেতো। তাহ'লে বুঝতে হবে বাতাসের আয়নকারী রশ্মি তেজস্ক্রিয় ধাতুর নয়, এ রশ্মি আরো বিদারণক্ষম এবং অন্য কোথাও থেকে আসছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভিক্টর হেস (Victor Hess) বেলুনে যন্ত্রপাতি নিয়ে উঠলেন। পৃথিবীর তেজস্ক্রিয় পাথর থেকে দূরে যাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। বেলুন উড়তে উড়তে পৃথিবী থেকে তিন মাইল উঠল। হেস দেখলেন যত উপরদিকে যাওয়া যায় এই অদ্ভূত অজানা রশ্মির প্রভাব ততই বেশী হয়। এ থেকে বোঝা গেল এই রশ্মি মাটির মধ্যে তেজস্ক্রিয় ধাতু থেকে আসছে না, আসছে আকাশ থেকে। আবার দেখলেন, দিনে রাতে এই রশ্মির কোনও তারতম্য হয় না। অতএব সূর্য থেকে এই রশ্মি আসছে তা-ও বলা চলে না।

এরপর মিলিকান ও রেগেনার বরফ জমা হ্রদের তলদেশে যন্ত্রপাতি নামিয়ে দিলেন এক মাইল পর্যন্ত। দেখা গেল বরফ ও জলের নিচে এই অজানা রশ্মির তীব্রতা ক্রমশঃ কমে আসে। এ থেকেও বোঝা গেল এই রশ্মি মাটি থেকে আসছে না, আসছে আকাশের চতুর্দিক থেকে। এই কারণে এই রশ্মির নাম হ'লো কস্‌মিক রে (cosmic ray) বা ব্যোম জ্যোতি। বর্তমানে এই নামই প্রচলিত, প্রথমে আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে বলা হ'তো হেস-রশ্মি। কস্‌মিক রশ্মি আবিষ্কার করার জন্য ভিক্টর হেস ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

কস্‌মিক রশ্মি কোথা থেকে কী ভাবে সৃষ্টি হ'য়ে আসে তা এখনও সঠিক জানা যায় নি। আবিষ্কারের পর থেকে নানা উপায়ে কস্‌মিক রশ্মির স্বরূপ জানবার চেষ্টা চলেছে। মহাকাশের চতুর্দিক থেকে এই অতি বিদারণক্ষম আয়নকারী রশ্মি পৃথিবীতে আসছে। ভূপৃষ্ঠে আসবার আগেই বায়ুমণ্ডলে এই রশ্মির বায়ু কণার সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে। সংঘর্ষের ফলে নানা রকম বিদ্যুৎ বা অন্য মৌলিক কণা বায়ুমণ্ডল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে। এদেরও সাধারণ ভাবে কস্‌মিক রশ্মি বলে, এরা অবশ্য মৌলিক বা প্রাথমিক (primary) কস্‌মিক রশ্মি নয়, দ্বিতীয় ধাপে (secondary) সৃষ্ট রশ্মি।

ভূ-পৃষ্ঠে তাই দুই জাতের কস্‌মিক রশ্মিই মিশিয়ে আসে। বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্য প্রাথমিক কস্‌মিক রশ্মির স্বরূপ জানা। এর জন্য উঠতে হবে বহু উর্ধ্বে। হেস উঠেছিলেন তিন মাইল। মানুষ নিয়ে বেলুন বেশী উঁচুতে উঠতে পারে না। তাই মানুষ ছাড়া বেলুন পাঠাতে বৈজ্ঞানিকরা মনস্থ করলেন। বেলুনের মধ্যে স্বলিপিকারক যন্ত্র (self recording instruments) বসিয়ে বেলুন ছাড়া হ'তে লাগল। বেলুন উপরে উঠলে যন্ত্রে কস্‌মিক রশ্মির ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ হ'তে থাকে, বৈজ্ঞানিকরা নিচে থেকে দূরবীন দিয়ে বেলুনের উপর নজর রাখেন। বহুক্ষণ পরে বেলুনটি যখন মাটিতে নেমে আসে তখন দেখা যায় যন্ত্রের মধ্যে কী কী খবর এলো।

এতেও যথেষ্ট অসুবিধা আছে। অনেক সময় বেলুনটি বাতাসের স্রোতে ভেসে যায়, উদ্ধার করা যায় না। তখন বৈজ্ঞানিকরা বেলুনের মধ্যে বেতার প্রেরক যন্ত্র বসিয়ে দিলেন। কস্‌মিক রশ্মি বেলুনের যন্ত্রে প্রবেশ করলেই সে খবর ঘরে বসে রেডিওতে ধরা যায়। এই উপায়ে রেগেনার ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মাটি থেকে ১৬ মাইল উপর পর্যন্ত কসমিক রশ্মির ক্রিয়াকলাপ জানতে পারলেন। কোলহয়েষ্টার এবং মিলিকানও স্বলিপিকার যন্ত্রের সাহায্যে উর্ধ্বাকাশে ও হ্রদের জলের তলে কস্‌মিক রশ্মির প্রভাব সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করলেন।

বর্তমানে স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে এই রকম রেডিও ট্রান্সমিটার বসিয়ে কস্‌মিক রশ্মির তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। স্পুটনিক উঠছে পৃথিবী ছেড়ে হাজার মাইল উপরে।

কস্‌মিক রশ্মি সম্পর্কে প্রধান তথ্য এইগুলি :—

(১) রঞ্জন রশ্মি ও গামা রশ্মির মতো এই রশ্মি অপরিচালক বাতাসকে বিদ্যুতের পরিচালক করে। (২) কস্‌মিক রশ্মি গামা রশ্মির চেয়েও শতগুণ বিদারণক্ষম, তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও গামা রশ্মির চেয়ে অনেক ছোট। (৩) কস্‌মিক রশ্মির মধ্যে গামারশ্মির মতো তরঙ্গ রশ্মি আছে, বিদ্যুৎ কণারূপী রশ্মিও আছে। (৪) আকাশের সকল দিক থেকেই কস্‌মিক রশ্মি সমান ভাবে আসে। (৫) কস্‌মিক রশ্মির আঘাতে বাতাস বা অন্য গ্যাস শুধু আয়নিত (ionized) হয় তা নয়, পরমাণু কেন্দ্রও চূর্ণ হয়।

অদৃশ্য কস্‌মিক রশ্মির অস্তিত্ব কী করে জানা যায় সে কথা বলছি। সাধারণতঃ দু-রকমের যন্ত্র কসমিক রশ্মি (এবং তেজস্ক্রিয় বস্তুর আয়নকারী রশ্মি) পরিমাপ করতে ব্যবহার হয়। একটির নাম গাইগার কাউণ্টার (Geiger Counter) ও অন্যটি উইলসন আধার (Wilson Chamber)।
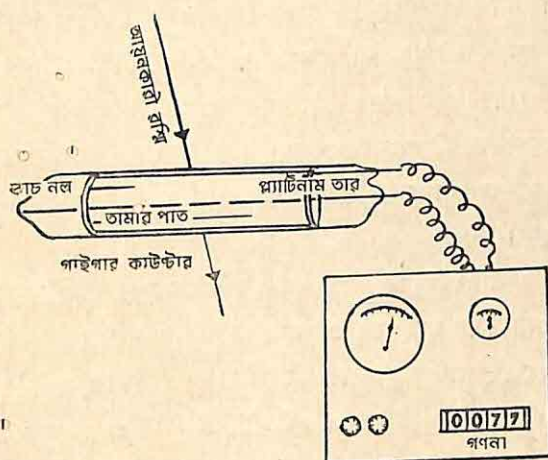
চিত্র—৩৩ গাইগার কাউণ্টার।

গাইগার কাউণ্টারে থাকে একটি মোটা কাচনল। ভিতরের বাতাস কিছুটা পাম্প ক'রে কমিয়ে নেওয়া হয়। নলের মধ্যে ধাতুর তার ও পাত থাকে। ধাতুর পাত ও তারের মধ্যে সংযোগ নেই। সংযোগ শুধু নলের বাতাসের মধ্য দিয়ে। বিদ্যুৎ চক্রের (electric circuit) সঙ্গে যোগ করা

থাকলেও বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না, কারণ নলের বাতাস স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুতের অপরিচালক। কিন্তু যেই একটি কসমিক রশ্মি নল ভেদ ক'রে গেল অমনি নলের বায়ু হ'য়ে পড়ল পরিচালক, আর তৎক্ষণাৎ চক্রে বিদ্যুৎ চলল। বিদ্যুৎ চললেই ছোট একটি মিটারে গুণতি হ'য়ে গেল। এইভাবে যতবার কস্‌মিক রশ্মি গাইগার কাউন্টার নলের মধ্য দিয়ে যায় ততবার খট্ খট্ করে গুণতি মিটারে ১, ২, ৩...উঠতে থাকে।

তেজস্ক্রিয় ধাতুর খনি আবিষ্কার করতেও গাইগার কাউন্টার ব্যবহার করা হয়। কোনও খনিজ পাথরে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি থাকা সম্ভব সন্দেহ হ'লে তার এক টুকরা গাইগার কাউন্টার যন্ত্রের কাছে ধরা হয়। পাথরে তেজস্ক্রিয় ধাতু থাকলে যন্ত্রে বিকীরক রশ্মির সংখ্যা মিটারে উঠতে থাকে। এই যন্ত্র এরোপ্লেনে বসিয়ে নিচু দিয়ে উড়লে তেজস্ক্রিয় ধাতুর খনির সন্ধান করা সম্ভব। মোটর গাড়ী বা জিপ গাড়ীতে গাইগার কাউন্টার যন্ত্র নিয়ে এই সন্ধানী কাজ আরো ভালো ভাবে করা যায়। যেখানে গাড়ী যায় না, সেখানে সন্ধানকারী বৈজ্ঞানিকরা এই যন্ত্র পিঠে বেঁধে পাহাড় পর্বত পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান। যন্ত্রে খট্ খট্ শব্দ হলেই বুঝতে পারেন নিকটেই তেজস্ক্রিয় ধাতুর খনি আছে। যত দ্রুত গুণতি ওঠে, বুঝতে হয় খনিজ পাথরের তেজস্ক্রিয়তা তত বেশী, অথবা খনির খুব কাছে এসে পড়েছেন।

কসমিক রশ্মি বা অন্যান্য আয়নকারী রশ্মির সংখ্যা নির্ণয়ের এই পদ্ধতি জার্মান বৈজ্ঞানিকদ্বয় গাইগার ও মূলার আবিষ্কার করেন। এই কারণে এই যন্ত্রের নাম হয়েছে গাইগার-মূলার কাউন্টার বা গাইগার কাউন্টার।

ইংরেজ বৈজ্ঞানিক উইলসন (C. T. R. Wilson) কস্‌মিক রশ্মি ও অন্যান্য আয়নকারী রশ্মির গতিবিধি প্রত্যক্ষ করবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন। বিশেষ ধরনের কাচের কৌটার মধ্যে সামান্য পরিমাণ জল রাখা থাকে, কৌটায় বদ্ধ বাতাস জলীয় বাষ্পে পূর্ণ বা পরিপৃক্ত (saturated) হ'য়ে ওঠে। আধার বা কৌটাটির পিছনে একটি ধাতব পাতের ঢাকনী, এটি স্প্রিং-এর টানে হঠাৎ পিছিয়ে গেলে কৌটোর জোলো-বাতাস মুহূর্তের মধ্যে শীতল হয়ে পড়ে। এই সময় যদি কসমিক রশ্মি বা তেজস্ক্রিয়

ধাতুর আয়নকারী রশ্মি কৌটার মধ্য দিয়ে যায় তাহ'লে সেই পথে বাতাসের আয়নের উপর জল কণা জমে ধূম্র রেখা (বা মেঘ রেখা) সৃষ্টি করে। ক্যামেরার সাহায্যে এই রেখার ছবি তৎক্ষণাৎ তুলে নেওয়া যায়। উইলসন আধারের সাহায্যে কসমিক রশ্মি ও তেজষ্ক্রিয় রশ্মির গতিবিধি ও তাদের অন্যান্য অণুপরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলাফল চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপাদি করা সম্ভব।

উইলসন আধারের মধ্যে চুম্বক বল প্রয়োগ করলে অনেক ধূম্ররেখা বাঁকা হয়। ধাবমান বিদ্যুৎ কণার পথে জলকণা জমে ধূম্ররেখা সৃষ্টি হয়। সেই সব বিদ্যুৎকণা চুম্বক বলের প্রভাবে সোজা পথে চলতে পারে না। আয়নকারী বিদ্যুৎ কণাগুলি চুম্বকের প্রভাবে বেঁকে চলে বলে ধূম্ররেখাও ঐ পথে বাঁকা রেখা হয়ে ফুটে ওঠে। চুম্বক বল বেশী হলে আয়ন পথের বক্রতা বেশী হয়। আবার, কসমিক রশ্মি বা অন্যান্য আয়নকারী বিদ্যুৎকণার গতিবেগ যত বেশী হয়, রেখার বক্রতা তত অল্প হয়। গতিবেগ অল্প হলে বেশী বাঁকা হয়।* এই কারণে চুম্বকের বল ও আয়ন পথের বক্রতা দেখে গতিবেগের তারতম্য বোঝা যায়। আবার, ধনবিদ্যুৎ ও ঋণ বিদ্যুৎ কণার পথ বিপরীত দিকে বাঁকা ব'লে সহজেই তাদের পৃথক ক'রে চেনা যায়। এই ভাবে উইলসন আধার ও চুম্বকের সাহায্যে বিভিন্ন বিদ্যুৎকণার জাতি (+ বা −), বিদ্যুৎ পরিমাণ, ভার, গতিবেগ ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এণ্ডারসন (Carl Anderson) এক অভিনব ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। উইলসন আধারের মধ্যে মোম বা অন্য দ্রব্য রাখলে কসমিক রশ্মির আঘাতে তা থেকে বিদ্যুৎকণা উৎক্ষিপ্ত হয়, তাদের ধূম্ররেখাও সৃষ্টি হয়। চুম্বক প্রয়োগ ক'রে দেখলেন কখন কখন যুগল বিদ্যুৎকণা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে এবং যুগলের একটি একদিকে বেঁকেছে অন্যটি অন্যদিকে বেঁকেছে। অতএব একটি ঋণ বিদ্যুৎ কণা অন্যটি ধনবিদ্যুৎ কণা। আবার এণ্ডারসন দেখলেন দুই রেখার বক্রতা সমান। পরিমাপ করে বুঝলেন একটি সুপরিচিত ইলেকট্রন (ঋণ বিদ্যুৎ)। তাহ'লে অন্যটি সমান মাপের ধন বিদ্যুৎ, অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিমাণ ও ভারে ইলেকট্রনের সমান শুধু জাতিতে ধনবিদ্যুৎ। একে

বলা যায় ধন-ইলেকট্রন। নাম দেওয়া হ'লো পজিট্রন। পজিট্রন আবিষ্কার করার জন্য এণ্ডারসন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

যে বছর (১৯৩২ খৃষ্টাব্দ) এণ্ডারসন পজিট্রন আবিষ্কার করেন সে বছরেই স্যাডউইক (James Chadwick) আর একটি মৌলিক জড়কণা আবিষ্কার করেন। বহু আগেই রাদারফোর্ড রেডিয়াম ইত্যাদির আল্‌ফা রশ্মি দিয়ে আঘাত ক'রে নানা বস্তুর পরমাণু ভাঙ্গা-গড়ার পথ দেখান। এই পদ্ধতি দিয়ে পরমাণু ও কেন্দ্রীয় জগতের কত তথ্য আবিষ্কার হয়েছে। জোলিও কুরি ঐ পদ্ধতিতে বেরিলিয়াম ধাতুকে আল্‌ফা রশ্মি দিয়ে আঘাত ক'রে পরীক্ষা করেছিলেন উইলসন আধারের মধ্যে। বুঝলেন এই ভাবে বেরিলিয়াম থেকে এক অতি বিদারক রশ্মি স্থষ্টি হচ্ছে। এই রশ্মি চুম্বকে পথভ্রষ্ট হয় না। গামা রশ্মিও (বা রঞ্জন রশ্মি) চুম্বক বলের প্রভাবে বাঁকে না। প্রথমে সবাই ভাবলেন আল্‌ফা রশ্মির আঘাতে বেরিলিয়াম থেকে কোন অতি-বিদারণক্ষম গামারশ্মি স্থষ্টি হচ্ছে। কিন্তু একটা খটকা থেকে গেল। গামা রশ্মি উইলসন আধারে মেঘ রেখা স্থষ্টি করে, কিন্তু এই রশ্মি তা করছে না।

তখন স্যাডউইক এই নিয়ে বিশদভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। ক্রমে ক্রমে বুঝলেন এই রশ্মি গামা-রূপী তরঙ্গ-ধর্মী নয়, কণা-ধর্মী। অথচ এই কণা ইলেক্‌ট্রন বা প্রোটনের মতো বিদ্যুৎ কণা হ'তে পারে না, তাহ'লে উইলসন আধারে রেখা স্থষ্টি করতো। স্যাডউইক সিদ্ধান্ত করলেন এই রশ্মি বিদ্যুৎ বিহীন কণা, নিছক জড় কণা। নানান পরীক্ষা থেকে তিনি বুঝলেন এই মৌলিক জড় কণার ভার প্রোটনের সমান। এই বিদ্যুৎ-হীন কণার নাম হ'লো নিউট্রন (neutron)। স্যাডউইক ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এর জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন।

স্যাডউইকের নিউট্রন আবিষ্কার কেন্দ্রীন বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। রাদারফোর্ড যেমন আল্‌ফা রশ্মিকে পরমাণু চূর্ণ করবার অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করেছিলেন, বর্তমানে নিউট্রনকে সেই ভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পরমাণু চূর্ণ করবার ব্যাপারে নিউট্রনের ক্ষমতা আল্‌ফা কণার চেয়ে অনেক বেশী। আল্‌ফা কণা নিউট্রনের চতুর্গুণ ভারী হলেও সে ধনবিদ্যুৎ

যুক্ত। আল্‌ফা কণা ধনবিদ্যুৎযুক্ত হওয়াতে কোনও এটম কেন্দ্রের কাছে এসে পড়লেই কেন্দ্রীন তাকে বিকর্ষণ করে, কারণ সব পরমাণু কেন্দ্রীনই ধনবিদ্যুৎ কণার সমষ্টি। বিকর্ষণের ফলে ঘাতকারী আল্‌ফা কণার গতি-শক্তি আঘাত করবার আগেই অনেক কমে যায়। এমন কি কোন কোন সময় কেন্দ্রীনের কাছে পৌঁছানোর আগেই বিকর্ষণের ফলে আল্‌ফা কণা দূর হয়ে যায়, আঘাত করবার সুযোগই পায় না। কিন্তু নিউট্রনের সে বাধা নেই। নিউট্রন বিদ্যুৎ-হীন বলে বিকৃষ্ট হয় না, পরমাণু কেন্দ্রে সবেগে প্রবেশ ক'রে তাতে চূর্ণ বিধ্বস্ত করতে পারে।

এবার মৌলিক কণাগুলির (fundamental particles) হিসাব নেওয়া যাক। যদি মনে করা যায় প্রকৃতির মধ্যে সর্বদাই প্রতিচ্ছবির মতো যুগল বস্তুর দেখা পাওয়া যাবে তাহ'লে ইলেকট্রনের যুড়ি পজিট্রন; দুটিরই বিদ্যুৎ পরিমাণ ও জড়মান সমান, শুধু বিদ্যুৎ জাতিতে এরা বিপরীত। প্রোটনের সমকক্ষ নিউট্রন, এরা সমান ভারের। প্রোটনে ধন বিদ্যুৎ, নিউট্রন বিদ্যুৎ-হীন। বাকী থাকে প্রোটনের বিদ্যুৎ-যুড় ঋণ-প্রোটন বা এন্টিপ্রোটন, এবং ইলেকট্রন বা পজিট্রনের বিদ্যুৎহীন প্রতিদ্বন্দ্ব নয়ট্রনো।

বিদ্যুৎহীন ইলেকট্রন বা নয়ট্রনোর অস্তিত্ব থাকা বেশ সম্ভব বলে কোন কোন বৈজ্ঞানিক অনেকদিন থেকেই মত প্রকাশ করছেন, এবং অবশেষে তার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া গিয়েছে। এই সূক্ষ্ম নয়ট্রিনো কণা বিদ্যুৎহীন হলে তার ধরা-ছোঁয়া পাওয়া দুষ্কর, প্রায় অসম্ভব। বিদ্যুৎহীন বলে উইলসন আধারে পথরেখা সৃষ্টি করবে না, গাইগার কাউন্টারেও গণতি করা যাবে না। আবার সে নিউট্রনের মতো গুরুভারও নয় যে অন্য পরমাণু চূর্ণ করে আপনার ক্ষমতা ও অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে এক জাতীয় অদ্ভুত বিদ্যুৎকণা আবিষ্কার হয়েছে যাকে 'ভারী-ইলেকট্রন' বলা যায়। এর নাম দেওয়া হয়েছে মেসোট্রন বা মেসন (meson)। মেসনের বিদ্যুতের পরিমাণ ইলেকট্রনের সমান, কিন্তু ওজনে ইলেকট্রনের ১৫০-২০০ গুণ বেশী। পারমাণবিক ভার অনুসারে ইলেকট্রনের ভার ১/১৮৫০, মেসনের ভার প্রায় $\frac{১}{১০}$। মেসন আসে আকাশ থেকে, কস্‌মিক রশ্মির সঙ্গে। অনুমান,

মূল কসমিক রশ্মির আঘাতে বায়ুমণ্ডলে মেসন সৃষ্টি হয়। আরো অদ্ভুত এই যে মেসন তেজস্ক্রিয় পরমাণুর মতো বিকিরণশীল, স্বতঃভঙ্গুর। দেখা গিয়েছে, মেসন আপনা হ'তেই খণ্ডিত হয়ে যায়, একখণ্ড হয়ে পড়ে সাধারণ ইলেকট্রন। অন্য খণ্ড হয় নিরুদ্দেশ, তাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন এই নিরুদ্দিষ্ট খণ্ডটিই নয়ট্রিনো।

মৌলিক কণার তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

মৌলিক কণা	বিদ্যুৎজাতি	ভার	আবিষ্কর্তা
ইলেকট্রন	−	১/১৮৫০	জে. জে. টমসন
প্রোটন	+	১	ঐ
পজিট্রন	+	১/১৮৫০	কার্ল এণ্ডারসন
নিউট্রন	০	১	জেম্‌স্ স্যাডউইক
মেসন	− ও +	১/১০	কার্ল এণ্ডারসন
নয়ট্রিনো	০	১/১৮৫০ থেকে ১/১০	রাইনেস ও কাওয়ান
এন্টিপ্রোটন	−	১	সেগ্রে 17

এখন কেউ কেউ ভাবছেন এই সব মৌলিক কণা সত্যই মৌলিক কিনা। এমনও হ'তে পারে, গুটিকয়েক থেকে অন্যগুলি সৃষ্ট হয়েছে। প্রোটনের কথাই ধরা যাক। প্রোটন একটি মৌলিক কণা। যদি বলা যায় প্রোটন মৌলিক কণা নয়, প্রোটন সৃষ্ট হয়েছে নিউট্রন ও পজিট্রন সংযোগে, তাহলে কি ভুল হবে? এর উত্তর দেওয়া কঠিন। আবার এও বলা যেতে পারে, নিউট্রন মৌলিক কণা নয়, প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংযোগে নিউট্রন তৈরী হয়েছে। যা-ই হোক এ সমস্যার মিমাংসা না হওয়া পর্যন্ত নিউট্রন ও প্রোটন উভয়কেই মৌলিক কণা বলা সঙ্গত।

আগে বলেছি, পরমাণু কেন্দ্রীনের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন ছাড়া আর কিছু নেই। কেন্দ্রের প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা দিয়ে বিভিন্ন মৌলিক দ্রব্য ও আইসোটোপের খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু তাহলে তেজস্ক্রিয় দ্রব্যের কেন্দ্র থেকে বিটারশ্মি (ইলেকট্রন) কী করে আসে? কোন কোন ক্ষেত্রে পজিট্রনও আসে। কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন ও পজিট্রন নেই ধরা হচ্ছে অথচ সেখান থেকেই ইলেকট্রন ও পজিট্রন আসছে!

এ থেকেই ঐ সন্দেহ। নিউট্রনকে যদি প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংযোগ-ফল ধরা যায় তাহলেই কেন্দ্রীন থেকে ইলেকট্রন আসতে পারে। আবার প্রোটনকে যদি নিউট্রন ও পজিট্রনের সংযোগ-ফল ধরা যায় তা'হলেই কেন্দ্রীন থেকে পজিট্রন বিকীর্ণ হতে পারে। তাই, যে ভাবেই দেখা যাক, কোনটিকেই 'মৌলিক কণা' শ্রেণী থেকে বাদ দেওয়া যায় না।

অধ্যায়—২৩

পরমাণু চূর্ণ ও রূপান্তর করা

মৌলিক পদার্থের গুণাগুণ নির্ভর করে পরমাণু কেন্দ্রের গঠনের ওপর, সেকথা একবিংশ অধ্যায়ে বলেছি। পরমাণু কেন্দ্রের নাম নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন। কেন্দ্রীনে কতগুলি প্রোটন এবং কতগুলি নিউট্রন আছে তার উপরই দ্রব্য বিচার নির্ভর করে। তাহ'লে কেন্দ্রীনের মৌলিক কণাগুলির সংখ্যা অদল বদল করতে পারলে দ্রব্যটিই বদলে যাবে। কেন্দ্রীনকে সজোরে আঘাত করতে পারলে এই প্রকার বিপর্যয় আনা যেতে পারে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড পরমাণু কেন্দ্রীনকে আঘাত করে ভাঙবার উপায় উদ্ভাবন করলেন। রেডিয়াম থেকে আলফা রশ্মি বা আলফা কণা বিচ্ছুরিত হয়। রাদারফোর্ড আলফা কণাকে এই কাজে নিয়োগ করলেন। নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে আলফা রশ্মি নিক্ষেপ ক'রে দেখলেন নাইট্রোজেন গ্যাস বদলে গিয়েছে, সেখানে হয়ে রয়েছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। কী ক'রে হ'লো? রাদারফোর্ড তার ব্যাখ্যা দিলেন। আলফা কণা ও নাইট্রোজেন পরমাণু সংঘর্ষের হিসাব এইরকম :—

(ক) সংঘর্ষের পূর্বে :

(১) নাইট্রোজেন কেন্দ্রীন, পারমাণবিক সংখ্যা ৭, ভার ১৪

(২) আলফা কণা (=হিলিয়াম কেন্দ্রীন), পঃ সংখ্যা ২, ভার ৪ ; তাহ'লে যুক্ত পারমাণবিক সংখ্যা ৭+২=৯
এবং যুক্ত পারমাণবিক ভার ১৪+৪=১৮

(খ) সংঘর্ষের পরে : (১৭ ভারের অক্সিজেন আইসোটোপ জন্মেছে)

(১) অক্সিজেন কেন্দ্রীন, পরমাণবিক সংখ্যা ৮, ভার ১৭

(২) হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন, পারমাণবিক সংখ্যা ১, ভার ১ ; তাহ'লে যুক্ত পারমাণবিক সংখ্যা=৮+১=৯
যুক্ত পারমাণবিক ভার=১৭+১=১৮

অর্থাৎ সংঘর্ষের পূর্বে ও পরে প্রোটন ও নিউট্রনের হিসাবে কোন গরমিল নেই, কোনও মৌলিক কণার সংখ্যা বাড়েনি বা কমেনি। শুধু কেন্দ্রীনের মধ্যে মৌলিক কণা অদল বদল হয়েছে, তাই নতুন জিনিস সৃষ্টি হয়েছে।

এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণ হ'লো মানুষ প্রকৃতির দেওয়া মৌলিক দ্রব্যকে অন্য দ্রব্যে পরিণত করতে পারে। আর প্রমাণ হ'লো রাদারফোর্ডের কেন্দ্রীন মতবাদ নির্ভুল বলে।

নাইট্রোজেন ও আলফা কণার সংঘর্ষের ফলাফল সংক্ষেপে এইভাবে লেখা যায়:

$$N^{1}{}_{7}{}^{4} + He_2{}^4 \rightarrow O_8{}^{17} + H_1{}^1$$
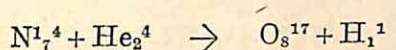
সংঘর্ষের পূর্বে সংঘর্ষের পরে

N মানে নাইট্রোজেন পরমাণু, সংক্ষেপে লেখা। He হ'লো আলফা কণা যেটা হিলিয়াম কেন্দ্রীনের সমান। O অর্থে অক্সিজেন, H অর্থে হাইড্রোজেন। নিচের সংখ্যাগুলি পরমাণু সংখ্যা, উপরের সংখ্যাগুলি পরমাণুভার জ্ঞাপক। নিচের সংখ্যাগুলি যোগ করলে ৯ হচ্ছে দু-দিকেই, তেমনি উপরের সংখ্যাগুলি যোগ করলে ১৮ হচ্ছে দু-দিকেই। অতএব হিসাব ঠিক।

এবার দেখা যাক এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সঙ্গে আলফা কণার সংঘর্ষে কী হয়। এ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ১৩, ভার ২৭ এবং আল্‌ফা কণার পারমাণবিক সংখ্যা ২, ভার ৪। সংঘর্ষের পরে এরা মিলিত হ'য়ে যায় এবং একটি নিউট্রন (বিদ্যুৎ = ০, ভার = ১) নিষ্ক্রান্ত হয়। তা'হলে এই মিলনের ফলে এমন একটি দ্রব্য সৃষ্টি হ'লো যার পারমাণবিক সংখ্যা ১৩ + ২ = ১৫, এবং ভার ২৭ + ৪ − ১ = ৩০। দ্রব্যটি কী? সেটা জানা যাবে পারমাণবিক সংখ্যা (১৫) থেকে। এটি ফস্‌ফরাস। এই সংঘর্ষের ফলাফল সংক্ষেপে এই ভাবে লেখা যায়:—

$$Al\,^{27}_{13} + He\,^{4}_{2} \rightarrow P^{30}_{15} + \text{একটি নিউট্রন}$$
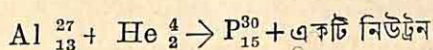
সংঘর্ষের পূর্বে সংঘর্ষের পরে

এর মধ্যে আরও একটি মজার কথা আছে। স্বাভাবিক ফস্‌ফরাসের

পারমাণবিক ভার ৩১, কিন্তু সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ৩০ ভারের ফস্‌ফরাস আইসোটোপ। এই জাতের ফসফরাস প্রকৃতিতে নেই, থাকা সম্ভবও নয়। কারণ ৩০ ভারের ফস্‌ফরাস ক্ষণস্থায়ী, এটি তেজস্ক্রিয়। মানুষই এটা সৃষ্টি করল, অতএব বলা যায় এটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের কেন্দ্রীন থেকে একটি পজিট্রন বিচ্ছুরিত হয়। পজিট্রনই হ'লো ফস্‌ফরাসের তেজস্ক্রিয় রশ্মি। ফস্‌ফরাস অন্ধকারে জলজল করে একথা মনে ক'রে সব ফস্‌ফরাসই 'তেজস্ক্রিয়' সে কথা ভাবলে ভুল হবে, দুই জাতের রশ্মি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের কেন্দ্রীন থেকে একটি পজিট্রন (+) বেরিয়ে গেলে কেন্দ্রীনের পারমাণবিক সংখ্যা এক ধাপ নেমে যায়, নতুন পরমাণুটির পারমাণবিক সংখ্যা ১৫—১ = ১৪ ; এতএব এটি সিলিকন। অর্থাৎ আলফা রশ্মির আঘাতে এ্যালুমিনিয়াম হয়ে পড়ল তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস, তার পরে হ'লো সিলিকন। এই ভাবে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি করার জন্য আইরীন ও ফ্রেডারিক জোলিও কুরী (এঁরা মাদাম কুরীর কন্যা-জামাতা) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

এ রকম দ্রব্য-রূপান্তর কস্‌মিক রশ্মির আঘাতেও ঘটে। তবে কসমিক রশ্মি এত অল্প মাত্রায় আসে যে বৈজ্ঞানিকরা তার উপর বিশেষ নির্ভর করতে পারেন না। আলফা রশ্মি বৈজ্ঞানিকদের হাতে আছে, তা দিয়েই অনেক পরমাণু ভাঙ্গাগড়ার পরীক্ষা চলে। তবে আজকাল দেখা গিয়েছে পরমাণু ভাঙ্গাগড়ার কাজে আলফা কণার চেয়ে নিউট্রন বেশী কার্যকর।

সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকরা এটম ভাঙ্গেন। পরমাণু চূর্ণ করতে অতি বেগবান মৌলিক কণার প্রয়োজন। তেজস্ক্রিয় ধাতু থেকে আলফা রশ্মি ও নিউট্রন পাওয়া যায়। কিন্তু আরো বেগবান, আরো বেশী সংখ্যক ঐ জাতীয় কণা সাইক্লোট্রনে উৎপন্ন করা যায়। সাইক্লোট্রন-যন্ত্র উদ্ভাবন করেন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক লরেন্স (E. O. Lawrence)। সাইক্লোট্রন যন্ত্র উদ্ভাবন করার জন্য লরেন্স ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

সাইক্লোট্রন যন্ত্রে কী ক'রে বিদ্যুৎ কণার গতিবেগ বাড়ানো যায় সে

কথা বলতে হলে একটু গোড়ার কথা বলে নেওয়া দরকার। ধরা যাক একটা কাচ নল বায়ুশূন্য করে সামান্য পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে দেওয়া হলো। ভ্যাকুয়াম নলের হাইড্রোজেনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করা সম্ভব (সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নলের মধ্যে দু-মাথায় দুটি ধাতুর চাক্তি বা ইলেক্‌ট্রোডের সাহায্যে বিদ্যুৎ চালনা করা যায়। দুই ইলেকট্রোডে ভোল্টেজ দিলেই বিদ্যুৎ চলতে থাকে বিরল হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্য দিয়ে। বিদ্যুৎ চলা মানে হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর বৈদ্যুতিক কণাগুলির চলা। হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন আছে। ইলেক্‌ট্রোডে কয়েক হাজার ভোল্ট পড়লেই ইলেকট্রন (−) গুলি ধন-ইলেকট্রোডের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছুটতে থাকে, প্রোটন (+) গুলি ঋণ ইলেকট্রোডের দিকে ছুটতে থাকে। ভোল্ট যত বেশী দেওয়া যায়, তাদের গতিবেগও তেমনি বেশী হয়। এই কারণে বিদ্যুৎকণার গতি জনিত শক্তি "ইলেকট্রন-ভোল্ট" মাত্রায় বলা হয়। দশহাজার ভোল্ট ব্যবহার করলে ইলেক্‌ট্রনের যে গতিশক্তি জন্মে তাকে বলা হয় দশহাজার ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট শক্তি, ৫০ হাজার ভোল্ট প্রয়োগ করলে ওদের গতিশক্তি বলা হবে পঞ্চাশ হাজার ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি, ইত্যাদি।

তাহ'লে প্রথমেই মনে হবে ভ্যাকুয়াম নলে যত খুসী ভোল্টের বিদ্যুৎ দিলেই বিদ্যুৎকণার শক্তি যত খুসী বাড়ানো যাবে। কিন্তু বিদ্যুতের ভোল্ট যত খুসী বাড়ানো সম্ভব না, নিরাপদও না। বৈজ্ঞানিকদের চাই দশলক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির বিদ্যুৎ কণা, যা দিয়ে পরমাণু চূর্ণ করা যাবে। এত ভোল্টের বিদ্যুৎ সামলানো যায়?

প্রথমে একটা ফন্দি বৈজ্ঞানিকদের মাথায় এলো। ভ্যাকুয়াম নলের হাইড্রোজেন রশ্মির কথা ধরা যাক। দশহাজার, বিশহাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়। তাহ'লে ভ্যাকুয়াম নলের মধ্যে বিশহাজার ভোল্টের প্রোটন ছুটবে। এই বিশ হাজার ভোল্টের প্রোটনকে যদি আবার বিশ হাজার ভোল্টের মধ্য দিয়ে পাঠানো যায় তাহলে তার শক্তি হবে চল্লিশ হাজার ভোল্টের সমান। অথচ ব্যবহার হচ্ছে বিশ হাজার ভোল্ট মাত্র। এই ভাবে প্রোটনকে যদি পঞ্চাশবার উপর্যুপরি বিশ

হাজার ভোল্টের মধ্য দিয়ে দৌড় করানো যায় তাহলে তার গতিবেগ হয়ে পড়বে দশ লক্ষ ভোল্ট প্রোটনের সমান। অথচ দশ লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে না।

এই যুক্তি অনুসারে বৈজ্ঞানিকরা বিদ্যুৎকণার গতিশক্তি বাড়ানোর এক নূতন ধরনের যন্ত্র তৈরী করতে মনস্থ করলেন। শতাধিক ফুট দীর্ঘ ভ্যাকুয়াম নলের মধ্যে ধন-ঋণ ইলেকৃট্রোড জোড়া পর পর বসিয়ে গেলেন ফাঁক রেখে রেখে। ইলেকৃট্রোড চাক্তিগুলির মধ্যে ছিদ্র রাখলেন। সব ইলেকট্রোড জোড়াকে উচ্চ ভোল্ট বিদ্যুতের সঙ্গে যোগ করে রাখলেন। প্রথম ইলেক-ট্রোড জোডার মধ্যে প্রোটন ছুটতে ছুটতে বেগবান হয়ে ইলেকৃট্রোডের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে দ্বিতীয় ইলেকৃট্রোড জোড়ার মধ্যে এসে পড়ল। দ্বিতীয় ইলেকট্রোড জোড়ার মধ্যে ভোল্টের হ্যাঁচ্কা টান খেয়ে আবার গতিবেগ বেড়ে গেল। এই প্রকারে তৃতীয়, চতুর্থ……ইলেকৃট্রোড জোড়ার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে বেগশক্তি বেড়ে চলতে লাগল। এই ভাবে একই ভোল্টের বিদ্যুৎ চাপের সাহায্যে বারে বারে গতিশক্তি বাড়ানো গেল।

এই ধরনের যন্ত্রে অনেক অসুবিধা। বেশী শক্তি বাড়াতে হলে ভ্যাকুয়াম নলের দৈর্ঘ্য বাড়াতে হয়। যন্ত্র হয়ে পড়ে বেয়াড়া ধরনের।

লরেন্স ঠিক করলেন, প্রোটন বা অন্য বিদ্যুৎ কণাকে সোজা পথে চলতে দেওয়া হবে না। ওদের গতিশক্তি বাড়াতে হবে ছোট গণ্ডির মধ্যে। চুম্বক বল প্রয়োগ করলে বিদ্যুৎ কণাগুলি চক্রপথে ঘুরতে থাকে। তাই ভ্যাকুয়াম আধার তৈরী করলেন চক্রাকারে, আর সেটাকে বসিয়ে দিলেন বিরাট চুম্বকের মুখের মধ্যে। ভ্যাকুয়াম আধারের মধ্যে দুটি অর্ধ চন্দ্রা-কারে কাটা কৌটা রাখলেন (কয়েক ফুট ব্যাসের)। কাটা কৌটা দুটি আধ ইঞ্চি মতো দূরে পৃথক করে রাখা হ'লো, দুই অর্ধেক হ'লো ইলেকৃট্রোড অর্থাৎ তাদের ওপর বিদ্যুৎ ভোল্ট দেওয়া হলো। এবার কাটা কৌটার মাঝে হাইড্রোজেন (বা প্রোটন) ছাড়লে প্রোটনটি ছুটতে আরম্ভ করল কৌটার যে অর্ধেক ঋণ-ইলেকট্রোড সেই দিকে। দুই অর্ধেকের ফাঁকে ভোল্টেজের টান রয়েছে। টান খেয়ে প্রোটনটি অর্ধচন্দ্র কৌটার মধ্যে ঢুকে ছুটতে লাগল। কিন্তু সোজা পথে চলবার উপায় নেই, চুম্বকের শক্তি

তাকে ঘুরিয়ে দিল। ঘুরে এসে আবার পড়ল দুই অর্ধচন্দ্রের ফাঁকের খোলা যায়গায়। এর মধ্যে ভোল্টেজ উল্টে দেওয়া হয়েছে দুই অর্ধচন্দ্রের, ফলে সামনেরটি হয়েছে ঋণ ইলেকট্রোড। তাই আবার বিদ্যুতের টান
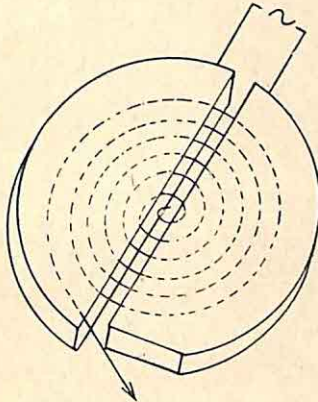
চিত্র—৩৪ : সাইক্লোট্রন যন্ত্রের ভিতর দুভাগে অর্ধচন্দ্র কৌটা। এটি থাকে ভাকুয়াম কৌটার মধ্যে। সমস্তটা বিরাট চুম্বক মুখের মধ্যে বসানো, ফলে প্রোটন ইত্যাদি ঘুরে ছোটে। কাটা কৌটায় ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের টানে প্রতিবার গতিবেগ বেড়ে চলে, অবশেষে ভীষণ বেগে কৌটা ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

পড়ল প্রোটনের উপর, শক্তি গেল দ্বিগুণ হয়ে। আবার চুম্বকের প্রভাবে অর্ধচন্দ্র কৌটার গহ্বরের মধ্য দিয়ে ঘুরে তৃতীয় দফায় খোলা ফাঁকের কাছে এসে পড়ল। আবার ভোল্টেজ উল্টে দেওয়া হলো, আবার প্রোটোনটি বিদ্যুতের টান খেয়ে আরো জোরে ছুটতে লাগল। এইভাবে যতবার ঘোরে ততবার শক্তি সঞ্চয় করে। যত গতিশক্তি বাড়ে প্রোটোনটি ততই ক্রমশঃ বড় বৃত্ত নিয়ে ঘুরতে থাকে, অবশেষে কৌটার সীমা ছাড়িয়ে ভীষণ বেগে বেরিয়ে আসে। এই ঘোরা বা অর্ধচন্দ্র কৌটার ব্যবধান অতিক্রম করা প্রতি সেকেণ্ডে হাজার বা লক্ষ বার হয়। এত তাড়াতাড়ি দুই অর্ধ-কৌটায় ভোল্টেজ বদলানো হয় কী করে ? এটা করা হয় ভাল্‌ভের সাহায্যে বিদ্যুৎ স্পন্দন উৎপন্ন করে, অনেকটা রেডিও চক্রের মতো।

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে যে সাইক্লোট্রন যন্ত্র বসানো হয়েছে তার চুম্বকের মুখ ৩৬ ইঞ্চি বা তিন ফুট ব্যাসের, ভ্যাকুয়াম আধারও ঐ মাপের

এতে ৩০ হাজার ভোল্টের স্পন্দমান বিদ্যুৎ দিয়ে ৫০ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির বিদ্যুৎ কণা (প্রোটন, ডিউটেরন ইত্যাদি) উৎপন্ন করা হচ্ছে।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা : শক্তিশালী বা অতিবেগবান মৌলিক কণার আঘাতে যে কোন পরমাণু চূর্ণ ও রূপান্তর করা যায়। বেগবান কণা প্রকৃতির দেওয়া তেজস্ক্রিয় ধাতুর রশ্মি থেকে পাওয়া যায়, আবার মানুষের তৈরী সাইক্লোট্রন দিয়েও সৃষ্টি করা যায়। পরমাণু চূর্ণ করে এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে রূপান্তর করতে গিয়ে দেখা গেল অনেক নবজাত দ্রব্যে তেজস্ক্রিয়তা প্রণোদিত (induced radioactivity) হচ্ছে। রেডিয়াম, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি গুরুভার পদার্থগুলি স্বভাবতঃই তেজস্ক্রিয়। সীসকের ২১০, ২১১, ২১২ ও ২১৩ পরমাণুভারের আইসোটোপগুলি তেজস্ক্রিয় বা বিকিরক। লঘুভার মৌলিক পদার্থের মধ্যে ৮৭ ভারের রুবিডিয়াম এবং ৪০ ভারের পটাসিয়াম আইসোটোপ স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়।

লঘুভারের পদার্থের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায় না। কিন্তু অতি বেগবান মৌলিক কণার আঘাতে এদের এমন সব আইসোটোপ সৃষ্টি করা যায় যারা তেজস্ক্রিয়। এসব মানুষের চেষ্টায় তৈরী, অতএব বলা যায় 'কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়' দ্রব্য (artificial radioactive bodies)। তেজস্ক্রিয় এলুমিনিয়াম তৈরীর কথা আগেই বলেছি। তেমনি সাইক্লোট্রন যন্ত্রে উৎপন্ন অতি বেগবান কণার আঘাতে সহজেই নানা লঘুদ্রব্যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করা যায়। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ফস্‌ফরাস, কার্বন ইত্যাদি এমন কি হাইড্রোজেনকেও এই উপায়ে তেজস্ক্রিয় করে তোলা যায়।

সাধারণ কথায় অনেক সময় এদের বলা হয় 'কৃত্রিম রেডিয়াম'। কারণ জনসাধারণের কাছে রেডিয়াম নামটা সুপরিচিত, এবং সকলেই জানে রেডিয়াম থেকে স্বতঃই রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। কৃত্রিম উপায়ে বিচ্ছুরক পদার্থ তৈরী হ'লে অনেকেই এদের কৃত্রিম রেডিয়াম বলেন। কিন্তু 'কৃত্রিম রেডিয়াম' না বলাই সঙ্গত। কারণ রেডিয়াম ছাড়াও অন্য জিনিস আছে যারা স্বতঃই রশ্মি দেয়, যেমন থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি। তাছাড়া, তেজস্ক্রিয় এলুমিনিয়াম বা ফসফরাস মোটেই রেডিয়ামের সমধর্মী নয়। অর্থাৎ, যাহাই তেজস্ক্রিয় তাহাই রেডিয়াম নহে।

লঘুদ্রব্যে তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করলে তাদের তেজস্ক্রিয়তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এতে সুবিধাও আছে। রোগ চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার হয়। রেডিয়াম ব্যবহার করলে সাবধান হ'তে হয় যাতে অতিরিক্ত রশ্মি রোগীর শরীরে না যায়। অতিরিক্ত রশ্মিগ্রস্থ হ'লে বিপদ। এই কারণে রেডিয়াম রশ্মি সময় মতো সরিয়ে নিতে হয়। ক্যানসার, টিউমার ইত্যাদি যদি শরীরের উপরিভাগে প্রকাশ পায় তাহলে রেডিয়াম রশ্মি প্রয়োগ ও মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয় না। কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরে হলে রেডিয়াম প্রয়োগ ও মাত্রা নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়ে। স্বল্পক্ষণ স্থায়ী কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারে সে অসুবিধা দূর হয়েছে। উপযুক্ত মাত্রায় এই স্বল্পক্ষণ স্থায়ী তেজস্ক্রিয় পদার্থ রোগাক্রান্ত অঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। শরীরের অভ্যন্তরে হ'লে অস্ত্রোপচার করে প্রবেশ করানো হয়। সে আপন কাজ করে যথা সময়ে নির্বাপিত হয়ে যায়।

রোগের চিকিৎসা ছাড়াও রোগের কারণ নির্ধারণে এবং শরীর বিজ্ঞানে নানা পরীক্ষায় এই সব কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় দ্রব্য এখন ব্যবহার হচ্ছে। গলগণ্ড (goitre) রোগের কারণ শরীরে আয়োডিনের বৈষম্য। রোগীর শরীরে আয়োডিনের বৈষম্য (কম বেশী) কেন হচ্ছে, শরীরের মধ্যে কোন যন্ত্র ঠিক মতো কাজ করছে না, এসব ধরতে পারলেই রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব। আয়োডিনের দেহসাৎকরণ (assimilation) কেন হচ্ছে না, কোথায় বাধা পাচ্ছে সেটা রোগীকে রেডিও আয়োডিন খাইয়ে পরীক্ষা করা যায়। আয়োডিন স্বভাবতঃ তেজস্ক্রিয় নয়, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে আয়োডিনে তেজস্ক্রিয়তা প্রণোদিত করা যায়। তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের লবণ রোগীকে খাওয়ালে সেটা হজম হয়ে অবশেষে কয়েক ঘন্টার মধ্যে শরীরের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। তখন শরীরের নানা অংশে গাইগার কাউন্টার আনলে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের অস্তিত্ব বুঝতে পারা যায়। বুঝতে পারা যায় কোথায় আয়োডিন এসেছে, কোথায় আসেনি।

শরীরের পুষ্টিতে ক্যালসিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন। ক্যালসিয়ামের অভাব হ'লে শিশুদের হাড় বাড়ে না। এই রোগকে বলে

রিকেট্স। ক্যালসিয়ামের অভাবে নানা রকম রোগ দেখা দেয়। শ্বাসনলী ও ফুসফুসের রোগে ক্যালসিয়াম ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। ক্যালসিয়াম কীভাবে দেহসাৎকরণ হয়, রোগীর শরীরে কোথায় এর বৈষম্য ঘটে, এসব পরীক্ষা করা যায় রেডিও-ক্যালসিয়াম খাইয়ে। পরে গাইগার কাউণ্টার দিয়ে দেখা হয় পাকস্থলী থেকে কীভাবে ক্যালসিয়াম সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে বা কোথায় কার্যকর হচ্ছে না।

বৃক্ষ, তরু, লতা কী করে মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তা-ও পরীক্ষা করা যায় শিকড়ের কাছে মাটিতে তেজস্ক্রিয় দ্রব্য (রেডিও ক্যালসিয়াম, রেডিও ফসফরাস ইত্যাদি) মিশিয়ে। গাইগার কাউণ্টার দিয়ে দেখা যায় কী ক'রে গাছের খাদ্য মাটি থেকে শিকড় দিয়ে অবশেষে ডালপালা, ফুল, ফল, পাতায় ছড়িয়ে পড়ে পুষ্টি সাধন করছে।

এই রকম কাজে তেজস্ক্রিয় পদার্থকে বলে অনুসন্ধানী পদার্থ বা ট্রেসার এলিমেণ্ট (tracer element)। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এদের চলাচলের অনুসন্ধানের কাজে লাগানো হয় বলে এদের নাম হয়েছে ট্রেসার বা অনুসন্ধানী।

অধ্যায়—২৪

পারমাণবিক শক্তি

ঊনবিংশ অধ্যায়ে শক্তি ও জড়ের পার্থক্য ও সাদৃশ-আলোচনা করতে গিয়ে পারমাণবিক শক্তি এবং পারমাণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এখানে আর একটু বিশদ আলোচনা করা হবে।

'বস্তু' এবং 'শক্তি' আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্নসত্তা বলে মনে হলেও তাদের মধ্যে গভীর যোগাযোগ আছে। আইনষ্টাইন বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন শক্তির ওজন আছে, বস্তুর ওজনের মতো। সেই কারণে আলোরও ওজন আছে, তার প্রমাণও নানাভাবে পাওয়া গেল। আলোককে আগে নিছক শক্তি এবং ভারহীন বলে ধরা হ'তো। এখন সে ধারণা বদলেছে। অন্য দিকে জড় কণার গতিশক্তিতে তার মধ্যে আলোকের শক্তির মতো তরঙ্গধর্ম ফুটে ওঠে। এসব কথা আগেই আলোচনা করেছি বিশদভাবে।

শক্তি আর জড়বস্তু পরস্পর রূপ পরিবর্তন করতে পারে। কতটা জড়-বস্তু কতটা শক্তিতে পরিণত হবে তা আইনষ্টাইন হিসাব করে দিলেন। আইনষ্টাইনের সূত্রটি দেখতে অত্যন্ত সরল

শক্তিপরিমাণ = বস্তুপরিমাণ × (আলোকের গতিবেগ)২

সংক্ষেপে $E = mc^2$

E অর্থে Energy বা শক্তি ; m অর্থে mass বা বস্তুমান এবং c হ'লো আলোর গতিবেগ।

শক্তি (E) মাপা হয় আর্গ (erg) মাত্রায়, বস্তুমান মাপা হয় গ্র্যাম-এ, এবং আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩ × ১০১০ সেন্টিমিটার (বা প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল)। আর একটু পরিষ্কার করে বললে ৩ × ১০১০ সেন্টিমিটার মানে ৩০০০ কোটি সেন্টিমিটার। আর গণিতিক সূত্রে (আলোর গতিবেগ)২ মানে ঐ গতিবেগের বর্গ, অর্থাৎ

$$c^2 = (৩ \times ১০^{১০}) \times (৩ \times ১০^{১০}) = ৯ \times ১০^{২০}$$

এ থেকে দেখা যাচ্ছে এক গ্র্যাম বস্তু যদি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহ'লে শক্তির পরিমাণ হবে $E = ১ \times (৩ \times ১০^{১০})^{২} = ৯ \times ১০^{২০}$ আর্গ। আবার ৪'২ কোটি আর্গ-এ এক ক্যালোরি তাপ শক্তি। তাহ'লে এক গ্র্যাম জড় বস্তু সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তর হ'লে ২১ লক্ষ কোটি ক্যালোরি তাপশক্তি উৎপন্ন হ'বে। শক্তির নানারূপ আছে, যেমন তাপশক্তি, বিদ্যুৎ-শক্তি ইত্যাদি। এই ২১ লক্ষ কোটি ক্যালোরিকে বিদ্যুৎ শক্তির মাপে বললে হবে আড়াই কোটি ইউনিট (অর্থাৎ কিলোওয়াট আওয়ার, kwh) বিদ্যুৎশক্তি।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে বস্তু যদি ক্ষয় বা ধ্বংস হয়ে শক্তিরূপে প্রকাশ পায় তাহ'লে সামান্য ওজনের বস্তু থেকে ভীষণ মাত্রায় শক্তি সৃষ্টি হবে।

যদি কোথাও বস্তুর ক্ষয় বা ধ্বংস হ'তে দেখা যায় তাহ'লে বুঝতে হবে সেখানে শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন লঘু পরমাণু যখন জোড়া লেগে ভারী পরমাণু সৃষ্টি হয় তখন ওজনে ঘাটতি পড়ে। উনবিংশ অধ্যায়ে বলেছি হিলিয়াম পরমাণুর ভার দেখা যায় ৪'০০২, অথচ কেন্দ্রের কণাগুলিকে (২টি প্রোটন এবং ২টি নিউট্রন) পৃথক করে ওজন করলে যোগফল হয় ৪'০৩২। তাহ'লে বুঝতে হবে হিলিয়াম কেন্দ্রীন তৈরা হতে ০'০৩ ভারের বস্তু পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে। এই কারণে নির্গত হয়েছে শক্তি। বৈজ্ঞানিকরা প্রথমে বুঝতে পারেন সূর্য ও নক্ষত্রের অভ্যন্তরে ভীষণ চাপ ও তাপের প্রভাবে এই উপায়ে শক্তি সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এই প্রক্রিয়ার নাম ফিউশন (fusion বা জোড়া লাগা); অন্য নাম থার্মো-নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্‌শন (thermonuclear reaction)।

লঘু পরমাণু 'সংগঠনে' যেমন জড়মান ধ্বংস হয়ে শক্তি সৃষ্টি হতে দেখা যায়, ভারী পরমাণুতে 'বিভাজনে' শক্তি উৎপন্ন হয়। ইউরেনিয়াম ভারী ধাতু। ইউনিয়াম কেন্দ্রকে ভাঙ্গা যায় নিউট্রনের আঘাতে। ইউরেনিয়াম পরমাণুকে এইভাবে দ্বিখণ্ড করলে, খণ্ডগুলির ওজন যোগফল ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজনের সমান হয় না, কম হয়। ঐ লুপ্ত ওজনের বস্তু বেরিয়ে আসে শক্তি হয়ে।

ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন দিয়ে ভেঙ্গে পরমাণু শক্তি উৎপন্ন করার পদ্ধতিই সহজে কার্যকর। কিন্তু সব ইউরেনিয়াম বিভাজনশীল (fissionable) নয়। ইউরেনিয়ামের প্রধান দুটি আইসোটোপ ২৩৮ ও ২৩৫ ভারের। প্রকৃতিতে ইউরেনিয়াম ২৩৮ অধিক অনুপাতে পাওয়া যায়, শতকরা প্রায় ৯৯·২৮ ভাগ। ইউরেনিয়ামের এই আইসোপটি সহজে বিভাজনশীল নয়। ইউরেনিয়াম ২৩৫টি বিভাজনশীল, কিন্তু পাওয়া যায় মাত্র শতকরা ০·৭ ভাগে। মিশ্র ইউরেনিয়াম (২৩৫ এবং ২৩৮ ভারের) নানা উপায়ে পরিশুদ্ধ করা যায়। অর্থাৎ ২৩৫ ভারের ভাগ বাড়ানো যায়, যাতে পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন করতে সুবিধা হয়। অবশ্য বিশুদ্ধ করবার পদ্ধতি কষ্টসাধ্য ও অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে ইউরেনিয়াম ২৩৫ ও ২৩৮কে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে ফেলা হয় তা নয়, কেবল ২৩৮-এর ভাগ কমিয়ে ২৩৫-এর ভাগ কিছুটা বাড়ানো হয়। এই কারণে 'বিশুদ্ধ' না বলে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম (enriched uranium) বলা হয়।

ইউরেনিয়াম ২৩৫ সহজে ভাঙ্গা যায়। নিউট্রনের আঘাতে। তখন পারমাণবিক শক্তি নির্গত হয়। ইউরেনিয়াম ২৩৫ ভাঙ্গতে খুব বেগবান নিউট্রনের প্রয়োজন হয় না, মন্থর নিউট্রনেই বেশী কাজ হয়। ইউরেনিয়াম ২৩৮ ভাঙ্গতে অতিবেগবান নিউট্রন লাগে, এত বেগবান নিউট্রন সাধারণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় না।

গাফ্রাইট এক প্রকার বিশুদ্ধ অঙ্গার। গ্রাফাইটের মধ্য দিয়ে নিউট্রন গেলে গতিবেগ মন্থর হয়ে পড়ে। ইউরেনিয়াম থেকে পারমাণবিক শক্তি পেতে হ'লে গ্রাফাইট খণ্ডের মাঝে মাঝে ইউরেনিয়াম গুঁজে দেওয়া হয়। ফলে যেখান থেকেই নিউট্রন উৎপন্ন হোক না কেন, তাদের যেতে হয় গ্রাফাইট স্তূপের মধ্য দিয়ে। এই ভাবে নিউট্রনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ ও মন্থর করা হয়। গ্রাফাইটকে বলে 'নিয়ন্ত্রক' (moderator)। গ্রাফাইট ও ইউরেনিয়াম দিয়ে সাজানো স্তূপকে বলে এটমিক পাইল (atomic pile)। স্তূপের মধ্যে আর একটি জিনিস থাকে সেটাকে বলে নিউট্রন শোষক (neutron absorber), এটাকে গাড়ী ব্রেক-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। পারমাণবিক স্তূপে যখন একের পর এক ইউরেমিয়াম

পরমাণু বিভাজন হতে থাকে, শক্তি নির্গমের সঙ্গে সঙ্গে আরো নিউট্রন নির্গত হয়ে ছুটতে থাকে। প্রত্যেকটি পরমাণু বিভাজনের সঙ্গে দু-তিনটি করে নতুন নিউট্রন বেরোয়, এরাই আবার ইউরেনিয়ামের পরমাণু
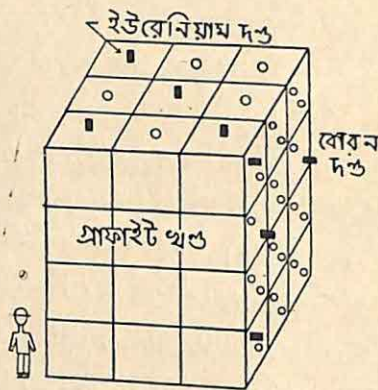
চিত্র—৩৫ : শক্তি উৎপাদনের পরমাণু স্তূপ।

বিভাজন ঘটায়। একটা ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজনে যদি ২টা নিউট্রন বেরোয়, এদের ধাক্কায় পরের বারে দুটি পরমাণু ভাঙবে তা থেকে ৪টি নিউট্রন বেরুবে, তার পরের বারে ৮টি, তার পরের বারে ১৬টি...এই ভাবে নিউট্রনের সংখ্যা বাড়তে থাকে, পরমাণু বিভাজনের মাত্রাও তীব্র হতে থাকে। এই উপর্যুপরি প্রক্রিয়ার নাম চেন রিয়্যাকশন (chain reaction)। প্রক্রিয়ার মাত্রা আয়ত্তের মধ্যে না রাখতে পারলে বিপদ। এই কারণে নিউট্রনের সংখ্যা আয়ত্তের মধ্যে রাখা দরকার। ক্যাডমিয়াম ও বোরণ নিউট্রনকে শোষণ (absorb) করতে পারে। স্তম্ভের মধ্যে ক্যাডমিয়াম বা বোরণের ডাণ্ডা মধ্যে মধ্যে ঢোকানো থাকে। ডাণ্ডাগুলি যত টেনে বার ক'রে নেওয়া যায়, স্তূপের মধ্যে নিউট্রনের প্রাধান্য তত বাড়তে থাকে, আবার যত ভিতরে ঢোকানো যায় নিউট্রনের শোষণের ফলে তেজ ততই কমে যায়। এইভাবে স্তূপে পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্তূপের মধ্যে পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করবার বোরণ বা ক্যাডমিয়ামকে এই কারণে গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণের ব্রেকের সঙ্গে তুলনা

করা যেতে পারে। পরমাণু স্তূপ বা রিয়্যাকটার সর্ব্বপ্রথম তৈরী করেন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফের্মি আমেরিকাতে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।
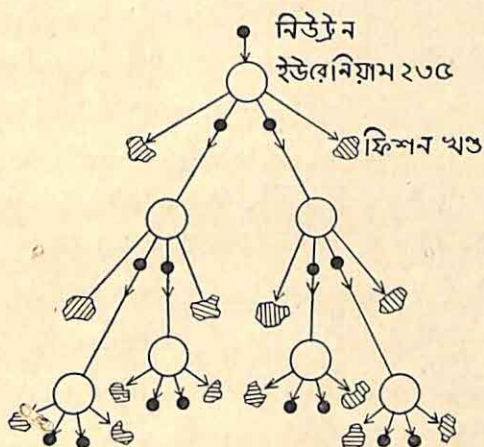
চিত্র—৩৬ঃ চেন রিয়্যাক্‌শন।

পরমাণুশক্তির স্তূপে যে তাপশক্তি সৃষ্টি হয় তা দিয়ে ষ্টীম এঞ্জিন চালানো যায়। সেই ষ্টীম এঞ্জিন থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। ষ্টীম এঞ্জিন বলেই রেলগাড়ীর এঞ্জিন তা নয়। বাষ্প দিয়ে যে যন্ত্র ঘোরানা যায় তাকেই সাধারণ কথায় ষ্টীম এঞ্জিন বলে। বড় বড় বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাওয়ার হাউসে ষ্টীম এঞ্জিন দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। বাষ্প বা ষ্টীম উৎপাদনের জন্য চাই তাপ শক্তি। সাধারণতঃ এর জন্য কয়লা ব্যবহার করা হয়। এখন দেখা যাচ্ছে কয়লার বদলে পারমাণবিক স্তূপে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা যেতে পারে।

হিসাব করে দেখা যায় ১ সের ইউরেনিয়াম ২৩৫ বিভাজন হয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় তা প্রায় ৭৫,০০০ মণ কয়লা জালানো তাপ শক্তির সমান।

এই বিপুল শক্তি পারমাণবিক স্তূপ বা রিয়্যাকটারের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত

ধারায় 'জ্বালিয়ে' রাখতে পারলে সামান্য ইউরেনিয়াম দিয়ে যে কোন শহরে মাসের পর মাস বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাওয়ার হাউস এখন বসছে। পরমাণু শক্তির তাপ দিয়ে জাহাজ বা ডুবোজাহাজ চালানো হচ্ছে। ডুবো জাহাজের (submarine) পক্ষে পারমাণবিক শক্তি অমূল্য। কয়লা, তেল বা পেট্রোল জ্বালাতে বাতাস বা অক্সিজেন দরকার। ডুবোজাহাজ চালাতে তেল বা পেট্রোল ব্যবহার করলে অক্সিজেন যোগান দিতে হয়। এই কারণে দূর পাল্লায় যেতে হলে মধ্যে মধ্যে ভেসে উঠে বাতাস নিতে হয়। পারমাণবিক তাপ আসে পরমাণু কেন্দ্রের শক্তি থেকে, এর জন্য বাতাস বা অক্সিজেন লাগে না। ডুবো জাহাজের পক্ষে এটা মস্ত বড় সুবিধা।

পারমাণবিক স্তূপে চেষ্টা করা হয় নিউট্রন সৃষ্টির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা, পরমাণু শক্তিকে ধীরে ধীরে মুক্ত করা। পরমাণু বোমায় চেষ্টা করা হয়, নিউট্রনের ঝাঁককে নিমেষের মধ্যে বাড়িয়ে তোলা, যাতে চেন রিয়্যাক্‌শন মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ গুণ বর্ধিত হয়ে ইউরেনিয়ামের সমস্ত শক্তি মুক্ত ক'রে প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

তথাকথিত হাইড্রোজেন বোমার লঘু পরমাণু সংযুক্ত হয়ে প্রচণ্ড শক্তি বিকাশ করে, সে কথা উনবিংশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। সাধারণ হাইড্রোজেন বা ভারী হাইড্রোজেন (ডিউটেরিয়াম) সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণু সৃষ্টি হলে কী মাত্রায় শক্তি সৃষ্টি হয় সে কথা বলেছি। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার শক্তি সবটাই এই সংযোগ প্রক্রিয়া (fusion) থেকে আসে না, সম্ভবতঃ মাত্র শতভাগের একভাগ আসে। কিন্তু এই অতি তীব্র বিপর্যয়ের মধ্য থেকে যে সব অতি বেগবান নিউট্রন বেরিয়ে আসে তা দিয়ে ২৩৮ ভারের 'ভেজাল' ইউরেনিয়াম পরমাণু চূর্ণ হয়ে বোমার শক্তি প্রচণ্ডতর হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ ২৩৮ ভারের ইউরেনিয়াম পরমাণু দ্বিভাজন (fission) করা যায় না, ২৩৫ ভারের ইউরেনিয়ামকে করা যায়। হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে দুই জাতীয় প্রক্রিয়াই চলে, সংযোজন (fusion) ও বিভাজন (fission)।

কী জাতীয় পরমাণু প্রক্রিয়া কত পরিমাণ শক্তি দেয় তা নিচের তালিকা

থেকে বোঝা যাবে। এই সকল শক্তির পরিমাণ কয়লা জ্বালানো শক্তির মাপকাঠিতে দেওয়া হলো।

পারমাণবিক প্রক্রিয়া	কয়লার হিসাবে
১ সের ইউরেনিয়াম বিভাজন	৭৫,০০০ মণ
১ সের ডিউটেরিয়াম সংযোজনে হিলিয়াম ৩ সৃষ্টি	৯২,০০০ „
১ সের হাইড্রোজেন সংযোজনে হিলিয়াম ৪ সৃষ্টি	৫৬২,০০০ „

অধ্যায়—২৫

জড় ও জীব

এ পর্যন্ত বিশ্বের জড় উপাদানের কথাই আলোচনা করেছি। জড়-জগতের উপাদান জড়বস্তু এবং শক্তি। বস্তু এবং শক্তি বিভিন্ন সত্তা হলেও চরম বিচারে তাদের একই সত্তার বিভিন্নরূপ বলে দেখা যায়। জড়কেও শক্তির মাপকাঠিতে মাপা যায়, শক্তিকেও জড়বস্তুর নিক্তিতে ওজন করা যায়।

আরো একটি সত্তা আছে, আরো একটি জগৎ আছে এই বিশাল জগতের মধ্যে। জীবজগৎ। এই জগৎ বিজ্ঞানের আয়ত্বের বাইরে না হলেও জীব ও প্রাণ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই। কার্যক্ষম দৈহিক অবস্থাকে আমরা জীবিত অবস্থা বলি, সেই ক্ষমতার অবসানে মৃত্যু আসে।

জীব ও উদ্ভিদ দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ (cell) দ্বারা গঠিত। কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। এক একটি কোষ হাজার হাজার জড় অণুপরমাণু দিয়ে তৈরী, অথচ কোষগুলি নিছক জড়কণা নয়। কোষগুলি জীবন্ত। জীবনের কয়েকটি চিহ্ন, স্বতঃসঞ্চরণ-শীলতা (বা নড়া চড়া), স্পন্দন, পুষ্টি, সংখ্যাবৃদ্ধি বা প্রজনন ইত্যাদি। প্রত্যেকটি দেহকোষের এই গুণ আছে। জীবন্ত দেহের মধ্যে কোটি কোটি কোষের অহরহ জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে। জীবন্ত দেহের মধ্যে কোটি কোটি কোষের জন্ম ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয় স্বতঃই দ্বিখণ্ডিত হয়ে। মোটামুটি, প্রায় আধঘণ্টায় এক একটি কোষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়, ঐ দুটি আবার আধঘণ্টায় চারটিতে পরিণত হয়। এইভাবে একদিনে একটি জীবকোষ থেকে ২৮০ লক্ষ কোটি কোষ জন্মাতে পারে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যুও ঘটে। পূর্ণজীব দেহের কোষের মধ্যে এই ভাবে ক্ষয় ও পূরণের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাম্য (balance) রক্ষিত হয়।

পূর্ণ জীব দেহের জন্ম-মৃত্যু এবং জীবদেহের মধ্যে কোষ সমূহের জন্ম-মৃত্যু

পৃথক ধারায় চলে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। একই ব্যক্তি, একই ব্যক্তিত্ব, একই জীবন, অথচ দেহের মধ্যে অহরহ (কোষ সমূহের) জন্ম-মৃত্যু ঘটছে। আবার পূর্ণ জীবদেহের মৃত্যুতে কোষ সমূহের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে তা-ও না। মৃত ব্যক্তির শরীরে কিছুকাল পর্যন্ত কোষ সমূহের জীবন্ত প্রক্রিয়া চলতে থাকে, এ কথা অনেকের কাছেই নতুন ঠেকবে।

চিন্তাশক্তির দিক থেকে জটিল দেহধারী প্রাণী এবং সরলতম জীবকোষ ও জীবাণুর প্রচুর প্রভেদ। কী ভাবে কোন্ স্তরে এই প্রভেদ সৃষ্টি হ'লো সে কথা এখনও কারো জানা নেই। জীবজগতের তথ্য এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু জড়জগৎ ও মরজগতের ব্যবধান আপাতদৃষ্টিতে এত দুস্তর যে বৈজ্ঞানিকদের কাছে এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। তাই জড়বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে জীবনের মূলসূত্র খুঁজবার চেষ্টা চলেছে।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন অণুপরমাণুর এক বিশিষ্ট্য সজ্জায় জীবনের প্রথম সূচনা হয়। জীব কোষে এই বিশেষ পারমাণবিক সজ্জা কী করে ঘটল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। অনেকে বলেন, প্রথম জীব কোষের সৃষ্টি একটি আকস্মিক ঘটনা (accident) মাত্র। কথাটি খুব অসম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, অণুপরমাণু নিয়ত পরস্পর মিলিত ও সংযুক্ত হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি বৎসর স্থিতিকালের মধ্যে এরূপ বিশেষ ধরনের আণবিক যোগাযোগ হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?

জৈব বস্তুর প্রধান মূল উপাদান অঙ্গার (কার্বন) ও নাইট্রোজন। জৈব বস্তু (organic matter) সৃষ্টি করতে সর্বপ্রথম অঙ্গার ও নাইট্রোজেনের কী ভাবে অকস্মাৎ মিলন ঘটল যে সম্বন্ধে কোন কোন বৈজ্ঞানিক যে মত প্রকাশ করেছেন তা ভাববার কথা। এই মত অনুসারে, কস্‌মিক রশ্মির আঘাতে সমুদ্রজলের মধ্যে যে নিউট্রন উৎপন্ন হয় তা জলের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে মন্থর (slow neutron) হয়ে পড়ে। মন্থর নিউট্রন অন্য কোন পরমাণু কেন্দ্রকে চূর্ণ করে না, বরং কেন্দ্রে ধরা পড়ে যায় (capture of slow neutron)। এই অবস্থায় নানা প্রকার রাসায়নিক শক্তির সূচনা হয়। মন্থর নিউট্রনের প্রভাবে অঙ্গার ও নাইট্রোজেনের মিলনে জৈবদ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং এই কারণেই প্রথম জীব সামুদ্রিক। সরলতম এক কৌষিক

(monocelluler) সামুদ্রিক প্রাণী লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিবর্তনের (evolution) ধারার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়েছে জটিলতর দেহধারী সামুদ্রিক, ভূচর ও খেচর প্রাণীতে। দেহ যন্ত্রের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে মনঃশক্তিরও উন্নতি দেখা দিয়েছে। জটিল জীবদেহের মধ্যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনা শক্তি ও স্বাধীনক্ষমতার পরিচয় দেখতে পাই জীবাণু বা জীবন্ত কোষের মধ্যে তা' দেখা যায় না। এরা যেন অজ্ঞাত প্রেরণায় আপনার কাজ করে চলে। সামান্য কটি কাজ: পুষ্টি, সংখ্যা-বৃদ্ধি ও মৃত্যু। তারা যেন জীবন্ত হয়েও জড়। এই নিম্নতম ধাপেই জড়বস্তু ও প্রাণীর পার্থক্য আরম্ভ।

জীবন্ত কোষ ও জীবাণুর বিশ্লেষণে পাওয়া যায় অণুপরমাণু। অণুপরমাণু প্রাণহীন। অথচ প্রাণহীন জড়কণার সংগঠনে প্রাণের সূচনা। কোথায় তাদের ব্যবধান? কোথায় জড় ও জীবের সঙ্গমস্থল?

জীবন্তকোষ ও জীবাণুর মূলে রাসায়নিক অণুপরমাণু। কিন্তু মাঝে আর একটি স্তর আছে, কলয়েড (colloid) কণা। জীবদেহের অধিকাংশ রসই কলয়েড তরলে গঠিত। জৈবনিক বা প্রোটোপ্লাজম (protoplasm) এক-প্রকার আঠাল কলয়ডীয় দ্রব্য। মনে হয় বিচিত্র কলয়েড কণার মধ্য দিয়ে জীবন প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

অণুপরমাণুর গঠন যেমন সুনির্দিষ্ট, কলয়েড কণা তেমন নয়। কলয়েড কণাগুলি নানা আকারের হয়, কোনটিতে দশটি, বিশটি, হাজারটি বা লক্ষটি অণু নিয়ে তৈরী। দুধ একপ্রকার কলয়েড কণার তরল। এক ফোঁটা দুধে যতই জল মেশানো যাক, ঘোলাটে ভাব কাটে না। কারণ দুধের কলয়েড কণাগুলি বড় এবং চিনি বা লবণের মতো গলে মিশে যায় না। প্রচুর জল মেশানো এক ফোঁটা দুধের কলয়েড কণার উপর আলো প'ড়ে ঠিকরে আসে বলে সাদাটে ঘোলা ভাব দেখায়। অধিকাংশ খাদ্যই কলয়েড তরলরূপে দেহসাৎকরণ হয়। এই কারণে কলয়ডীয় ঔষধের (কলয়েড ক্যালসিয়াম, কলয়েড আয়োডিন ইত্যাদি) বহুল প্রচলন হচ্ছে।

জীবদেহে কলয়েড কণা ও কলয়েড রসের প্রাচুর্য আছে, সে কথা বলেছি। সুইডেন দেশীয় বৈজ্ঞানিক সোয়েডবার্গ (Svedberg) জীব ও উদ্ভিদজাত কলয়েড তরল পরীক্ষা করে এক অদ্ভুত তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি

দেখলেন জৈব কলয়েড কণাদের ভার (পারমাণবিক ভার অনুসারে) ৩৪৫০০ অথবা তার দ্বিগুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ ইত্যাদি হয়। যেন ৩৪৫০০ ভারের কলয়েড কণাই প্রাণের মূল বাহন।

জড়কণা ও জীবের মধ্যে ব্যবধান থাকলেও আধুনিক বিজ্ঞান তাদের মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্নের পূর্ণ মীমাংসা এখনও বহু দূরে। জড় ও জীবের পার্থক্য দেখতে গিয়ে আমরা দেহের মধ্যে দেহাতীত বিষয়ের পরিচয় পাই। দেহ হ'তে মন স্বতন্ত্র হলেও সে দেহেরই অন্তর্গত। দেহই মনের আধার ও নিদান। দেহহীন মুক্ত আত্মার অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক সত্য ব'লে প্রমাণিত হয় নাই।

বিজ্ঞানের চোখে জীবদেহ অণুপরমাণু, ইলেকট্রন প্রোটনের সমষ্টি, এবং তাদের বিশেষ গঠন সজ্জায় জীবনের ধার উৎসারিত হয়। কিন্তু কী অবস্থায় অণুপরমাণুকে কী ভাবে সজ্জিত করলে জীবনের স্ফুরণ সম্ভব তা এখনও অজ্ঞাত। জড়বাদ অনুসারে মানুষের মনের গতিও অণুপরমাণু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তবে কি আমরা যন্ত্র বিশেষ? আমাদের চিন্তাধারা কি অন্ধ অণুপরমাণুর তাণ্ডব লীলার উপর একান্তভাবে ন্যস্ত? আমরা যাকে স্বেচ্ছা-সংকল্প ও স্বাধীন চিন্তা বলি সে কি সম্পূর্ণ অর্থহীন? ব্রহ্মাণ্ড কি চলেছে নির্দিষ্ট ভবিতব্যতার পথে?

প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিকদের মধ্যে স্বেচ্ছা (free will) ও ভবিতব্যতা (determinism) নিয়ে মতভেদ চলে আসছে। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকরা এর এক অপূর্ব মীমাংসা দিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে 'ভবিতব্যতা' কথাটি অবান্তর।

জড়জগৎ ও মনোজগতের কার্যকলাপের মূলে অণুপরমাণু, ইলেক্ট্রন প্রোটনের অন্ধ গতিবেগ ধরে নিলেও তাদের ভবিষ্যৎ চালচলন গণনা করা সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি শক্তি খণ্ডবাদ, কম্পটন প্রক্রিয়া ও তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মনে করা যাক একটি আধারে বায়ু আছে। বায়ু অণুগুলি স্বভাবতঃই চঞ্চল। যে কোন একটি মুহূর্তে প্রত্যেকটি অণুর অবস্থান ও গতিবিধি জানা

থাকলে হিসাব ক'রে বলে দেওয়া যায় এক সেকেণ্ড বা এক ঘণ্টা পরে কে কার সঙ্গে কীভাবে কতবার ধাক্কা খাবে এবং কে কোথায় যাবে। এমন কি ভবিষ্যতে যে কোন সময় কে কোথায় থাকবে তা হিসাব করা চলবে। এই গণনা অত্যন্ত জটিল হ'লেও অসম্ভব বলা যায় না। এখন এই আধারের মধ্যে একখণ্ড রেডিয়াম বা ইউরেনিয়াম রাখা হ'লো। এই সব তেজস্ক্রিয় ধাতু থেকে আল্‌ফা, বিটা ও গামা রশ্মি বিচ্ছুরিত হ'য়ে নূতন নূতন সংঘর্ষের সুযোগ সৃষ্টি করল। কেউ বলতে পারে না তেজস্ক্রিয় ধাতুর রশ্মি কখন কোন দিকে বিচ্ছুরিত হবে। অণুপরমাণুর অবস্থিতির ভবিষ্যৎ গণনা হয়ে পড়ল ভণ্ডুল। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে ব্রহ্মাণ্ডের ভবিতব্য পথ আকস্মিক ও অনির্দিষ্ট ভাবে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ গণনায় আরো একটি বিশেষ বাধা আছে। বিশ্বের মূল উপাদান অণুপরমাণু এবং ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের প্রথম অবস্থা গণনার প্রারম্ভে নিরূপণ করে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারলে তবেই তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থার গণনা করা সম্ভব। অর্থাৎ গোড়ার অবস্থা নিখুঁত ভাবে জানতে হবে। হাইসেনবার্গ বললেন সেটাই সম্ভব নয়, অতএব ভবিষ্যৎ গণনাও সম্ভব নয়। তিনি দেখালেন একটি ইলেকট্রনের বর্তমান 'অবস্থান' ও 'গতিবিধি' এই দুটি গণনার মূল সংবাদ যুগপৎ নিখুৎ ভাবে নির্ধারণ করা যায় না। এই অক্ষমতা পরিমাপের যন্ত্রপাতির অপকৃষ্টতার জন্য নয়। বিষয়টি মূলেই অসম্ভব। ইলেকট্রনের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য তার ওপর আলোকপাত করলেই তার স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটবে, কারণ আলোর আঘাতে ইলেকট্রনটি স্থানচ্যুত হবে, গতিবেগও পরিবর্তিত হবে। এটা কম্পটন প্রক্রিয়া নামে সুবিদিত (অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতএব ইলেকট্রন গঠিত ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ গণনা করা অসম্ভব এবং ভবিতব্য কথাটি কার্যতঃ অর্থহীন।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকরা এইভাবে জড়বাদের মধ্য দিয়েও স্বেচ্ছাকে (free-will) সমর্থন করবার যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন, যদিও দার্শনিকরা চিরকাল মনে করতেন জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের ভবিতব্যবাদী ও নৈরাশ্যবাদী হওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

—

নির্ঘণ্ট